ওপার কলকাতা

দেবল দেববর্মা

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

পৌষ ঃ ১৩৬৮

প্রকাশক ঃ

প্রসুন কুমার বোস
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ঃ

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক ঃ

সি. বি. এইচ. প্রসেস (ক্যালকাটা
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

নিউ প্রাইমা প্রেস,
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী সন্ধ্যাকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

ধন মন যৌবন
রাত তখন দশটা
বাড়ি
সাপ নিয়ে খেলা
ফিরে দেখা
প্রেতশিলা
ভালোবাসা পাখির বাসা
অন্ধকারের মুখ
অথৈ জলে মানিক
কোণারকে কুয়াশা
মালিনী
অবৈধ

এই কাহিনীর তথ্য সংগ্রহে শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্রের কলিকাতা-দর্পণ এবং সার্কুলার খালের ধারে বাস এমন অনেক মানুষের সাহায্য নিয়েছি। তবে উপন্যাস আখ্যায়িকা বা গল্প মাত্র। তাই এর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ মন গড়া এবং যোগসূত্রে বর্জিত।

বইটির নামকরণের জন্য বন্ধুবর শ্রীনরেন সরকার ধন্যবার্দাহ।

কী যেন বিস্মৃতি

সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি—
—নাম কী দিয়ালী।

রবীন্দ্রনাথ



পোস্ট অফিসের কাছে প্রশস্ত রাজপথটার শুরু। দিশী শুয়োরের গাত্রবর্ণের মতো রঙ, তবে চকচকে এবং মসৃণ। ওর চেয়ে অনেক অপরিসর আর একটা রাস্তা থেকে সেটা বেরিয়ে এসেছে। যেন সাধারণ গেরস্থ-বাড়ির ছেলে। হঠাৎ ভাগ্য প্রসন্ন হতেই বাড়বাড়ন্ত। এখন ধনগর্বে সহায়সম্পদে অন্য মানুষ। পুরানো পরিচিত এবং আত্মীয়-পরিজনদের দিকে আর ফিরে তাকায়নি। সামনে এগিয়ে গেছে। দুপাশে নানা মাপের নানা ঢঙের বিচিত্র সব অট্টালিকা। কোনোটা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, কোনোটা বন্ধ্যা মেয়ে মানুষের মতো আঁটোসাঁটো সুশ্রী দেহ। পথের মাঝখানে বুলভার, তাতে কৃষ্ণচূড়া, অশোক আরো সব ফুলের গাছ। বর্ষার জলহাওয়া, কার্তিকের ভেজা শিশির আর মালীর পরিচর্যার গুণে দুদিকের ঘর-বাড়ির মতো সেগুলি প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে সতেজে বেড়ে উঠেছে। ফুলবাগান ছাড়িয়ে আরো কিছুটা গেলে কাঁকুড়গাছি, তারপর উল্টো-ডাঙা পাশে রেখে যদি আরো এগিয়ে যাও, তাহলে এক সময় পথটার নাম দেখবে নজরুল ইসলাম এভিনিউ। ডাইনে সল্টলেক, বাঁদিকে, লেকটাউন, শ্রীভূমি। শীতকালেও বাড়ির পাশে রাস্তার নিচে জল জমে আছে। জায়গাটা যে এককালে শুধু জলাভূমি ছিল, আবদ্ধ জলটুকু বোধ হয় তারই সাক্ষ্য বহন করছে। পথের দুধারে তরুণীর মতো ছিপছিপে ডালপালা ছড়ানো গাছ। অপরাহ্ণের উতলা বাতাসে সামান্য দুলে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে সদ্য আগত কোনো বিদেশী দম্পতি অথবা সম্মুখে দ্বি-চক্রযান-আরোহী পুলিশ-প্রহরী শোভিত এক অজানা ভি. আই. পিকে তারা নীরবে কুর্নিশ জানায়।

কিন্তু এ তো হালফিল কলকাতার ছবি। মহানগরীর মানুষের চোখে এখন আর তেমন কৌতূহল সৃষ্টি করে না। এই রাজপথের দুপাশে সুরম্য সব অট্টালিকা, সল্টলেকে গড়ে ওঠা নতুন উপনিবেশ। পথের ধারে আগুনে রঙের

বিজলীবাতি, শিশু-উদ্যান, কোথাও বৃহদাকার কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেট, —সবই তো জানা হয়ে গেছে। তারপর শিয়ালদা'র উড়ালপুলও তৈরি। এখন বাকি শুধু পাতাল রেলের কাজ। মহানগরীর উত্তর-দক্ষিণে যত্র-তত্র খাদের মতো বিরাট গর্ত। ময়দানের মাঝখানে যেখানে নাকি পাতাল রেলের বড় স্টেশন হবে, সেখানে ডাঁই করে রাখা মাটি প্রায় পাহাড়ের মতো উঁচু হয়েছিল। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের কাছেও যথারীতি মাটি খোঁড়া হয়েছে। সেখানে বড় হোর্ডিংয়ে মেট্রো রেলের সোচ্চার বিজ্ঞাপন—'ক্রশিঙে ক্রশিঙে সময়ের ক্রন্দন, পাতালে তাই চলে দ্রুত সেতু বন্ধন।' তবে পাঁচ বছর কিম্বা দশ বছর পরেই হোক একদিন হয়তো আবার সব ভরাট হয়ে যাবে। পাতাল রেল চালু হবে। কিন্তু ততদিনে আগামী যুগের বংশধরদের কথা ভেবে ফের কোনো নতুন পরিকল্পনার কাজ নিশ্চয় শুরু হয়ে যাবে। একতাল মাটি হাতে নিয়ে মৃৎশিল্পী যেমন নানা ছাদে প্রতিমার মুখ গড়ে, তেমনি করে কেউ যেন কলকাতাকে গড়ছে, ভাঙছে। নইলে কলকাতা যে কলোল্লিনী, তিলোত্তমা হবে না।

হ্যাঁ, কলকাতা বদলাচ্ছে, আরো কত বদলাবে। এক সময় যারা কলেজ স্ট্রীট, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কিম্বা শেয়ালদা অঞ্চলে মেসে-হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত, তারপর কাজে-কর্মে মফঃস্বলে কিম্বা দূরে কোথাও ছিটকে পড়েছে, তারা এখন হঠাৎ এক দিন কলকাতায় এলে রীতিমতো আশ্চর্য হবে। এত হৈ-চৈ, ভিড় ভাট্টা,—চিল্লাচিল্লি, মানুষ-জন। তারপর ওই উড়ালপুল, বড় বড় বাড়ি। ইষ্টিশানটাকেও যেন কেমন নতুন লাগে। কেউ বলে, বাপ্রি-বাপস্! এ যে চেনাই যায় না। হ্যাঁ, শেয়ালদার মুখখানা নাকি পাল্টে গেছে। তা কথাটা ঠিক। গত তিনশ বছর ধরে শেয়ালদা তো কম বদলায় নি। ১৬৯৮ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ-চৌধুরী বংশের কয়েকজন জমিদারের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব কিনেছিল। এই কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন সুবেদার আজিম-উস-সান। তার বদলে ইংরেজরা তাঁকে ষোল হাজার টাকা সেলামি বা নজরানা দিয়েছিল। আর চৌধুরীরা পেয়েছিল সাকুল্যে তের'শ টাকা। এই বিস্তীর্ণ জায়গার পূর্ব সীমায় ছিল ডিহি-শিয়ালদহ। তারও আগে একসময় শেয়ালদা-বেলেঘাটা অঞ্চলটা ছিল জলের নিচে। ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে ছোট ছোট দ্বীপ। গাঁয়ের মানুষের তাড়া খেয়ে শেয়ালের দল উঠত ওসব দ্বীপে। একদা শেয়ালরা বাস করত বলেই নাম হয়েছে শৃগালদহ বা শেয়ালদা। তাছাড়া ফারসী ভাষা জানে এমন মুসলমানরাও বলেন, **shoghul Deh** থেকে শেয়ালদা কথার উৎপত্তি। ফারসীতে **Shoghul** মানে শৃগাল আর **Deh** অর্থ গ্রাম।

যাই হোক, শেয়ালদায় এখন আর শেয়াল নেই। সকাল নটা না বাজতেই শুধু মানুষ আর মানুষের ভিড। অজস্র, অগুণতি। প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত হাঁকাহাঁকি, কোলাহল। ট্রেনের চাকার কর্কশ শব্দ, মোটর গাড়ি কিংবা ভারী লরির তীক্ষ্ণ হর্ণ। কিংবদন্তী আছে যে স্বয়ং জোব চার্ণক সার্কুলার রোড এবং বৌবাজার স্ট্রীটের মোড়ে পূর্ব দিকে শেয়ালদা স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বট কিংবা অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে সপারিষদ তামাক টানতেন আর মাল-পত্র কেনাবেচা করতেন। অবশ্য কারো মতে ওই বটগাছটা ছিল উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোডের ধারে। যার থেকে ওই অঞ্চলটার নাম হয়েছে বটতলা। আবার কেউ বলেন জোব চার্ণক একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের তলায় বসতেন। সেই নিম-বৃক্ষ থেকেই নিমতলা ঘাটের নাম হয়েছে।

এতো গেল শেয়ালদার কথা। কিন্তু তখন আরো উত্তরে বেলেঘাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চলটার কেমন দশা ছিল? প্রায় সমস্ত জায়গাটা ছিল জঙ্গল আর জলাভূমি। ডাঙায় বাঘ-শেয়াল, জলে কুমির-কামট আর রাতে আলেয়ার আলো। সেই সতের'শ সালে ইংরেজরা যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধছে তখন চাঁদপাল ঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে একটা খাল বা নালা বেরিয়ে হেষ্টিংস স্ট্রীটের ওপর দিয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে সার্কুলার রোড পেরিয়ে এণ্টালির উত্তর গা হয়ে বেলেঘাটার দক্ষিণে ধাপায় গিয়ে পড়ত। এক'শ বছর পরে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তৈরির জন্য এই খালের বেশ কিছু অংশ বুজিয়ে ফেলা হ'ল। শুধু সার্কুলার রোড থেকে ধাপা পর্যন্ত নিচের অংশটুকু বজায় রইল। আরো ষাট বছর পরে শেয়ালদা-ক্যানিং রেললাইন পাতবার সময় এবং মাটির নিচে পয়ঃপ্রণালীর কাজ শুরু হতে পামারব্রিজ পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত খালের অংশটুকু ভরাট করতে হয়। সেই সব দিনের কথা এখনকার নাগরিকেরা অনেকেই জানে না। তখন রেললাইন নেই, বড বড ট্রাক নামেনি। আর লরি চলবে এমন পথঘাট কোথায়? স্থলপথে মাল আমদানী করবার কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না। হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম ট্রেন চলে ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। লাইনের দুধারে দেশের লোকেরা দাঁড়িয়ে এই নতুন অগ্নিরথকে সেদিন সভক্তি প্রণাম জানিয়েছিল। সেই যুগে ধাপা থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা, আজকের লবণ-হ্রদ বা সল্ট লেকের মধ্য দিয়ে বহতা ছিল। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিল সেণ্ট্রাল লেক চ্যানেল। ১৮০০ সালে বেলেঘাটা এবং এই লেক চ্যানেল প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। যাতে লেক চ্যানেল দিয়ে বেলেঘাটা খাল ধরে সার্কুলার রোডে মাল পৌছুতে পারে সেজন্য ১৮১০ সালে কোম্পানী এই খাল দুটির সংস্কার করে। কিন্তু তাতেও বেশ সুবিধে

হ'ল না। কারণ আমদানী বাড়ছে। তাই সার্কুলার খাল কাটার পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল। এর প্ল্যান করেছিলেন টেরিটি সাহেব, যার নামে কলকাতায় টেরিটি বাজার। তারপর মেজর সক্ এই প্রস্তাবিত সার্কুলার খালের একটা নকশা বানালেন। সক্ সাহেব ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে মারা যান। তাহলেও সেই নকশা অনুযায়ী ১৮২৯ সালে সার্কুলার খাল কাটা শুরু হয়েছিল। মারহাট্টা ডিচের ওপর দিয়ে তখন যে চিৎপুরের পোল ছিল, তার ঠিক উত্তরে গঙ্গা থেকে এই খাল আরম্ভ হয়। টালার ও বেলগাছিয়ার রাস্তা পার হয়ে সার্কুলার রোডের সমান্তরালভাবে এই খাল দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য বাঁক নিয়ে বেলেঘাটা খালে মিশেছে। তখন উপরের দিকে এই খাল আশি হাত চওড়া, তলায় জলের বিস্তার প্রায় পঞ্চান্ন হাত, গভীরতা ছ ফুট থেকে দশ-ফুট পর্যন্ত। এই খাল দিয়ে তখন মাল বোঝাই বড় বড় নৌকো, স্টীমলঞ্চ আসত। লেক চ্যানেল গিয়ে পড়েছিল বামনঘাটায় মূল বিদ্যাধরী নদীতে। আরো চোদ্দ-পনের মাইল দক্ষিণ-পূর্বে উজিয়ে গেলে শামুকপোতা বা তার্দা বন্দর। বিদ্যাধরী নদী মিশেছিল ক্যানিং বা মাতলা নদীতে। সেখান থেকে কয়েকটি খাল পেরিয়ে মাঝিরা নিয়ে যেত কালিন্দী নদীতে। আবার কালিন্দী নদী ধরে নৌকো যেত খুলনার বসন্তপুরে। ফের খুলনা থেকে বরিশালে।

তখন খুলনা, বরিশাল, যশোহর এমনি পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে নানারকম জিনিষপত্র নৌকোতে বোঝাই করে কলকাতায় আমদানী করা হ'ত। তার মধ্যে ধান, চাল, তরি-তরকারী, ফল, জিওলমাছ এবং আরো অনেক উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। তাছাড়া সুন্দরবন আর আসাম থেকে আসত কাঠ। আসত মুলিবাঁশ, চুণ-বোঝাই বড বড় নৌকো। আর আরাকানের মগেরা আনত হরিণ, মোষের শিং, হাতির দাঁত এবং প্রচুর সেগুন কাঠ। তখন সার্কুলার খালের দুই পাড়ে ছিল অজস্র গুদামঘর। এই সব গুদাম-ঘরের সামনে আমদানী নৌকোর ভিড় লেগে যেতো। সেই সার্কুলার খাল আর বেলেঘাটা খালের তো এখন দৈন্যদশা। পাতাল রেলের জন্য বেলগাছিয়া পোলের কাছে খালের একটা অংশের ওপর ইতিমধ্যেই বালির বস্তা আর মাটি ফেলা শুরু হয়েছে। আর কী হতশ্রী চেহারা খালের। দূষিত বদ্ধ জল। দুপাশে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ, তারই মধ্যে কোথাও কিছু বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের ঝুপড়ি। পাকে-চক্রে যার বাসিন্দারা স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনের অন্ধকার গলি পথে গভীর নিশীথে সরীসৃপ অথবা শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে।

কিন্তু এই সার্কুলার খাল কাটার পর প্রায় দেড়শ' বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে গঙ্গা দিয়ে তো কম জল বয়ে যায় নি। হায়! সেই কলকাতা কী

আছে? দেড়শ' বছরে শহরটার ভোল পাল্টে গেল। ছিল এক ঘোমটা টানা গ্রাম্য-ললনা। আর এখন সর্বাধুনিক সাজে সজ্জিতা লেটেস্ট আধুনিকা। বড় বড় স্কাই-স্ক্র্যাপার, সন্ধ্যেবেলা হোর্ডিংএ আঁটা ঝলমলে বিজ্ঞাপন। লোক, পিপীলিকার মতো জনস্রোত। সিনেমা থিয়েটার, রেডিও-টি. ভি, ট্রাম-বাস, ইলেকট্রিক ট্রেন, মিছিল, জ্যামবন্দী গাড়ি, মানুষ। দিনে-দুপুরে খুন, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি। সন্ধ্যের মুখে বিশেষ কোনো গলিতে শিকারী নায়িকার ছেনালি ইশারা। পার্কস্ট্রীটে রাত বাড়লেই মদের ফোয়ারা। মেয়েমানুষের কোমর জড়িয়ে ধরে দিশী সাহেবদের বল-নাচ। তা এই দেড়শ' বছর পেরিয়ে কলকাতা এখন বিলাসিনী, রূপবতী। বিউটি কন্‌টেস্টে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া এক সুন্দরী যুবতী,—যার গুরু নিতম্ব, ক্ষীণ কটি এবং সুডৌল বক্ষের স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ যে কোনো পুরুষকেই চঞ্চল করে। জিনপরীর মতো এক মদির হাতছানিতে কাছে ডাকে। কখনও বা বেঘোরে মেরে ফেলে।

সেই দেড়শ' বছর পূর্বের অতীত এখন কালের গভীরে লীন। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও ওপার কলকাতা অর্থাৎ খালপারের এই পূর্ব সীমার ছবিটা কেমন ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। সেই সব দিনের কথা এখনও কিছু লোকের অস্পষ্ট মনে আছে। রাজা বসন্তবিলাস রোডের বাসিন্দা ফকির দাস নিজের মনে বকবক করে সে কথা বলে। ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে ফকির দাসের। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডান চোখটায় সামান্য ছানি পড়েছে বলে একটু কম দেখতে পায়। বলতে গেলে এখন বাঁ-চোখ যা ভরসা। বেলেঘাটা খালের উত্তর ধারে বাড়ি। টিনের চাল, তিন দিকে মাটির দেয়াল। শুধু পিছন দিকটায় ইঁটের গাঁথনি। সামনের দিকে একটু গাছ-গাছালি। বর্ষায় লাউ, শীতে গাঁদা ফুল-টুল ফোটে। দু-চারটে বেগুন, বীজ ছড়িয়ে দিলে কিছু পালংশাকও হয়। ফকির দাসের বাবা নফর দাস এখানে এসেছিল সেই যুদ্ধ লাগবার তিন-চার বছর আগে। নফর দাস ঘরামির কাজ করত। বর্ধমানের কোনো গ্রামে বাড়ি। কাজ-কর্ম যা পেত তাতে তিনটে প্রাণীর কোনোমতে এক বেলার আহার জুটত। কে যেন বলেছিল, কলকাতায় মেলা কাজ। তেমনি মজুরী। কপাল ঠুকে একবার বেরিয়ে পড়। দেখবে বছর না ঘুরতেই ভাগ্য ফিরে যাবে তোমার। তা সে ভাগ্য কী অমন সহজে ফেরে? কথায় বলে না, শালা পাথরচাপা কপাল। তা নফর দাস দুঃখ করে সেই কথা বলত, ইয়ে আমার হ'ল গিয়ে তাই। কপালে যে বিশমণি পাথর চাপা আছে গো! সে কী নড়তে চায়? কলকাতায় এসে খাল পেরিয়ে ডেরা বাঁধল নফর দাস। কাজকর্ম

জুটতে তেমন অসুবিধে হয় নি। ঘরামির কাজ, কখনও নৌকো থেকে মুলিবাঁশ বয়ে এনে গুদামে ভর্তি করত। তখন এই অঞ্চলটায় গাছপালা আর জঙ্গল। বর্ষাকালে জল থৈ-থৈ। ঘরবাড়ি বলতে টিনের বেড়া, নইলে গোলপাতার ছাউনি। বেঁচে থাকতে নফর দাস গল্প করত, সে ত্যাখন এক আলাদা দিন। এই খাল বেয়ে সুন্দরবন থেকে বড় বড় নৌকো আসত। তারা নিয়ে আসত জ্বালানি কাঠ, সুন্দরী গাছের খুঁটি আর কুঁড়ে ঘর ছাইবার গোলপাতা। এই পিচের রাস্তাঘাট ত্যাখন স্বপ্ন গো বাবু। খাল পেরিয়ে খোয়ার রাস্তা ধরে লোকজন ঘরে আসত। সন্ধ্যে-বেলায় বড় রাস্তায় গ্যাসবাতি ছিল। আর এই বসন্তবিলাস রোডে তেলবাতি জ্বলত রাত নটা-দশটা পর্যন্ত। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশে এমন গা ঘেঁষাঘেষি করে বাড়িঘর তৈরি হয়নি। তখন চতুর্দিকে মাঠ,—শিরীষ গাছ, পিটুলি গাছ আর তালগাছ। বড় বড় অশ্বত্থ আর বটগাছ রাস্তার দুপাশে। এখন যেটা সি. আই. টি রোডের মোড, তখন ওইখানে পথের দুই ধারে দুটো বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। রাত্তিরে গাছের ওপর থেকে ঝরঝর করে জল পড়লে লোকে বলত, ব্রহ্মদত্যি পেচ্ছাব করছে।

ফকির দাসের মনে সেইসব দিনের কথা এখনও ভাসে। খালে জোয়ার ভাঁটা খেলত। রাত-দুপুরে ভোঁ বাজিয়ে ইষ্টিমার যেত মানিকতলার দিকে। যশোহরের নৌকো থেকে জিওল মাছ বিক্রি হতো এক বালতি দু-তিন আনা দরে। বরিশালের এক নম্বর বালাম চাল চার টাকা মণ। তখন এই বসন্তবিলাস রোডে মুলিবাঁশের ব্যবসার রবরবা। অবশ্য সুন্দরী আর গরান কাঠও দেদার বিক্রি হত। তখন কী চেহারা ছিল এই জায়গাটার। চতুর্দিকে জঙ্গল। দিনদুপুরেই খুন-খারাপি। একবার এই বসন্তবিলাস রোডে একটা লোক সন্ধ্যেবেলায় তার বাড়িওলাকে ছুরি মেরে পালাচ্ছিল। তাই শুনে মুলিবাঁশের দোকান থেকে অন্য একজন বেরিয়ে গরান কাঠের লাঠি মেরে তাকে খতম করে। আর শুধু কী খুন-খারাপি? দিনের বেলায় ঘরের উঠোন দিয়ে হেলেদুলে শেয়াল যেত। হাঁস-মুরগীর ঘাড় মটকে জিভের সাহায্যে তারিয়ে তারিয়ে রক্ত চেটে খেত। মাঝে মাঝে কুঁড়ে ঘরের দাওয়া থেকে কচি বাচ্চাকেও মুখে তুলে নিয়ে গেছে।

নফর দাস এই বাড়িটা কিনেছিল মাত্র কুড়ি টাকায়। গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘর ছিল তখন। জায়গার জন্য কোনো সেলামি দিতে হয়নি জমিদারকে। শুধু কাঠা পিছু বছরে চার আনা খাজনা। চার কাঠা জমি নিলে বছরে একটি টাকা। সেই জমি নিতে এখন বিশ-তিরিশ হাজার টাকা সেলামি গুণে দিতে হয়। আর সি. আই. টি. রোডের মোড় ছাড়িয়ে ফুলবাগানের দিকে গেলে দুপাশের জমি তো সোনার চেয়ে দামী। তেমন সরেস জায়গা হলে একলাখ টাকা কাঠা

দর দিতে পারে এমন খরিদ্দারের অভাব হবে না।

ফকিরদাস সেই পুরানো দিনের কথা এখনও বলে। 'ত্যাখন' বাড়ি তৈরি করলেও ছাদ ঢালাই করবার অনুমতি ছিল না। আধখানা দেয়াল, আধখানা বেড়া বা টিন। মাথার ওপরে গোলপাতা, করোগেট কিম্বা যা খুশি ছাউনি দিতে পার। কিন্তু ঢালাই করলেই বিপদ। জমিদারের লোক এসে হম্বিতম্বি শুরু করবে। সে এক ফ্যাসাদ। তাই বলে কী আর ঢালাইয়ের কাজ কোনো দিন হয়নি? হয়েছে বৈকি। দেশ ভাগের পর পিলপিল করে লোক এসে ভিড করল ওপার কলকাতায়। তাদেরই একজন জমি বন্দোবস্ত নিয়ে দালানবাড়ি শুরু করল। লোকটার নাম শ্রীপতি কুণ্ডু। বয়স চল্লিশের নিচে। পূর্ব বাংলা থেকে এখানে এসে কী সব ব্যবসা ধরেছিল। আর তাইতেই দুটো পয়সা হাতে জমেছে। সেই লোকটা দালান বাডিতে ছাদ ঢালাই করবে বলে ঠিক করল। ফকিব দাস তখন জোয়ান মদ্দ,— বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তা সে ছাদ ঢালাই দেখতে কত লোক এসে ভিড করেছিল। সে কথা ভাবলে ফকির দাসের নিজেরই এখন হাসি পায়। তবে হাসি পাওয়ার মতো তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কারণ এই বসন্তবিলাস রোডের বাসিন্দারা তার আগে কেউ ছাদ ঢালাই কোনো দিন চক্ষে দেখেনি। কিন্তু শ্রীপতি কুণ্ডুকে এই নিয়ে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল। জমিদারের লোক-জন এসে রীতিমতো শাসিয়ে গেল। শেষে প্রায় ছমাস ধরে মামলা-মোকদ্দমা। উকিল মুহুরী আর সাক্ষী সাবুদের পেটে অনেকগুলো টাকা গচ্চা। তবু জমি-দারেব সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি শ্রীপতি। আদালতে মামলার রায় তার বিপক্ষে গেল। শেষ পর্যন্ত এই দালান-বাড়ি, জায়গা জমি সব কিছু জলের দরে বেচে দিয়ে একদিন শ্রীপতি কুণ্ডু কোথায় চলে গেল।

এই বসন্তবিলাস রোডের কেউ আর তার খোঁজ রাখেনি।

তা সে এক দিন গিয়েছে। জমিদারের প্রতাপ 'ত্যাখন' এমন ছিল। ফকির দাস সেই কথা সকলকে বলে। নইলে সামান্য একটা ছাদ ঢালাই নিয়ে কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। কাজ বন্ধ করতে জমিদার তো কম লোক পাঠায়নি। নায়েব-গোমস্তা, তিন-চারজন ভোজপুরী দারোয়ান আর সেই সঙ্গে জমিদারের পোষা গুণ্ডা শান্তিরামও এসে হাজির হ'ল। শ্রীপতি কুণ্ডুও বোধহয় ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পেরেছিল। তাই শান্তিভঙ্গ হতে পারে এই আশঙ্কায় দুজন সেপাই-কে ঘটনাস্থলের কাছে আগেই মোতায়েন করে রাখল। তখনও দিনকাল এত খারাপ হয়নি। পুলিশকে লোকে রীতিমতো ভয় করত, সমীহ করত। যেখানে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, তারই পাশে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখে নায়েব-গোমস্তা আর বাড়াবাড়ি করতে সাহস করেনি। শুধু শান্তিরাম পানের পিচ ফেলে একটা

অশ্লীল ভঙ্গি করে বলেছিল,—'যা শালা। বড় বেঁচে গেলি। নইলে আজ তোকে শুইয়ে তার ওপরেই ঢালাই করে যেতাম।'

তখন জমিদার এই বসন্তবিলাস রোডে আসতেন। খাজনাপত্র আদায়, জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রাথমিক কথাবার্তা বলার জন্যে নায়েব গোমস্তা ছিল। তবু রাজাকে মাঝে-মধ্যে আসতে হয় বৈকি। নইলে সম্পত্তির ওপর ঠিক দখল থাকে না। আর রাজা বসন্তবিলাস তাঁরই পূর্বপুরুষ। সেই ভদ্রলোকের নামেই এই রাস্তার নাম,—রাজা বসন্তবিলাস রোড।

জমিদারবাবুর নাম হর্ষবিলাস,—শ্রীহর্ষবিলাস দত্ত। ফকির দাস এই হর্ষবিলাসবাবুকে অনেকবার দেখেছে। প্রায় ছ-ফুট লম্বা; গৌরবর্ণ দেহ। এক মাথা কুঞ্চিত কেশ। শেষদিকটায় অনেক চুল পেকে গিয়েছিল। পরনে গিলে করা আর্দ্দির পাঞ্জাবী, আর কালো চওড়া পাড় শান্তিপুরী ধুতি। পায়ে চকচকে পাম্পসু। গলায় একটা সোনার হার পরতেন হর্ষবিলাস। হাতে রূপো বাঁধানো হাঙরমুখো লাঠি। সঙ্গে থাকত এক গোঁফওলা ভোজপুরী দারোয়ান। নায়েব-গোমস্তা যেত আগে। বড় রাস্তার ওপর গাড়ি থেকে নামতেন হর্ষবিলাস। তারপর পায়ে হেঁটে এই বসন্তবিলাস রোড ধরে এগিয়ে যেতেন। সেই খাল ধার পর্যন্ত। 'ত্যাখন' জমিদার এলে পাড়ায় একটা সাড়া পড়ে যেত। কেউ কেউ গলবস্ত্র হয়ে ঠিক দেবতার মতো ভক্তি ভরে প্রণাম জানাত। তাই দেখে অনেকে আড়ালে হাসাহাসি করেছে। বলত,—'বেটার পেন্নামের ঘটা দেখ একবার। নিশ্চয় অনেক টাকা এখনও বাকি। নইলে নির্ঘাত কোনো নতুন জমি বন্দোবস্ত নেবার ফিকির খুঁজছে।'

এখন অবশ্য আর জমিদার নেই। সম্পত্তির মালিক হয়েছে এক কোম্পানী। তবে জমিদারের লোকেরা তার কেষ্ট-বিষ্টু সেজে আছে। নতুন জমি বন্দোবস্ত নিতে হলে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু মোটা টাকা সেলামি। জমি বন্দোবস্ত মানেই লিজ। ন'শ নিরানব্বই বছরের মৌরুসী পাট্টা। কাগজে-কলমে শুধু খাজনার লেনদেন হয়। সেলামির মোটা টাকা আড়ালে এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে আসে। দীর্ঘকাল এই বসন্তবিলাস রোডের কোনো বাড়ির আলাদা ট্যাক্স ধার্য হয়নি। জমিদার নিজেই খাজনার সঙ্গে ট্যাক্স আদায় করে নিত। পরে একটা থোক টাকা জমিদারের তরফ থেকে কর্পোরেশনের ঘরে জমা পড়ত।

তবে বসন্তবিলাস রোডের এখন আর সে চেহারা নেই। এককালে সমস্ত রাস্তায় মাত্র দুটো তেলবাতির আলো টিমটিম করে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত জ্বলত। খালের ধারে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের ডালে শকুনের ছানা সদ্যোজাত

শিশুর মতো তারস্বরে চেঁচিয়ে এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করত। এখন তার বদলে চার ফুট রড ল্যাম্প,—অন্তত আট-দশটা পোষ্টের মাথায় কাঁচ-বসানো চৌকো কভারের ভিতর থেকে সমস্ত রাত্তির দিনমানের মতো আলো ছড়ায়। চার-পাঁচখানা দোতলা-তিনতলা বাড়ি। দুপাশে একতলা দালান বাড়ি অনেক। তবে আধখানা দেয়াল, আধখানা বেড়া বা টিন, এমন বাড়িও আছে। যেমন পিতুর মায়ের বাড়িখানা। ওটা যেন সেই সাবেক কালের একখানা কুঁড়েঘর। সতের'শ সালের পর থেকে কলকাতা শহরটা কত বদলে গেল। এই বসন্তবিলাস রোডে কত মানুষ এল। তারা কেউ চাকরি করে, কেউ বা ব্যবসা ধরে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিল। দালান-বাড়ি তৈরী করল। কিন্তু পিতুর মায়ের যা হাল ছিল, আজও ঠিক তাই আছে। এই কুড়ি-পঁচিশ বছরে চেহারাটাও যেন বদলায় নি। একই রকম রয়ে গেছে।

পাড়ার পূর্ণ পণ্ডিত অনেকদিন দেশের বাড়িতে ছিলেন। সেবার পুজোর আগে কলকাতায় ফিরে এলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বাস ধরে সি. আই. টি. রোডের মোড়ে নামতেই পিতুর মায়ের সঙ্গে দেখা। ভোরবেলায় পিতুর মা কাজে যাচ্ছিল। মৃদু হেসে পূর্ণ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, —'খবর ভালো তো পিতুর মা?'

—'এই একরকম ঠাকুরমশায়। আজই ফিরলেন দেশ থেকে?'

—'হ্যাঁ। পুজো এসে গেল। কাজকর্ম আছে, তাই চলে এলাম।' ফের হেসে বললেন,—'অ পিতুর মা, তুমি তো দেখছি অব্যয়।'

শুনে পিতুর মা মুখ নিচু করে সলজ্জ হাসে। বলে,—'ও কথার কি মানে ঠাকুরমশায়?'

পূর্ণ পণ্ডিত লঘু স্বরে উত্তর দেয়,—'যার ক্ষয়-ব্যয় নেই তাকেই বলে অব্যয়। তা তুমি তো দেখছি সেই একই রকম রয়ে গেলে পিতুর মা। চেহারা একটুও বদলায় নি।'

—'ভগবান যেরকম রেখেছেন ঠাকুরমশায়।' পিতুর মা মিষ্টি হাসে। তারপর বলে, 'যাই, আজ দেরি হয়ে গেছে। ভোরবেলায় এক কাপ চা না পেলে বুড়ো-বুড়ি দুজনেই মুখ বেজার করে।'

তা পিতুর মায়ের মুখে মিষ্টি হাসি সব সময়েই লেগে আছে। এত দুঃখ-কষ্ট অভাব-দৈন্য তবু পিতুর মাকে কেউ কোনোদিন মুখভার করতে দেখেনি। আসলে মুখের হাসি হ'ল ঘন মাধ্যমে মনের আলোর এক আশ্চর্য প্রতিসরণ। মন যদি অন্ধকার হয়, তাহলে আলোর প্রতিসরণ নৈব নৈব চ। নইলে পিতুর মা কত দিন হপ্তার রেশন তুলতে পারে না। দশ-পনেরোটা টাকার জন্যে এখানে

ওখানে ছুটোছুটি করে। এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওকে দেয়। আবার ওর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে রেশনের চাল-গম ঘরে আনে। তবু পিতুর মাকে কেউ কোনোদিন দুঃখ করতে শোনেনি। যা আছে আমার ভাগ্যে, তাই তো হবে। মিছিমিছি হা-হুতাশ করে লাভ কী বলুন? পিতুর মা তার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন-দর্শনের কথা এমনি সহজ সরল বিশ্বাসের সঙ্গে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে।

মাস ছয় হ'ল ফুলবাগানের মোড়ে একটা ভালো কাজ পেয়েছে পিতুর মা। নইলে এতদিন এই বসন্তবিলাস রোডে দু-তিন ঘরে বাসন মেজে ষাট-সত্তর টাকার বেশী রোজকার করতে পারে নি। খেতে দিতে বাড়িতে ছ-সাতটি মুখ। বড় মেয়ে পিতু অর্থাৎ প্রতিমা, স্বামী, বড় ছেলে মোহন, তার বউ,—এ ছাড়াও দুটি অপোগণ্ড, নাবালক। এতগুলি লোকের খাওয়া-পরা, রোগ-অসুখ, ভালো-মন্দের একটা চিন্তা পিতুর মায়ের সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মতো ঘোরে। তারপর ছোট দুটোর খাতা-পেন্সিল, বছরের শুরুতে বই-টই, আনুষঙ্গিক আরো কিছু খরচপত্র বেড়েই চলেছে। তা মাইনে না লাগলে কী হয়? এদিকে খাজনার চেয়ে বাজনা যে ক্রমেই বেশী হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে পডাশুনো নামমাত্র। বাড়িতে প্রাইভেট মাস্টার না দিলে অধিকাংশ ছেলেই যে পরীক্ষার বেডা ডিঙোতে পারবে না, সেকথা প্রায় সকলেই এখন স্বীকার করে নিয়েছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোরকমে সংসারটা চলে। পিতুর বাবা একটা কারখানায় কাজ করে। ছোট কারখানা। তবু হপ্তায় সত্তর-আশী টাকা হাতে পাওয়ার কথা। কিন্তু কাজ থাকে না বলে মানুষটাকে মাসে দশ-বারো দিন বসিয়ে দেয়। বর্ষাকালে বাজার তেমন মন্দা হ'লে পনের-কুড়ি দিনও বেকার থাকে। একবার কারখানার লকআউট না কী যেন হ'ল। পিতুর বাবাকে তখন পুরো তিনটি মাস বসে থাকতে হয়েছিল। সে এক অথান্তর অবস্থা। হাতে পয়সাকড়ি শেষ। হপ্তার রেশনটুকু ঘরে তুলতেই নাজেহাল। বাজারে ধার-দেনা। লোকের কাছে হাত পাতলে মুখ ফিরিয়ে নিত। নন্তু মুদির দোকানে একদিন মুখের ওপর বলে দিল,—'আর ধার-টার নয় গো। এখন নগদ টাকা দিয়ে জিনিস নিয়ে যাবে, বুঝলে?' তা সত্ত্বেও পিতুর মা কোনোদিন মুখ ভার করে থাকে নি। পড়শীদের সঙ্গে দেখা হলেই একগাল হাসি। কলকল কথা। ভগবান এবার মুখ তুলে চাইবেন বৈকি। শুনছি সামনের হপ্তায় ফের কারখানা খুলবে। একবার পিতুর বাবা কাজে গেলেই নিশ্চিন্তি। সংসারে আর কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকবে না।

তবে অবস্থা এখন অনেক ভালো। বছর খানেক হ'ল পিতুও একটা কাজে

ঢুকে গেছে। টুনি ল্যাম্পের ফ্যাক্টরিতে কাজ। টুনি বাতি ছাড়াও ইলেকট্রিকের আরো কী যেন সব যন্ত্রপাতি সেখানে তৈরী হয়। তবে হপ্তা নেই। ফুরনে মজুরী। যেমন মাল তৈরি করতে পারবে তেমনি পয়সা। তা এখন মাস গেলে পিতুও প্রায় শত খানেক টাকা ঘরে নিয়ে আসে।

এক সময় এই মেয়ের কথা ভেবে পিতুর মায়ের রাতে ঘুম হত না। বছর চার আগে দেনাকর্জ করে পিতুর বিয়ে দিয়েছিল। দমদমের কাছে কোন বস্তিতে ছেলের বাড়ি। নিজের একটা রিকশা-ভ্যান আছে। তাই থেকে মাসে তিন চার'শ টাকা পর্যন্ত রোজগার হয়। ছেলে দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। জোয়ান-মরদ। পিতুর বাবা তার সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই একেবারে বিয়ের দিন ঠিক করে ফিরে এলো। তারপর এক দিন শুভ কাজ নির্বিঘ্নে চুকে গেল। বিয়েতে ছেলেকে একটা তিন আনা সোনার আংটি দিয়েছিল পিতুর মা। মেয়েকে নিজের গলার এক ছিলতে হার, আর কানের দুল। বিয়ের রাত্তিরে পাড়াপড়শীদের অনেককে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল। কিন্তু মাস তিন না যেতেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। শ্বশুর ঘর থেকে একদিন কাঁদতে কাঁদতে পিতু এলো। কী কারণ? না সে ছেলের নাকি আগে আর একবার বিয়ে হয়েছিল। বছর দুই আগে ঝগড়াঝাঁটি করে বউ বাড়ি থেকে চলে যায়। এতদিন স্বামীর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেই বউ আবার ঘর করতে ফিরে এসেছে। দজ্জাল মেয়েছেলে। মুখে কটু ভাষা, গালিগালাজ। যখন-তখন যার তার বাপ তুলে বলা কথার মাত্রা। পিতু কী একটা জবাব দিতেই সে এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে দুম দুম করে তার পিঠে পাঁচ-ছটা কিল বসিয়ে দিয়েছিল।

তবু পিতুর মা মেয়েকে অনেক করে বোঝাল। সতীন নিয়ে অমন কত মেয়ে ঘর করছে। আর এককালে এদেশে তাই আকছার ঘটত। এখনই সব পুরুষমানুষের একটা করে বউ। নইলে সেকালে কুলীন বামুনরা তিন-চার'শ পর্যন্ত বিয়ে করে দিব্যি বহাল-তবিয়তে বেঁচে ছিল। তাতে সংসার-ধর্ম কিছু উচ্ছন্নে যায় নি। তাছাড়া বউটার যখন অমনি স্বভাব। মুখে গালমন্দ, খরখরে ভাষা। পুরুষমানুষ কদিন আর তা সহ্য করবে? একদিন রাগের মাথায় দেবে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে। তখন পিতুই হবে স্বামীর চোখের মণি, ঘরের গিন্নি। প্রথম পক্ষের সেই বউটা ফের উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলেই কী বানের আগে কুটোর মতো নিজের ঘর-সংসার অমন ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসতে আছে?

কিন্তু পিতু অর্থাৎ প্রতিমা তার সংকল্পে দৃঢ়। হাজার অনুনয়-বিনয়ে তাকে টলানো যায় নি। তার পরিষ্কার কথা। সতীন থাকতে সে কোনোদিন স্বামীর সংসারে গিয়ে উঠবে না। বিরক্ত হয়ে পিতুর মা বলেছিল,—তাহলে চোরের

উপর গোঁসা করে মাটিতে ভাত খাও। স্বামীর ঘরে না গেলে তোমার সতীনের পোয়াবারো। দুদিন পরে সোয়ামীকে আঁচলে গেরো বেঁধে রাখবে।

তবু পিতুর মায়ের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল। জামাই এসে সাধাসাধি করলে মেয়ে কখনও তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আর জামাই না এসে পারে কখনও? সে তো পুরুষ মানুষ। মোটে তিন মাস বিয়ে হয়েছে। পিতু দেখতে-শুনতে কিছু ফেলনা নয়। বাড়ন্ত লতার মতো শরীরে যৌবনশ্রী এসেছে। লম্বা হিলহিলে চেহারা। বড় বড় চোখ। ছেলেবেলায় ফুটফুটে সুন্দর ছিল, তাই আদর করে নাম রেখেছিল প্রতিমা। দুজনের ভাব-ভালবাসা, মনের মিল হয়তো এখনও দানা বাঁধে নি। কিন্তু ভেতরের টান নাই থাকল, মেয়ের রূপ-যৌবনের তো একটা আকর্ষণ আছে।

তা পিতুর মা যা ভেবেছিল তাই সত্যি হ'ল। দিন পনের না যেতেই একদিন বিকেলবেলা জামাই এসে উপস্থিত। চিনতে পেরেই মাথার আঁচলটা টেনে দিয়ে জামাইকে সমাদর করে বসাল। কুশলসংবাদ শুধোল। একটা হাত-পাখা এনে কিছুক্ষণ তাকে হাওয়া করল। জল-মিষ্টি খেতে দিল। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে মেয়ের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল,—'ওলো, জামাই তোকে নিয়ে যাবে বলে নিজেই এসে হাজির হয়েছে।'

পিতু আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধছিল। মায়ের কথা শুনল, কিন্তু কোনো জবাব দিল না। পিতুর মা ব্যস্ত হয়ে বলল,—'অমন গা এলিয়ে বসে থাকলে চলবে না। জামাই মানুষ, নিজে এসেছে। তাড়াতাড়ি চুল-টুল বেঁধে গা ধুয়ে আয়। ভালো জামাকাপড় পরে ওর সঙ্গে দুটো কথা বল।'

পিতু ধীরে-সুস্থে চুল বেঁধে গা ধুতে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে জামা-কাপড় বদলে শান্তভাবে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রায় পক্ষকাল পরে নতুন বউকে দেখে জামাইকে বেশ খুশি-খুশি মনে হ'ল। দু-চার কথার পর পিতুকে ফের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সে নিজেই করল। বলল, —'রাগের মাথায় সেদিন অমনি হুট্ করে চলে এলে। কারো একটা কথা পর্যন্ত শুনলে না। এখন ঘর-সংসারে আবার ফিরে চল দিকি।'

কিন্তু পিতু অত সহজে ভুলবার মেয়ে নয়। অপাঙ্গে স্বামীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে সে বলল,—'ঘর-সংসার সামাল দিতে তোমার আর একটা বউ তো রয়েছে। ফের আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কেন মিছিমিছি অশান্তি বাড়াবে?'

কথার মধ্যে ছোট চিমটি। কিন্তু জামাই তাতে রাগ করল না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব দিল,—'আরে, একে আবার অশান্তি বলে নাকি? সংসারে

থাকতে দুই জায়ে যেমন একটু মন কষাকষি হয়, ফের মিলমিশ্‌ হয়ে যায়—এও সেই তেমনি ধরে নিতে পার। ইয়ে ফালতু একটা খচাখচির জন্যে মাইরি, তুমি চিরকাল বাপের বাড়িতে পড়ে থাকবে? তাই কখনও হয়?'

পিতুর মা এতক্ষণ ইচ্ছে করেই আড়ালে গিয়েছিল। মেয়ে-জামাইয়ের কথায় সে কেন মিছিমিছি নাক গলাতে যাবে? পিতু রাগ করে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। তাই জামাই উপস্থিত বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তার মানে এখন মান-ভঞ্জনের পালা। বউ অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। আর স্বামী কাছে বসে তার মান ভাঙাবে। কত মিষ্টি কথা বলবে। তবে না বউয়ের রাগ-অভিমান গলবে,—ফের বরের সঙ্গে তার ঘরে ফিরে যেতে রাজি হবে। কিন্তু পিতুর গলায় যেন অভিমানের ছিটেফোঁটা নেই। বরং জ্বালা-ধরানো, সাফ-সুতরো বুলি। ঘরের ভিতরে বসে পিতুর মায়ের কেমন খটকা লাগল। ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই। স্বামীর মুখের ওপর দুম করে আবার কী জবাব দিয়ে বসবে। রাগ-রোষের বশে ছেলেটা যদি ফিরে যায়। তাই সামাল দিতে ভিতর থেকে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। জামাইয়ের মান রাখতে বলল,—'পোড়ারমুখীকে আমিও তাই বলি, বুঝলে বাবা? আর মেয়েমানুষের নিজের ঘর-সংসার না থাকলে কী রইল বল? একটা সতীন আছে তো কী হয়েছে? আগেকার দিনে পুরুষমানুষরা অমন কত গণ্ডা বিয়ে করত। তার জন্যে কোনো মেয়ে কী দড়ি-কলসী নিয়ে জলে ডুবে মরেছে?'

কিন্তু পিতু পরিষ্কার জানাল,—'তোমার ওই বউ সংসারে থাকলে আমি কোনোদিন সেখানে যাব না।'

মেয়ের জবাব শুনে পিতুর মায়ের বুকটা মুহূর্তের জন্যে ভয়ে কেঁপে উঠল। কী সর্বনেশে কথা। আর মেয়েমানুষের অত জিদ্‌ কখনও ভালো নয়। মরীয়া হয়ে সে বলল,—'ও কি আদিখ্যেতার বুলি? সোয়ামীর ঘরে যাবি না তো মরবি কোন চুলোয়?'

জামাই আর বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল,—'তার মানে তুমি ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলছ?'

পিতু আগের মত শক্ত গলায় বলল,—'আমার কথার যা ইচ্ছে তাই মানে করতে পার। কিন্তু তোমার যে অমন জলজ্যান্ত একটা বউ বেঁচে রয়েছে সে কথা বিয়ের আগে কেন জানাও নি, তার উত্তর দিতে পারবে?'

এমন একটা কঠিন প্রশ্নের চট করে জবাব দেওয়া আরও কঠিন। জামাই তাই একটু থতমত খেল। ফের ঢোক গিলে জিভটাকে সচল করে নিয়ে উত্তর দিল,—'জানাইনি মানে জানাবার প্রয়োজন হয় নি। কারণ তখন আমার সঙ্গে

ওর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বছর দুই আগে ঝগড়াঝাঁটি করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। আমি বিয়ে করেছি খবর পেয়ে আবার সংসারে ফিরে এসেছে। কিন্তু তাই বলে ওকে এখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

—'আহা! আমি কি বলেছি তাড়িয়ে দিতে।' এত দুঃখেও পিতু মুচকি হাসল। পর মুহূর্তেই মুখখানা গম্ভীর করে বলল,—'তোমার ওই সোহাগী বউকে নিয়ে ঘর-সংসার কর। কিন্তু আমাকে আর সেখানে যেতে ব'ল না।'

তবু পিতুর মা শেষ চেষ্টা করল,—'কিন্তু জামাই যে তোকে নিতে এসেছে পোড়ারমুখী। তার হাত ধরে নিজের সংসারে ফিরে যাবি নে?'

পিতু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'আমার ফেরার পথ কোথায় মা? সে পথ যে ও নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে।'

জামাইয়ের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বউকে প্রায় শাসিয়ে বলল,—'ছোট মুখে বড় বড় কথা। বিয়ে-করা পরিবারকে কেমন করে নিয়ে যেতে হয়, তা আমি জানি।'

—'তাই নাকি?' পিতু মুখ ফিরিয়ে সোজাসুজি তাকাল। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল,—'কেমন করে? থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি করবে বুঝি?'

—'না, তার দরকার হবে না।' জামাই তেজ দেখিয়ে বলল,—'তোমার মতো মেয়েছেলেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হিম্মৎ আমার আছে।'

পিতু বাঁকা হেসে জবাব দিল,—'অমন গোঁয়ার্তুমি যেন করতে যেও না। তাহলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। শুনেছি বউ থাকতে আর একটা বিয়ে করা মস্ত অপরাধ। তার জন্য আইনে শাস্তি লেখা আছে। আমাকে বাধ্য করলে থানা-পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিতে হবে।'

মেয়ের জবাব শুনে পিতুর মা 'থ'। আশ্চর্য! পিতু এত সব আইনের কথা কবে জানল? বউ থাকতে আর একটা বিয়ে অপরাধ? তার জন্য আইনে শাস্তি লেখা আছে? ও বাবা। এমন কথা পিতুর মা জন্মে শোনে নি। পেটের মেয়ের কাছেই এখন আরো কত কী শিখতে হবে।

জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার যেন একটু মজা লাগল। অমন শক্ত সমর্থ গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে। একটু আগেই কেমন তড়পাচ্ছিল। আর এখন বউয়ের জবাব শুনে মুখখানি চুন। যেন জোঁকের মুখে একদলা নুন ফেলে দিয়েছে পিতু। কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জামাইয়ের মুখের চেহারা ফের বদলে গেল। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সে এক পা এগিয়ে শিং-উঁচানো ছাগলের মতো আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল,—'বেশ, আপনার মেয়ের জবাব পেয়ে গেলাম।

তবে সতীন থাকতে স্বামীর ঘর করব না, এসব আন-ফান বুলি না ঝাড়লেই হত। আমার কানেও একটা খবর এসেছে কিন্তু। হ্যাঁ, আপনার মেয়ের নাকি এক রসের নাগর রয়েছে। শুনেছি পাড়ারই এক ছোঁড়া। তা সেই ছোকরার সঙ্গে যখন এত ঢলাঢলি—তখন ফুলের মালাটা তার গলাতে লটকে দিলেই তো সব ঝামেলা মিটে যেত।'

পিতু চিৎকার করে বলল,—'চুপ কর তুমি। অসভ্য, ইতর কোথাকার। বাড়ি বয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছ? এত বড় আস্পর্ধা তোমার? যাও, এখান থেকে। বেরিয়ে যাও।'

একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পিতুর মায়ের বুকখানা ভয়ে কেঁপে উঠল। রগড় দেখতে পাড়ার বউ-ঝিরা এখুনি আড়ালে এসে দাঁড়াবে। তারপর পথ-ঘাটে দেখা হলে ফিসফাস, শুধু এই গপ্‌পো। এমনিতেই পিতুর মাকে এই বিয়ের ব্যাপারে কত জবাবদিহি করতে হয়। বরের সঙ্গে কী হয়েছিল গা পিতুর? সব জেনেশুনেও কেউ ন্যাকা সাজে। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—'তা মেয়েকে আর শ্বশুর-বাড়িতে পাঠাবে না পিতুর মা?' কেউ বা নেহাৎ ঠোঁটকাটা। গায়ে পড়ে শুধোবে,—'জামাইয়ের স্বভাব-চরিত্তির বুঝি ভালো নয় দিদি? তাই মেয়ে সোয়ামীর ঘর করতে পারল না?'

পিতুর ওই রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখেই জামাই পিছন ফিরল। যাবার সময় শুধু শাসিয়ে গেল,—'ঠিক আছে। এই অপমানের শোধ আমি তুলব। নইলে বীরেন দাস বেজন্মা, বাপের বেটা নয় জানবে।'

জামাই চলে যাবার পর পিতুর মা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়ের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। ব্যাপারটা নিশ্চয় এখনও পাঁচকান হয় নি। নইলে আর কেউ না আসুক, ভুবনপিসী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক তার নাম ধরে ডাকত। দরজা খুললেই নর্দমার পচা পাঁকের দুর্গন্ধের সঙ্গে এক ডজন অস্বস্তিকর প্রশ্ন বৃষ্টির ছাঁটের মতো তার চোখে-মুখে এসে বিঁধত। জামাই কেন এসেছিল গা পিতুর মা? আর এলো যদি তো অমন দেমাক করে চলে গেল কেন? না বাপু, তোমার মেয়ের মতিগতি সুবিধের নয়। নইলে সোয়ামীকে আবার কেউ অমনি দরজা থেকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয় নাকি? পিতুর মাকে নীরবে সব হজম করতে হ'ত। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। পাড়ার লোকের হাঁড়ির খবর রাখে ভুবনপিসী। কারো ঘরের কেচ্ছা তার জানতে বাকি নেই। মেজাজ গরম করলে হয়ত রেগেমেগে দরজাতে দাঁড়িয়েই দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে যাবে।

তবে মনে হয় তার জামাইকে কেউ চিনতে পারে নি। আর চিনবে কেমন

করে ? বিয়ের রাত্তিরে একটিবার চোখের দেখা। তখন বরের সাজ। কপালে চন্দন, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। সেই মানুষকে দিনের আলোয় সাদামাটা বেশে দেখে নিশ্চয় চেনা শক্ত। তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে হয়তো কেউ বড় ছেলে মোহনের বন্ধু বলে ভেবেছে। তবে না চিনে থাকলেই ভালো। নইলে মিছিমিছি ফের কেলেঙ্কারী। কজনের মুখে সে হাত চাপা দিতে পারবে ?

বনমালী বাড়ি এলো সন্ধ্যের মুখে। কারখানা থেকে ফিরতে এমনি সময় হয়। মানুষটা ভালো। ধীর, স্থির। কম কথা বলে। কারো সাতে-পাঁচে নেই। খালের ধারে একটা কীর্তনের দলের গান বাজনা হয়। রাত আটটা নাগাদ বনমালীর সেখানে হাজির হওয়া চাই। গানের গলা তার নেই। তবে বাজনাতে হাতটি ভারী মিঠে। কীর্তনের দলে খোল বাজায় বনমালী। বাড়ি ফিরতে একদিন রাত্তির সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যায়।

বাড়ি ঢুকতেই পিতুর মা ঠিক ওত পেতে থাকা বাঘিনীর মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখখানা বিকৃত করে বলল,—'ধন্যি বাপ হয়েছিলে যা হোক।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকা মানুষের মতো বউয়ের মুখের দিকে তাকায় বনমালী, অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করে,—'কী হয়েছে ?'

—'হতে আর কী বাকি রইল ?' পিতুর মা তার কপাল চাপড়ে বলল,—'তোমার মেয়ের পষ্টাপষ্টি কথা। জামাইয়ের মুখের ওপর জবাব দিল, সতীন থাকতে সে কোনোদিন সোয়ামীর ঘর করতে যাবে না।'

বনমালী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'জামাই এসেছিল নাকি ?'

—'হ্যাঁ।' বিরক্তির সঙ্গে স্বামীর মুখের দিকে একনজর তাকাল পিতুর মা। ফের বলল,—এসেছিল বউকে নিতে। কিন্তু ওই জবাব শুনে তোমার মেয়েকে আজে-বাজে বিশ্রী কতকগুলো অপমান করে রেগে-মেগে চলে গেছে।'

বনমালী চুপ করে রইল। কোনো উত্তর দিল না। পিতুর মা স্বগতোক্তির মতো বলল,—'আমার পোড়া কপাল আর তোমার ভাগ্যি।'

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ। তারপর স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক ফৌজদারী উকিলের মতো সে জিজ্ঞাসা করল,—'ছেলেটার যে আগে আর একবার বিয়ে হয়েছিল সে খবর তুমি জানতে পারনি ?'

বনমালী অসহায় ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ল।

পিতুর মা স্বামীকে আরো কোণঠাসা করতে চাইল। বলল,—'জলজ্যান্ত একটা বউ বেঁচে থাকতে কেউ সেখানে মেয়ের বিয়ে দেয় ? এরপর পাড়ার লোকে বাড়ি বয়ে এসে বলে যাবে, মেয়েটার হাতে একটা দড়ি-কলসী দিতে পারনি ?'

বনমালী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল,—'বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সেই ভুলের বোঝা যে সারা জেবন আমাকেই বইতে হবে। তোমার ওই সোমত্থ মেয়েকে নিয়ে এখন কী করব বলতে পার?' এক মুহূর্ত থামল পিতুর মা। ফের এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফিসফিস করল, —'তিন মাস সোয়ামীর সঙ্গে সহবাস,—এক শয্যে, এক বিছানা। বাঘের মতো নোনা রক্তের স্বাদ পেয়েছে। এখন এই ভরা যুবতী মেয়ে যদি ভুল করে একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসে? তখন মুখে যে চুনকালি পড়বে।'

তবে সে রকম কিছু ঘটে নি। প্রথম প্রথম মেয়েকে চোখে-চোখে রাখত পিতুর মা। ঘর থেকে বেরোতে চাইলেই টিক-টিক করতো, কোথায় যাবে শুধোত। সময় থাকলে নিজেই সঙ্গে নিয়ে যেত। কিন্তু পরে বুঝতে পারল, পিতু সেই মেয়ে নয়। ভাঙবে, তবু মচকাবে না। নইলে শুধু একটা সতীন রয়েছে বলে চিরকালের জন্য সোয়ামীর সঙ্গে কেউ সম্পর্ক ত্যাগ করে?

অবশ্য জামাই আরো একবার পিতুকে ঘরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। সেই ঘটনার মাস ছয়-সাত পরে। বীরেন নিজে আসেনি। তার এক দূর সম্পর্কের দিদিকে এখানে পাঠাল। মেয়েটা নানা রকম মিষ্টি কথা বলে পিতুর মন ভেজাতে চেষ্টা করল। ঘরে সতীন থাকল তো কী হয়েছে? সংসারের দু-একজন কাজের লোকের দরকার। সে থাকবে গেরস্থালীর প্রয়োজনে। ঘরকন্নার কাজ হবে পিতুর হুকুম মতো। তাহলে নিশ্চয় আর কিছু বলার থাকে না। বিশেষ করে তার ভাই বীরেন যখন প্রতিমা বলতে অজ্ঞান। নেতুন বউয়ের জন্য তার মনটা যে এখনও কাঁদে।

কিন্তু পিতুর ধনুক-ভাঙা পণ। সতীন থাকতে সোয়ামীর ঘরে সে কোনোদিন যাবে না।

বিরক্ত হয়ে পিতুর ননদ মুখ বেঁকিয়ে তাকায়। বলে,—'ধন্যি মেয়ে বাবা। ঘরে একটা সতীন রয়েছে, তাইতে এমন আদিখ্যেতা জন্মে দেখিনি।' ফের চোখ ঘুরিয়ে পিতুর উদ্দেশে মন্তব্য করে,—'তবু তো সতীন, ভদ্দর ঘরের মেয়ে। কত পুরুষের শুনি বারটান থাকে। আমার ভাই যদি লুকিয়ে একটা রাঁড়-মেয়েমানুষের কাছে যেত, তাহলে কী করতে?'

উত্তরে পিতু কী যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগে পিতুর সেই ননদ রাগে গরগর করতে করতে রাস্তায় নেমে গেল।



বসন্তবিলাস রোডের মুখে হীরালাল সাহার বাড়ি। শুধু বাড়ি বললে কিঞ্চিৎ মর্যাদাহানি হয়। হীরালালের এই আলয় প্রকৃতপক্ষে অট্টালিকা। চারতলার প্ল্যান, তবে হীরালাল এখনও তিনতলা পর্যন্ত তুলে ক্ষান্ত আছে। কিন্তু সেই ত্রিতল গৃহখানি সুদৃশ্য, চোখজুড়ানো বলা যেতে পারে। রাস্তার ডাইনে বাড়ি, ঢুকতেই গেট। তার উপরের দিকটা খিলানের ঢঙে তৈরি। মস্ত বোগোনভিলিয়া লম্বা প্রকাণ্ড এক পাহাড়ী অজগরের মতো গেটটাকে উপরে-নীচে সাপটে ধরে আছে। প্রায় ছ-কাঠা জমির ওপর হীরালালের বাড়ি। সামনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাগান, পাতাবাহারের ঝোপ আর নানা রকম গাছ। তার মধ্যে শিউলি, জবা, করবী, চাঁপা, স্থলপদ্ম, জাপানী আর চীনা বেলও আছে। কোণের দিকে একটা সিঙ্গাপুরী রঙ্গন, বিজ্ঞাপনের সুন্দরী মেয়ের মতো বারোমাস সেটা সিঁদুরে রঙের অজস্র ফুলে সেজে থাকে।

হীরালালের এই বাড়িটা বছর ছয় সাত হ'ল তৈরি হয়েছে। আগে রাসমণি বাজারের পিছনে অবিনাশ দত্ত রোডে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকত। একতলায় ছোট ছোট চারখানা ঘর। বাড়ির ভিতরে কল নেই, রাস্তা থেকে জল ধরে নিতে হয়। কিন্তু অমন ঘুপচি ঘরে হীরালাল পড়ে থাকবে কেন? তার হ'ল পাতা চাপা কপাল। দমকা বাতাসে পাতাটা উড়ে যেতেই কপাল দিব্যি চওড়া হয়ে গেল। দিনে দিনে ব্যবসার বাড়-বাড়ন্ত। মাত্র কয়েক বছরেই হীরালাল যেন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তাই বসন্তবিলাস রোডে ছ কাঠা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এই বাড়ি তৈরী শুরু করল। কাগজে-কলমে ঠিকা প্রজা, কিন্তু বাড়িখানার যা চেকনাই, তাতে শুধু প্রজার নিবাস বললে একটা হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াবে। কর্পোরেশন থেকে চারতলার একটা প্ল্যান গলিঘুঁজি দিয়ে বের করে এনেছে। কিন্তু তবু হীরালাল তিনতলার বেশী অগ্রসর হয় নি। তাও একতলা আর দোতলায় ছখানা করে ঘর। তার ওপরে মাত্র দুখানি ঘর তুলেই হীরালাল ক্ষান্ত হয়েছে। ধীরে-সুস্থে রয়ে-সয়ে চলতে হয়। একলাফে অতদূরে না ওঠা ভালো। তত্ত্বকথা হলেও হীরালাল তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, এবং মেনে চলে। নইলে চারতলা কেন, সত্যি কথা বলতে একটা সাততলা বাড়ি তৈরির টাকা তার

মজুত আছে। তবে বসতবাড়ির পিছনে বেমক্কা এক কাঁড়ি টাকা ঢালা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশেষ করে যাদের ব্যবসা আছে, বিজনেসে টাকা খাটে। তারা নিশ্চয় এমন মূর্খামি করতে বলবে না। নইলে একসময় হীরালালকেও চড়া সুদে বাজার থেকে টাকা হাওলাত করতে হয়েছে। এখন নিজে যদি মহাজনী কারবার খুলে বসে, তাহলে চার আনা সুদে টাকা ধার নেওয়ার জন্যে কত বেটা এসে দরজায় হত্যে দিয়ে পড়বে। তবে শুধু যেলগ্নী টাকা বন্দী হয়ে গেল বলে হা-হুতাশ তা নয়। আসলে চিন্তা অন্য কারণে। দেশের হাওয়া দিনে-দিনে কেমন গরম হয়ে উঠছে। বিষয় সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি তৈরী করতে গেলে হাজার ঝুট-ঝামেলা। বাজারে সিমেণ্ট নেই, কিন্তু কালোবাজারে অঢেল। আবার সেই দু-নম্বর সিমেণ্ট নিয়ে যদি কাজ শুরু কর, তাহলে পুলিশের খপ্পরে যেতে হতে পারে। তারপর ইনকাম ট্যাক্স। কোথা থেকে এত টাকা এল, কিফিয়ত দাও। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব? ব্যবসার টাকা কী কলের জলের মতো, সর্বসমক্ষে শুধু একটা নল দিয়ে পড়বে? কুটনী মেয়েমানুষ যেমন গোপন পিরীতের মাধ্যম, ব্যবসাও তেমনি খোলা রাস্তার চেয়ে চোরাগলি, বাঁকা পথে ভালো জমে। কিন্তু সে কথা ফাঁস করলে প্রায় ভূমিকম্প হতে বাকি থাকবে। তার মানে আর এক ফৈজৎ। তারপর আরো ঝামেলা আছে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, যাত্রাগান, ফুটবল খেলা, নানা ফাংশনে চাঁদার উৎপাত। এতবড় বাড়ির মালিককে লোকাল মস্তানরা কখনও সহজে রেহাই দিতে চাইবে?

ভোরের আমেজ কাটিয়ে যখন সকাল হতে শুরু করে, হীরালাল তার বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে বসন্ত বিলাস রোডে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিন এক দৃশ্য। আদুড় গা, পরণে একটা গামছা। হাতে দাঁতনকাঠি। হীরালাল তার সাহায্যে মাড়ি এবং উপরের অংশও ঘষে। না, টুথ-ব্রাশ নেওয়ার অভ্যাস তার কস্মিনকালেও নেই। থাকবে কেমন করে? ছেলেবেলা কেটেছে প্রায় দারিদ্র্য-সীমায়। দু-বেলা ভাত-তরকারি জুটত, সেই ঢের। দাঁত মাজতে টুথ-ব্রাশ আর পেস্ট কে কিনে দিচ্ছে? দাঁতন ঘষতে ঘষতে পাড়ার দু-একজন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। হীরালাল দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে। ততক্ষণে ড্রাইভার বাড়ির ভিতরের গ্যারেজ থেকে গাড়ি দুটোকে স্টার্ট দিয়ে বের করে এনে রাস্তার ওপর দাঁড করায়। গাড়ি দুটো ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে তোলার জন্য মাইনে করা লোক আছে। তবু রাস্তার কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে হীরালাল, নিজে গাড়ি পরিষ্কার করতে লেগে যায়। বালতি ভর্তি করে জল এনে চাকার গায়ে সজোরে ছুটে মারে। নতুন ক্লীনার হলে মনিবের কাণ্ডকারখানা দেখে থ' বনে যায়। হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে। বলে,—'করেন কী বাবু? আপনি সরে

দাঁড়ান তো দিকি। এখুনি সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছি।'

হীরালাল কোনো জবাব দেয় না। মুচকি হাসে। বালতি বালতি জল এনে ফুলকাবে ঢালে। কোনোদিন শুধু ঘাড় ফিরিয়ে বলে,—'যা, বাড়ির ভিতর থেকে গাড়ির পালিশটা বরং নিয়ে আয়। দিই শালা আজ একটু স্নো-পাউডার মাখিয়ে। সুন্দরী মেয়ে মানুষের মতো পাবলিকের চোখ টানবে।'

দুখানা গাড়ি আছে হীরালালের। অফিসের সাহেবসুবোর মতো গাড়ি দুটো সর্বদাই ফিটফাট। পিছনে সবুজ ভেনেশিয়ান ব্লাইণ্ড। গদিতে ফুলের নকশা-আঁকা কভার পরানো। পাশেই রঙচঙে ছ-ইঞ্চি ব্লেডের পাখা। সুইচ অন করলেই সুদর্শন চক্রের মতো সেটা বনবন করে ঘুরতে থাকে। তাছাড়া গাড়ির সঙ্গে রেডিও এবং টেপ রেকর্ডার। পিছনের সীটে মাথার কাছে একটা ছোট্ট সাউণ্ড বক্স। ইচ্ছে মতো গান-বাজনা শুনতে পার।

একখানা গাড়ি হীরালাল নিজে ব্যবহার করে। আর একটা টার্নবুল কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়া আছে। মাস ফুরোলেই করকরে আড়াই হাজার টাকা ঘরে আসে। গাড়ি এবং ড্রাইভার তার। কোম্পানীর ফুয়েল। ওই গাড়িটা নিখিল চালায়। হপ্তায় ছ-দিন ডিউটি। রবিবার কোম্পানীর গাড়ি লাগে না। সেদিন ওটা হীরালালের দখলে, তার ফরমাস খাটে। গাড়ির অবশ্য অনেক খদ্দের। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, থানার দারোগাবাবু, ট্যাক্স-আপিসের হাকিম। আজকাল বাবু ভাইরাও গাড়ি তলব করতে শিখেছে। না দিলে ক্ষতি, হীরালালের ফাইলটাকে তারা বেমালুম হাপিস করে দিতে পারে। ইনকাম ট্যাক্সের এক সাহেবের মাছ ধরার প্রচণ্ড নেশা। ভদ্রলোকের নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। মাসে একটা রবিবার হীরালালের গাড়ি তার চাই। সকাল আটটা নাগাদ নিখিল সেখানে চলে যায়। বন্ধু-বান্ধব, মাছের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে সাহেব বেরিয়ে পড়ে। এক একদিন ব্যাণ্ডেল, হুগলী পেরিয়ে বর্ধমানের কোনো গ্রামে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসে।

মাছ ধরার বাতিক হীরালালের কিঞ্চিৎ আছে। তবে ওই চক্রবর্তী সাহেবের মতো মাছের নেশা তাকে পেয়ে বসে নি। বঁড়শী কাঁধে নিয়ে হীরালাল অমন কাঁহা কাঁহা মুলুক চষে বেড়ায় না। তার মাছ ধরার একটা আভিজাত্য আছে। দলবল নিয়ে সে যায় বেলেঘাটার লেকে, যার নাম এখন সুভাষ সরোবর। রীতিমতো টিকিট কেটে মাছ ধরতে হয়। তা হীরালাল আগেই তিন-চারখানা টিকিট কিনে নেয়। কারণ ছিপ নিয়ে সে একা বসে না। তার সঙ্গে ভাড়া করা দু-তিনজন লোক থাকে। কাছাকাছি তারাও চার ফেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। কেউ তকলি দিয়ে মাছ ধরে। টোপ মাখানো মস্ত কাঁটাখানা সুতোয় ঝুলিয়ে দু-

তিনবার শূন্যে ঘুরিয়ে দূরে জলের ওপর ঝপাং করে ফেলে দেয়। হীরালাল না পারলেও সমস্ত দিনে অন্তত গোটা দুই মাছ তার লোকেরা ঠিক গেঁথে খেলিয়ে ডাঙায় তুলবে। মাছ ধরার নানা রকম সরঞ্জাম আছে হীরালালের। এই তো গত বছর জাপান থেকে কাকে দিয়ে যেন দুটো বঁড়শী আনিয়েছিল। তারপর জলের কিনার থেকে মাছ টেনে তোলার নাইলনের ছাঁকনি জাল। হীরালাল যেখানে ছিপ নিয়ে বসে, তার পাশেই একটা ট্রানজিস্টার চালিয়ে দেয়। গান হয়, শনি-রবিবারে নাটক। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা বয় গোছের ছোঁড়া সকলের জন্য চা আনে। খিদে পেলে গরম চপ, ফিসরোল, কখনও কাছাকাছি দোকান থেকে সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের গোটা পাঁচ-ছয় পিস্ বেশ কড়া করে ভাজিয়ে এনে খায়। যেদিন বড় একটা মাছ টোপ গিলে ফেঁসে যায়, সেদিন এলাহী কাণ্ড। মাছটা সামনে ঝুলিয়ে দুজন লোক আগে আগে যায়। পিছনে হীরালাল এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। বসন্তবিলাস রোডে সে প্রায় দিগ্বিজয়ী বীরের মতো এক রাজকীয় মর্যাদায় প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে মৎস শিকারের খবর পাড়ার সর্বত্র চাউর হয়ে পড়ে। অনেকেই মাছ দেখতে বাড়িতে আসে। হীরালাল খুশী হয়। কাউকে শুধু হাতে যেতে দেয় না। দু-টুকরো, চার-টুকরো যেমন পারে পাড়ার লোককে বিলি করে। খবর পেলেই পিতুর মা ছুটে আসে। বলে,—'অ হীরে দাদা। কই, কত বড় মাছ ধরলে দেখি?' তারপর ছ-সাত কিলো ওজনের রুই কিম্বা কাতলা মাছটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে গালে হাত রেখে মন্তব্য করে,—ও বাবা! এ যে পেকাণ্ড মাছ গো।'

শুনে হীরালাল হাসে, সন্তুষ্ট হয়। প্রশংসা কার না ভালো লাগে? পিতুর মা ফের স্বগতোক্তির মতো বলে,—'তা হীরে দাদা নইলে এতবড় মাছ ধরার মুরোদ কার আছে?

হীরালাল জানে এই সময়টা তাকে খুশি করার জন্য পিতুর মা নানা রকম বুলি ছাড়ে। বড় মাছ উঠেছে শুনলেই সে কোথা থেকে যেন অতি দ্রুত চিলের মতো ডানায় ভর করে এখানে চলে আসে। ইচ্ছে করেই হীরালাল তাকে দু-টুকরো বেশী মাছ দেয়। কম হলে পিতুর মা অবশ্য ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

এক গাল হেসে বলে,—'অ হীরে দাদা। এই চার টুকরো মাছে কী হবে? আমার কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নীদের জন্যেও তো আরো দু-টুকরো চাই।'

হীরালাল আপত্তি করে না। মাছ থাকলে দু-টুকরো কেন, আরো চার-টুকরো পিতুর মায়ের হাতে তুলে দেয়। আসলে এই বসন্তবিলাস রোডের সব গেরস্থ বাড়ির হাঁড়ির খবর তার জানা আছে। দু-পাঁচ জনের কথা বাদ দিলে

বাকি অনেকের ওই পিতুর মায়ের দশা! নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কোনোমতে দিন চলে। বাজারে গিয়ে ভালো কাটা পোণা কিনে আনবে এমন সঙ্গতি কোথায়? আর দিনে দিনে বাজার যা আক্রা হচ্ছে, সব যেন আগুন। কিছুতে হাত দেবার উপায় নেই। এরপর হয়তো তাদের মতো মনুষ্য-প্রাণীকে না খেয়ে মরতে হবে। এখানের যারা বাসিন্দা, তারা অনেকেই রোজ বাজারে যায় না। গেলেও কুচো চিংড়ি, ছোট পুঁটি কিম্বা গেঁড়ি-গুগলি কিনে আনে। হীরালাল যেদিন বড় মাছ ধরে সেদিনকার সন্ধেটা এদের কাছে মধুর হয়ে ওঠে। ভাজা মাছের গন্ধে ছেলেমেয়েদের জিভে লালা সরতে শুরু করে।

সত্যি বলতে ওপার কলকাতার এই সব অনুন্নত এলাকায় এখনও একটা আত্মীয়তার মতো বন্ধন রয়েছে। মহানগরীর প্রবাহমান জীবন স্রোত যেখানে প্রতিটি পরিবারকে নিয়ত এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা করে তুলছে, সেখানে অতি নিকটে এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি ধারা। এখানে কিছুদিন থাকলে ছেড়ে-আসা গ্রামের কথা হয়তো মনে পড়বে। একদা যেখানে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা আন্তরিক সম্পর্ক সহজেই গড়ে উঠত, নগরকেন্দ্রিক জীবন আজ তা নিঃশেষে মুছে দিয়ে মানুষকে আত্মসুখ-সর্বস্ব করে তুলেছে। তবে এই বসন্তবিলাস রোডের কথা ব্যতিক্রম। যেন মস্ত একটা গাছ, তলে তলে যার শেকড়টা বড় রাস্তা থেকে সেই খালের ধার পর্যন্ত চলে গেছে। আর পথের দুপাশে ছোট-বড় নানা পরিবার সেই শেকড় থেকে উদ্ভূত এক-একটি চারা। কেউ বা শীর্ণ, জীবনের পুষ্টি থেকে বঞ্চিত। আবার কেউ সবল, স্বাস্থ্যশ্রীতে উজ্জ্বল। প্রবর্ধমান প্রাণের লাবণ্যে টই-টম্বুর।

গাড়ি ধোয়া মোছা শেষ। রাস্তার কলে হাত-মুখ ধুয়ে হীরালাল এবার তার বাড়ির দিকে এগোল। হাতে ঘড়ি নেই। কিন্তু সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। একটু আগেই রেডিওতে খবর শেষ হ'ল। আর খানিক পরেই নিখিল এসে পড়বে। গাড়ি নিয়ে সে রওনা হয়ে যাবে উড্ স্ট্রীটের দিকে। সেখানে টার্ণবুল কোম্পানীর নামে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া আছে। মিঃ পারেখ সেই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। পুরো নাম সি, এস, পারেখ। গুজরাতি ভদ্রলোক। টার্নবুল কোম্পানীর সেক্রেটারী। কী সব বিলিতী ডিগ্রী আছে। পারেখ সাহেবের সঙ্গে হীরালাল একদিন অফিসে দেখা করে এসেছিল। এমনিতে চমৎকার মানুষ। অফিসে নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরেন। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে তার নিজের পছন্দ একটি বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগার। ভীষণ পাংচুয়ালিটির ভক্ত। যেদিন এক-আধটু দেরি হয়, সেদিন নিখিল প্রায় ঝড়ের বেগে গাড়ি নিয়ে উড্ স্ট্রীটের

দিকে ছোটে। সাড়ে আটটা বাজলেই পারেখ সাহেব বেরিয়ে পড়বেন তার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসের উদ্দেশে। আর এক মিনিটও তর সইবে না। গাড়ি না পৌঁছলে ট্যাক্সি। নটা বাজবার বেশ কিছুক্ষণ আগে নিজের কামরায় চেয়ারে না বসলে তার স্বস্তি নেই।

নিখিলের একটু দেরী হলে হীরালাল নিজেই অস্থির হয়, ছটফট করে। দরজায় দাঁড়িয়ে বারবার রাস্তার দিকে তাকায়। নিখিল এলে গাড়ির চাবিটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে,—'যা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড। আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি না পেলে পারেখ সাহেব রাত্তিরে ফোন তুলে খচাখচি করবে।'

তার ব্যস্ত ভাবভঙ্গি দেখে কখনও নিখিলের মজা লাগে। সে মুখ টিপে হাসে। কোনো দিন আবার রাগ করে জবাব দেয়—'দেরি হলে তো উপায় নেই। বরানগর থেকে এতখানি রাস্তা আসতে হয়। মাঝখানে দুবার বাস-বদল। তারপর ধরুন বাড়িতে হঠাৎ কারো অসুখ, কিম্বা আমারও তো জ্বর-জাড়ি হতে পারে। তাছাড়া পথের মধ্যে গাড়ি যদি গড়বড় করে?'

কৈফিয়ত অমন কত আছে। কিন্তু টার্নবুল কোম্পানী নিশ্চয় সে কথা শুনবে না। তারা পয়সা গুনে দিচ্ছে। টাইমে গাড়ি চায়। না পাঠাতে পারলে কথার খেলাপ, টেলিফোনে দুটো চড়া বুলি তাকে বেমালুম হজম করতে হবে। তাই হীরালাল কোনো মন্তব্য করে না। চুপ করে থাকে। তবে ওটা তার স্বভাব। একবার যা বলে, তাই ঢের। কথা নিয়ে রগড়ানো আদপেই পছন্দ নয়। অসহ্য হলে হীরালাল বরং সেখানে থেকে উঠে যায়। তবু জুৎসই জবাব তার মুখে আসে না।

বাড়িতে ঢোকার আগেই হীরালাল চামেলীকে দেখতে পেল। বড় রাস্তা থেকে বসন্তবিলাস রোডে ঢুকছে। গতকাল নিশ্চয় নাইট ডিউটি ছিল চামেলীর। কিন্তু তাই বলে বাড়ি ফিরতে এতখানি বেলা হওয়ার কথা নয়। সাড়ে সাতটা কখন বেজে গেছে। অন্তত আরো এক ঘণ্টা আগে চামেলীর ফেরা উচিত ছিল। চুক্তিমতো রাত্তির নটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি। তারপর চামেলীর ছুটি। আর কাঁকুড়গাছি থেকে রাজা বসন্তবিলাস রোডে আসতে বাসে বড় জোর দশ মিনিট লাগতে পারে। তাহলে এতখানি সময় চামেলী কোথায় ছিল? হীরালাল ভ্রু কুঁচকে কথাটা চিন্তা করল।

কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল চামেলী। শুধোল,—'আপনার গাড়ি ধোয়া হয়ে গেল?'

আগে হীরালালের সঙ্গে এমন চোখ তুলে কথা বলত না চামেলী। পথেঘাটে

দেখা হলে বড়জোর এক পলক তাকিয়ে অন্য দিকে সরে দাঁড়াত, তারপর এই বছরখানেক আগে কাঁকুড়গাছিতে প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমে চাকরি নেবার পর মেয়ে মানুষের ঘোমটা খসে যাওয়ার মতো তার লজ্জা-সঙ্কোচের বালাইটুকু চলে গেল। চামেলীর চলার ভঙ্গি, কথা বলার ঢঙ সব পালটাল। অবশ্য এই বসন্ত-বিলাস রোডে প্রথম যখন বউ হয়ে এসেছিল তখনও তার ভাবগতিক অনেকের চোখে সুবিধের মনে হয় নি। পথেঘাটে পাড়ার বয়স্ক পুরুষমানুষের সামনে পড়লে মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিত না। রাস্তার কল থেকে জল নেবার সময় হঠাৎ কোনো লোক এলে আর পাঁচটা বৌ-ঝির মতো সঙ্কোচে একপাশে সরে দাঁড়ায় নি। দিব্যি পায়ের গোছের ওপর খানিকটা কাপড় তুলে কলের মুখে হাঁড়ি-কলসী পেতে জল ধরত। এককালে তাই নিয়ে পাড়ার বৌ-ঝিরা কম সমালোচনা করে নি। আর ভুবন পিসী তো একদিন স্পষ্ট বলে দিল,—'অ নগেন, এ কেমন মেয়ে ধরে নিয়ে এলি? পুরুষ মানুষ দেখলে এ যে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।'

সেই চামেলী যে একদিন জামা-জুতো পরে কুঁচি দেওয়া শাড়ি অঙ্গে পেঁচিয়ে নার্সিং হোমে ডিউটি করবে বছর দুই আগেও তা চিন্তা করে নি। হঠাৎ নগেনের ওই অসুখটা ধরা না পড়লে চামেলী হয়তো পাড়ার আর পাঁচটা বৌয়ের মতো দুবেলা রাস্তার কলে বাসন মাজত। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সংসারের হাঁড়ি ঠেলত। ফি-বছর হাসপাতালে গিয়ে নতুন বাচ্চাকে সযত্নে কাঁথায় জড়িয়ে ঘরে ফিরত। তারপর গিন্নিবান্নি হলে, লজ্জাশরম ঘুচলে খালি গায়ে শীতের রোদ্দুরে পিঠ পেতে ছোট মেয়েকে মাথার চুলের উকুন বেছে দিতে বলত। কিন্তু কাশতে গিয়ে নগেনের মুখ থেকে হঠাৎ একদিন কয়েক ফোঁটা রক্ত থুতুর সঙ্গে ছিটিয়ে পড়তেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক হলে হয়তো তেমন চিন্তার কারণ ছিল না। পাশের ঘরের অনঙ্গ খুড়ো তাই বলেছিল,—'আহা! জোরে কাশতে গেলে গলা চিরে দু-এক ফোঁটা রক্ত অমন পড়ে। সে নিয়ে অত চিন্তা ভাবনার কী আছে? কিন্তু চামেলীর মন তাতে প্রবোধ মানে নি? মাস তিন-চার ধরে নগেনের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। রাত্তির বেশী হলেই কাশিটা বাড়ে। আর শব্দটা কেমন বিশ্রী। গলার ঘড়ঘড়ে কাশি নয়। শুনলে মনে হবে শরীরের আরো গভীর থেকে শব্দটা উঠে আসছে। তাছাড়া প্রায়ই তো ঘুষঘুষে জ্বর। রাত্তিরে কতদিন চামেলী টের পায় মানুষটা ঘামছে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যেতেই সন্দেহের নিরসন হ'ল। বুকের একটা ছবি তুলে আনতেই ব্যামো ধরা পড়ল। ডান দিকের ফুসফুসে রোগ বাসা

বেঁধেছে। তবে এখনও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ঠিকমতো চিকিৎসা হ'লে আর ওষুধপত্র খেলে কয়েক মাসের মধ্যেই রোগী সেরে উঠতে পারে।

বাড়ি ফিরে সেদিন মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল চামেলী। সংসার অবশ্য তেমন বড় নয়। স্বামী-স্ত্রী আর দুটি মেয়ে। বড়টির বয়স বছর সাতেক, ছোটটি চার বছরে পা দিয়েছে। নগেন একটা ছাপাখানায় মেসিনম্যানের কাজ করে। এমনি মাইনে ছাড়াও ওভারটাইম আছে। পুজোর সময় এক মাসের মাইনে বোনাস। তখন মাস গেলে চার'শ—সাড়ে চার'শ টাকা ঘরে আনত। তাই থেকে বাড়িভাড়া, খাওয়াপরা, জামাকাপড়, ইদিক-সেদিক বজায় রেখে উদ্বৃত্ত বলতে তেমন কিছু হাতে থাকে নি। তাছাড়া চামেলী হ'ল দ্বিতীয় পক্ষের বউ। নগেনের প্রথম পক্ষের একটা ছেলে আছে। সে মামাবাড়িতে মানুষ হচ্ছে। মাস গেলে তার নামেও পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাঠাতে হয়। ভাত-তরকারির জন্য নাই হোক, একটা ছেলের জামা কাপড, প্রাইভেট পড়া, বই-খাতা, ওষুধ-পথ্যি সবই তো লাগে। টাকা না পাঠালে মামারা হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু বাপের তো একটা কর্তব্য আছে।

নগেনের সঙ্গে চামেলীর বয়সের ফারাক প্রায় বারো বছর। তার প্রথম পক্ষের বউয়ের একটা ছবি আছে বাড়িতে। অনেকদিন আগেকার ছবি। চামেলী সেটা দেখেছে। বিয়ের পর নগেন বউকে সঙ্গে নিয়ে ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি তুলতে গিয়েছিল। প্রথম পক্ষের সেই বউয়ের নাম আরতি। দেখতে শুনতে এমন 'আহামরি' কিছু নয়। ঢ্যাঙা, মুখখানা ঈষৎ লম্বাটে। মসলন্দপুরের মেয়ে। বাপের জমিজমা, চাষ-আবাদ, হাল-বলদ সবই আছে। তবে একটা কথা চামেলী প্রতিবেশীদের কাছে বহুবার শুনেছে। সেই বউ নাকি ভারী শান্ত আর লক্ষ্মী মেয়ে ছিল। তার উঁচু গলা পাড়ার কেউ কোনোদিন শোনে নি। হঠাৎ কী যেন একটা খাপছাড়া ব্যাধি এসে জুটল। সন্ধ্যের পর থেকেই তিন-চার জ্বর। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। ঘাড়ের কাছটা ক্রমেই শক্ত হতে লাগলো। ডাক্তার-বদ্যি নগেন সবই করেছিল। খবর পেয়ে মসলন্দপুর থেকে বাপ আর ভাইরা ছুটে এলো। দিন-রাত্তির ওষুধ আর ইনজেকশন। যমে-মানুষে টানা-টানি। তবু তিন দিন মাত্র অসুখে ভুগেই নগেনের সেই পরিবার সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। বউ মরতে নগেন নাকি ছেলেমানুষের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। দু-দিন ঘর থেকে বেরোয় নি।

তারপর বছর না ঘুরতেই নগেন ফের বিয়ে করল। দোজবরে, তায় বয়েসটা একটু বেশী। কিন্তু তাই নিয়ে চামেলীর কাকা একবারও খুঁতখুঁত করল না। এর চেয়ে ভালো পাত্র ভাইঝির জন্য সে কী আশা করেছিল? মা-বাপ তো

করে ফৌৎ। এতদিন মেয়েটাকে খাইয়ে-পরিয়ে তাকেই মানুষ করতে হয়েছে। এখন ওকে পাত্রস্থ করতে পারলে ল্যাঠা চুকে যায়। আর বয়স ?

পুরুষ মানুষের আবার বয়স ধরতে আছে নাকি ? তাছাড়া চামেলীর বয়সও প্রায় পঁচিশ পূর্ণ হতে চলল। দোজবরে তো কী হয়েছে ? ও পক্ষের একটি মাত্র ছেলে। সে মামাবাড়িতে মানুষ হবে।

তাহলে ?

নেমন্তন্ন খেতে এসে ভুবনপিসী বলল,—'অ নগেন, এ তো খাসা মেয়ে ঘরে এনেছিস।' ফের তার স্বামীকে কাছে ডেকে ঠাট্টা করল,—আহা ! এতদিন বেচারীর মুখখানা কী শুকনো লাগত। আজ একটু হাসি ফুটেছে। তা বুঝলি, ঘরে বউ না থাকলে পুরুষ মানুষকে মানায় না। কেমন যেন বাউণ্ডুলে, উড়নচণ্ডে মনে হয়। তবে নজর রাখিস। সুন্দরী বউ, ময়না যদি শেকল কেটে পালিয়ে যায় তাহলে তুই নির্ঘাত বিবাগী হবি।'

সুন্দরী না হলেও চামেলীর মধ্যে কী যেন একটা আকর্ষক বস্তু লুকিয়ে আছে। তার মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সমস্ত কিছু আলাদা করে বিচার করলে হয়তো সুন্দর বলা চলে না। কিন্তু সব মিলিয়ে আবার এমন একটা কিছু রয়ে গেছে যাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। চামেলী হাসলে গালে টোল পড়ে না। তার চোখ দুটি সাধারণ, এমন কিছু টানা-টানা নয়। নাক বাঁশীর মতো বললে সত্যের অপলাপ হয়। চামেলী যখন হাঁটে, ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু তুলে তাকায় তখন ভারী সুন্দর লাগে। আসলে তার শরীরের মধ্যে কোথায় যেন একটা ছন্দের বাঁধন আছে, যা তাকে সহজেই আকর্ষক করে তোলে। মেয়েদের এই আলগা শ্রী কখনও পটের বিবিকেও হার মানায়।



নগেনের সেই অসুখটা ধরা পড়বার পর সংসারে একটা অভাবের ছায়া পড়ল। আয় নেই, অথচ অমন শক্ত ব্যামোর ওষুধ-পথ্যির জোগান চাই। তা সে রাজরোগ যে বলে তাই। চিকিৎসার যা বহর। প্রায় শতখানেক ইনজেকশন নিতে হবে। আর ওষুধ ? সেও দিনে পাঁচ-সাত টাকার মতো। অন্তত এক

বছর, নিদেনপক্ষে ছটি মাস চালাতে হবে। নইলে বিরক্তিকর আত্মীয় বন্ধুর মতো ব্যাধি আবার দরজায় উঁকি দেবে।

আয়ের রাস্তা বন্ধ। অথচ খরচ ঠিক কম্প দিয়ে আসা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো হু-হু করে বেড়ে গেল। সংসার আর চলে না। ছেঁড়া কাপড় টেনেটুনে পরে লজ্জাশরম বাঁচানোর চেষ্টা। খরচ শুরু হতেই অভাব যেন চারিদিক থেকে 'হাঁ' করে গিলতে এলো। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। শেষ পর্যন্ত পিতুর মা তাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিল। বেলেঘাটা লেকের কাছে ডাক্তার বসাকের বাড়িতে রান্নার জন্য একজন লোক খুঁজছিল। ছোট সংসার। সকালে রান্না সেরে সে নিজের বাড়িতে চলে আসতে পারে। ফের বেলা চারটে নাগাদ গিয়ে আবার রাত্তিরের রুটি-তরকারি তৈরি করা হলে ছুটি পাবে। খাবার-দাবার গিন্নি নিজের হাতে সাজিয়ে দেয়। তার জন্য চামেলীকে অপেক্ষা করতে হবে না। তখন যা পায়, ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো তাই আশ্রয় করে। তবে ডাক্তার বসাকের বাড়িতে মাইনে-পত্র ভালো। মাস ফুরোলেই ষাটটি টাকা। তাই শুনে চামেলী এক কথায় রাজি। কাজটা নিল ঠিক, কিন্তু নগেনের রোগ-অসুখের কথা বেমালুম চেপে গেল। আসলে পিতুর মা তাকে যাবার সময় টিপে দিয়েছিল। সোয়ামীর ব্যামোর কথা যেন বাবুদের বাড়িতে গিয়ে না বলে। রোগ-ব্যাধির ঘটনা শুনলেই বড়মানুষেরা ভড়কে যায়। এমন ভঙ্গি করে যেন তাদের ঘরে আধি ব্যাধি কস্মিনকালে ঢোকেনি। আর বস্তির গরীব মানুষের সংসারে এক-আধটা অসুখ তো লেগেই আছে। অমন কত হয়, আবার এমনি সারে। তাই নিয়ে কেউ মাতামাতি করে না। নেহাৎ নগেনের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। রাত্তিরে ঘঙ-ঘঙে কাশির শব্দটা অনেকের ভালো ঠেকেনি। তাই এত চিকিৎসা-পত্তর, ওষুধ-পথ্যি। নইলে ভাতে-জলে অমন কত রোগ ভালো হচ্ছে, ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। এক-আধটু জ্বর-জাড়ি কিম্বা অসুখ-বিসুখ করলে কেউ হৈ-চৈ করে নাকি?

কাজে লাগাবার সময় চামেলী তাই একটি কথাও ভাঙেনি। গিন্নি একবার সোয়ামীর কথা জিজ্ঞাসা করল। মানুষটা কোথায়, কী করে? তার জবাব ওই পিতুর মা শিখিয়ে দিয়েছিল। বলবি, ফেক্‌টারিতে কাজ করত। ক-মাস ধরে সেই ফেক্‌টারি বন্ধ। তাই এখন ঘরেই বসে আছে। তবে শীগগীর নাকি খুলবে। তাহলেই তো সংসারের একটা সুরাহা হয় মা। তা ওই শেখানো বুলি ঢোক গিলে আর একটু থেমে চামেলী দিব্যি আউড়ে দিল। তাই গিন্নির আর সন্দেহ হয় নি। কল-কারখানা তো অমন মাঝে-মধ্যেই বন্ধ হচ্ছে, ফের খুলছে। এতে অবিশ্বাস করবার কী আছে?

কিন্তু গোপন পিরীত, গোপন শত্রুতার মতো গোপন ব্যাধি কখনও চাপা থাকে না। লোকে টের পায়, ঠিক বুঝতে পারে। আর নগেনের রোগের কথা তো পাড়াসুদ্ধ লোকে জানে। কথা মানেই শব্দ, তাই দ্রুতগতি। নিমেষে বহুদূরে ভেসে যায়। সে কারণে মাসখানেক না যেতেই নগেনের অসুখের খবর ডাক্তার-গিন্নির কানে উঠল। পাড়ার কেউ নিশ্চয় এমন সুসংবাদটি পৌঁছে দিয়েছে। তাই সকালবেলা কাজে যেতেই খোদ কর্তা তাকে তলব করল। স্বামীর কী অসুখ জিজ্ঞাসা করতেই চামেলী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। গিন্নি পষ্ট জানিয়ে দিল—'তা কী করব বলো? কচি কাঁচা নিয়ে সংসার। জেনে-শুনে এরপর তো তোমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিতে পারিনে।'

চামেলী তবু অনুনয় করল,—'যদ্দিন না আর একটা কাজ পাচ্ছি, অন্তত সেই কটা দিন রাখুন। নইলে এরপর হয়তো সকলকে উপোস করে মরতে হবে।'

কান্নাকাটি মিনতিতে গিন্নির মন টলে নি। তবে কর্তা একটু নরম হ'ল। বলল,—'আচ্ছা, বিকেলবেলা একবার এস। যদি তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

শুনে গিন্নি প্রায় ধমকে উঠল,—'তুমি আবার কী ব্যবস্থা করবে? সব জেনেশুনে কাউকে নিশ্চয় ওকে বাড়িতে রাখতে বলবে না?'

—'না-না। আমি বাড়ির কাজের কথা ভাবছি না।' কর্তা আলগোছে জবাব দিল।

—'তাহলে আবার কী কাজ?' গিন্নি পাল্টা প্রশ্ন করল।

চামেলীর মুখের দিকে তাকিয়ে কর্তা শুধোল,—'আচ্ছা, তুমি নার্সিং হোমে আয়ার কাজ করতে পারবে?'

আয়া? চামেলী ঠোঁটের ফাঁকে বিড বিড করে কথাটা যেন আরো একবার আউড়ে নিল। আসলে আয়া কাকে বলে, তাকে কী কাজ করতে হয়, তাই সে ভালো মতো জানে না।

গিন্নি ব্যাপারটা বোঝে। খানিকটা চিন্তা করে সে বলল,—'এমন কী হাতিঘোড়া কাজ? শিখিয়ে দিলে নিশ্চয় পারবে।'

কর্তা ব্যাপারট তাকে বুঝিয়ে দিল। নার্সিং হোমে রুগীর কাছে নার্স থাকে। অনেক সময় চব্বিশ ঘণ্টা লোকের প্রয়োজন হয়। নার্সের বদলে আয়া দিলেও কাজ চলে যায়। তাতে পয়সার সাশ্রয়। তবে পুরো আট ঘণ্টা ডিউটি। কাজ-কর্ম অনেকটা নার্সের মতো। শুধু বাড়তি দু-একটা ব্যাপার আছে। যেমন রুগীর কাপড চোপড় কাচা, খাওয়ার পর গেলাস-বাসন ধোয়া। নার্স দিদিমণিরা তো আর এসব কাজ করবে না।

গিন্নি শুধোল,—'নার্সিং হোমে আমার কাজ খালি আছে বুঝি ?'

—'খালি মানে এটা তো আর বাঁধা মাইনের চাকরি নয়।' কর্তা তাকেই উদ্দেশ্য করে বলল,—'যেমন ডিউটি হবে, তেমনি টাকা পাবে। তা ভালোমতো শিখলে আমার কাজেও মাসে দু-তিন'শ টাকা পর্যন্ত আয় হতে পারে।

চামেলী চুপ। সে যেন রূপকথার গল্প শুনছে। মাস গেলে তার হাতে দু-তিন'শ টাকা আসবে। হেই ভগবান ! তেমন দিন কী চামেলীর কপালে সত্যি হবে ?

কর্তা তবু বলল,—'তাহলেও বাড়িতে একবার জিজ্ঞাসা করে এস। আমার কাজ করতে অনেকের আপত্তি থাকে। রুগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। তাছাড়া দিনে-রাত্তিরে যখন হোক ডিউটি দিতে পারে। তোমার স্বামীর যদি এতে আপত্তি হয় তাহলে আর মিছিমিছি বলাবলি করে লাভ নেই।'

আপত্তি কার ? তার স্বামীর ? হায়রে ! সেই মানুষটার কী এখন ওজর-আপত্তি করার মুরোদ আছে ? রোগেই তাকে জব্দ করে রেখেছে। এখন বউয়ের রোজগারে তার যদি চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হয়, তাহলেই সে ভাগ্য বলে মনে করবে।

চামেলী তাই সোজাসুজি বলল,—'আপত্তি কে করছে ? আর আপত্তি করলেই আমি শুনব কেন ? ঘরে একটা ফুটো পয়সা জমা নেই। এখন এটা-সেটা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি। এরপর যদি আপনার দয়ায় ওই কাজটা হয়, তাহলে মেয়েদুটোর মুখে অন্তত একটা বেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারি।'

ডাক্তার বসাকের কথায় একদিনেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কাঁকুড়গাছিতে প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমে কাজ। ছোটখাটো নয়, বেশ বড় নার্সিং হোম। প্রায় পঞ্চাশটা কেবিন, তাছাড়া বড ঘরে তিনজনের থাকবার মতো পেয়িং বেডও কয়েকটা আছে। মেয়েদের জন্য আলাদা মেটারনিটি ব্লক। তিনতলা বাড়িটায় সর্বদাই একটা ব্যস্ততার ভাব। ডাক্তার-নার্স, রুগীর আত্মীয়-বন্ধু, নার্সিং হোমের আরো সব কর্মচারী আসছে, যাচ্ছে। ঢুকতেই সামনে রিসেপশন কাউণ্টার। সুন্দর সাজ-পোশাক পরা একটি মেয়ে সর্বদাই সেখানে বসে। ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি এক চিলতে হেসে সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তার একটু পিছনে ছোট কিউবিকলে আরো একজনের বসবার আসন। ওটি নার্সিং হোমের টেলিফোন রুম। দিবারাত্রি একজন অপারেটর ওখানে কাজ করে। কানে সরু নল লাগিয়ে সর্বদাই কী শুনছে আর পরক্ষণেই একটা তারকে টেনে নিয়ে সামনের অসংখ্য ফুটোর মধ্যে যে কোনো একটায় গুঁজে দিচ্ছে। নার্সিং হোমটা ডাক্তার সেনগুপ্তের বলেই লোকে জানে। উনি কর্তার বিশেষ বন্ধু। তবে

কাগজে-কলমে এবং আইনের চোখে যিনি আসল মালিক, তাঁর নাম শ্রীমতী প্রতিভাময়ী মিত্র। ভদ্রমহিলা বিধবা। ডাক্তার সেনগুপ্তের এক বন্ধুর স্ত্রী। বয়সে তার চেয়ে কিছু ছোট। সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলেও ভদ্রমহিলা সাজ-সজ্জা ত্যাগ করেন নি। সর্বদাই এমন সুন্দর ফিটফাট থাকেন যে হঠাৎ দেখলে তিরিশের বেশী বয়স কিছুতেই মনে হবে না। নার্সিং হোমটা বেনামে রাখার আরো একটা কারণ লোকে খুঁজে বের করেছে। সেটা হ'ল ডাক্তার সেনগুপ্তের সরকারী চাকরি। গভর্ণমেণ্টের কাজে যতদিন বহাল আছ, ততদিন নিজের নামে ব্যবসা-বাণিজ্য করা চলে না। তাই বাধ্য হয়েই নার্সিং হোমটা বন্ধুর বিধবা স্ত্রীর নামে খুলতে হয়েছে। তবে প্রতিভাময়ী মিত্র ওই কাগজে-কলমেই যা মালিক। নার্সিং হোমের কর্ণধার বলতে লোকে ডাক্তার সেনগুপ্তকেই জানে। আর আসল মালিককে এখানকার কর্মচারীরা অনেকেই চেনে না। বছরে একটিবার তিনি আসেন। এই নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তারপর আর কোনোদিন তার এখানে দেখা মেলে না।

রঘুনন্দনের কাছে চামেলী অবশ্য আরো অনেক কথা শুনেছে। সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে ভদ্রমহিলার বিরাট বাড়ি। সামনে বাগান, নানা ফুলের মেলা, মণচেনের মতো লতানে গাছ সীমানা ডিঙিয়ে প্রায় রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। ডাক্তার সাহেব তো ও বাড়িতে হামেশা যায়। কখনও একা গাড়ি চালিয়ে, কোনোদিন রঘুনন্দন সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে একবার দুজনকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিল। সেবার বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত্তির বারোটা হয়ে গেল।

চামেলীর দিকে একনজর তাকিয়ে ডাক্তার সেনগুপ্তের পছন্দ হ'ল। কী নাম, লেখাপড়া কদ্দুর শিখেছে, তাই জিজ্ঞাসা করল। তা কাকার বাড়িতে লিখতে-পড়তে শিখেছিল চামেলী। বাংলা বই-টই দিব্যি পড়ত। ইংরাজীতে নিজের নাম সই, ঠিকানা লিখতেও মোটামুটি পারে। সব শুনে ডাক্তার সেনগুপ্ত তাকে বহাল করলেন। কর্তাকে বললেন,—'আমার মনে হয় একে দিয়ে চলবে। আপাতত মাস তিনেক ট্রেনিং হোক। নার্সিং হোম থেকে গোটা পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।'

তা চামেলী তাইতেই খুশি। চল্লিশ-পঞ্চাশ যাই হোক, তবু তো তীরে এসে ঠেকেছে। নইলে দুটো অপোগণ্ড শিশু আর রুগ্ন সোয়ামীকে নিয়ে চামেলী তো অকূলে ভেসে যাচ্ছিল। এই ক-মাস আধপেট খেয়ে কোনমতে টিকে আছে। এরপর নিশ্চয় সবাই মিলে অনাহারে মরত।

কর্তা অর্থাৎ ডাক্তার বসাক বললেন,—'তিন মাস পরেই তুমি ডিউটি

পাবে। তার মানে পার্টি তোমাকে টাকা দেবে। আর বছরখানেক না যেতেই দেখবে মাসে তিন'শ টাকা তুমি হেসে খেলে রোজগার করছ। অবিশ্যি এর মধ্যে কাজকর্ম তোমাকে ভালোভাবে শিখে নিতে হবে।'

চামেলী বুদ্ধিমতী, ইঙ্গিতটা বুঝল। শুধু আয়ার কাজ নয়, নার্স দিদি-মণিদের মতো খানিকটা জ্ঞান থাকলে তার ভালো হবে। তা কাজকর্ম শিখতে চামেলীর ছ-মাসও লাগল না। আর বছর না ঘুরতেই ডেলিভারি কেসে এবং আরো অনেক কাজে সে প্রায় নার্সের মতো অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। মাসে তিন'শ কেন, চার-পাঁচশ টাকার মতো তার রোজগার হতে লাগল।

প্রথম যেদিন এই নার্সিং হোমে কাজে এলো, সেদিন চামেলী লজ্জায় জড়সড়। বউ-মেয়ের মতো কাপড় পরেছিল। গায়ে আঁচল টেনেটুনে এসে দাঁড়াতেই সব নার্স-দিদিমণি আর অন্য মেয়েদের কী হাসাহাসি। তবে বেশীদিন লাগেনি। দিন পনের না যেতেই ডিউটিতে যাবার বেশবাস, চলা ফেরার ভঙ্গি সব রপ্ত করে নিল। তারপর মাস ফুরোতেই ভোল পাল্টে গেল চামেলীর, ফিতে পাড় ধব্‌ধবে শাড়ি আর সাদা জামা পরে ঠিক নার্স দিদিমণিদের মতো সে কাজে যেতে লাগল। তখন পাড়ার ফচকে ছোঁড়াগুলো তাই নিয়ে কী কম জ্বালাতন করেছে? কুঁচিয়ে কাপড় পরে পায়ে জুতো বেঁধে ঘর থেকে বেরোলেই অসভ্য ছেলেগুলো পিছন থেকে সিটি মেরে বলত,—

'চা-মে-ই-লি মেমসাব'। বেশ কিছুদিন পাড়াতে ওই নামটাই তার চালু হয়ে গিয়েছিল।

তবে এই এক বছরে চামেলী নিজেও তো অনেক বদলে গেছে। আগে পৃথিবীর কতটুকু জানত চামেলী? বড় রাস্তা থেকে খালের ধার পর্যন্ত এই বসন্তবিলাস রোডটুকু তার জ্ঞানের চৌহদ্দী ছিল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করত। কলে জল ধরত, বাসন মাজত। উনুনে আঁচ দিয়ে নগেনের জন্য রান্না করতে বসত। মেয়ে দুটোকে বাসি রুটির সঙ্গে ডাল কিম্বা গুড় ধরে দিত। বড় মেয়েটা শ্লেট-পেন্সিল, বই নিয়ে কর্পোরেশনের ইস্কুলে পড়তে যেত। আর এখন? ঘরদোরের কাজ করবার জন্য একজন লোক রেখেছে চামেলী। নইলে তার চলে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে পেস্ট বার করে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে। কলে মুখ ধোয়। সেই কাজের মেয়েটা, এক গেলাস চা আর দু-তিন টুকরো সেঁকা পাঁউরুটি হাতে দেয়। চা-টা খেয়ে টুকিটাকি দু-একটা কাজ সেরে থলি নিয়ে বাজারে যায় চামেলী। নিজের পছন্দমতো তরিতরকারি কেনে। কোনদিন মাছ কিম্বা মাংস নিয়ে আসে। তবে রান্না ঘরে ঢোকা সে বহুকাল ছেড়ে দিয়েছে। ওই মেয়েটা যা পারে রাঁধে, সকলকে খেতে

দেয়। রান্না মোটামুটি চলে। তবে সামান্য ইতর-বিশেষ হলে চামেলী কোনোদিন রাগ-মন্দ করে নি।

তবে এক বছরে পৃথিবীর আরো অনেক কিছু জেনে ফেলেছে চামেলী। নার্সিং হোমের চাকরিটা না হলে এত সব কথা নিশ্চয় তার অগোচরে থাকত। যতদিন বসন্তবিলাস রোডের স্রেফ বউ হয়েছিল, ততদিন এসব ব্যাপার জানবার কোনো উপায় ছিল না। জগতে যে এমন একটা নোংরা দিকও রয়েছে, চামেলী হয়তো একদিন তা কল্পনাও করতে পারত না। এই নার্সিং হোমে জীবন মৃত্যু, হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-হিংসা সবই চোখের সামনে সে ঘটতে দেখেছে। তা এমন কিছু নয়। কিন্তু কলঙ্কজড়িত কেলেঙ্কারী, অর্থলালসা, দূষিত নোংরামি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঘৃণ্য নীচতা,—তার প্রমাণও তো কম চোখে পড়েনি। তবে এরা সকলে সমাজের উঁচু-তলার মানুষ। সর্বদা ফিটফাট, ধব্‌ধবে পোষাক পরনে, লকারে সোনাদানা, দেশে-বিদেশে অনেক টাকা, পাশপোর্ট-ভিসা, প্রভাব প্রতিপত্তি, উচ্চ-শিক্ষা,—মানুষ যা চায় কামনা করে তা সবই আয়ত্বের মধ্যে। নার্সিং হোমে থাকলেও এই সব গোপন ব্যাপার চামেলীর পক্ষে জানা হয়তো কোনোদিন সম্ভব হত না। যদি রঘুনন্দন আড়ালে, সকলের অগোচরে তাকে না খবর দিত। তারপর অবশ্য ব্যাপারটা সত্যি কিনা যাচাই করে নিতে চামেলীর খুব একটা অসুবিধে হয় নি।

আসলে নার্সিং হোমের এই চাকরিটা নেবার পর থেকে চামেলীর ধ্যান-ধারণা, অনেকদিনের সব বিশ্বাস দ্রুত পালটে গেল। তবে এর চেয়ে অনেক বড় পরিবর্তন আর এক জায়গায় হয়েছে। সেটা তার শরীরে। চামেলী জানে, এই পাড়ার অনেকে এখন চোরা-চাউনি হেনে লোভীর মতো তা ল া করে। আর শুধু বাইরের লোককে দোষ দিয়ে লাভ কী? ঘরের ওই অসুস্থ মানুষটা মাঝ-রাত্তিরে তাকে দেখে যেন ক্ষেপে ওঠে। অথচ অমন একটা কঠিন ব্যাধি দেহে বাসা বেঁধেছে। চামেলীকে বহুকষ্টে তখন ওকে নিরস্ত করতে হয়। যে ডাক্তার-বাবুর কাছে নগেনকে দেখাতে নিয়ে যায়, সেখানের এক নার্স তাকে সাবধান করে দিয়েছে। উহুঁ! ওসব কিন্তু নিষেধ বলে জানবে। তাছাড়া ক্ষয়রোগ অত সহজে যায় না। থুতুর সঙ্গে এবং নিশ্বাসে এর বীজাণু খুব সহজেই সংক্রামিত হতে পারে।

এতকাল ছাই চাপা আগুনের মতো তার নিটোল সুঠাম দেহের আকর্ষণ সংসারের উদয়াস্ত পরিশ্রমের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। নিজের পরিচর্যা করবার মতো বাড়তি সময় হাতে ছিল না। আরো পাঁচটা মেয়ে-মানুষের মতো সাজগোজ করতে ইচ্ছে হত। কিন্তু সঙ্গতির অভাব। তাইরে আসতে যাচ্ছে

কুলোয় না। টানাটানিতে জেরবার। তারপর নার্সিংহোমে এই কাজটা পেতেই চামেলী যেন প্রথম একটা নিরাপত্তা বোধ করল। সংসারের খাটুনি থেকে রেহাই পেল। কয়েকমাস বাদে হঠাৎ একদিন আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করল। আশ্চর্য! এই কমাসে তার মুখখানা এমন সুন্দর হয়েছে? দৃষ্টি স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ। চোখের কোণে সামান্য একটু কালি পড়েছিল। কেউ যেন তা ইরেজার দিয়ে ভালো করে মুছে দিয়েছে। গাল দুটি পুরন্ত। চামেলীর ঠোঁটের ঠিক নিচে একটা লালচে ভাব আছে। এই কমাসে সেটা আরো বেশী ফুটে উঠেছে।

চামেলীর মুখের দিকে তাকিযে হীরালাল বোধহয় তাই দেখছিল। নগেনের বউটা দিন দিন শীতের ডালিয়া ফুলের মতো বাহার ছড়াচ্ছে। রাত্তিরে ডিউটি ছিল। তাই জাগরণের ঈষৎ ক্লান্তি চোখের কোণে লেগে আছে। কিন্তু তাতেই যেন ওকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। ময়ূরকণ্ঠি রঙের তাঁতের শাড়ি পরনে। গায়ে হাল্কা খয়েরী বর্ণের জামা। ডিউটির আলাদা কাপড় জামা বোধহয় সঙ্গে নিয়ে গিযেছিল। মাঝে মাঝে চামেলী তাই করে। নার্সিং হোমে মেয়েদের জামা-কাপড় বদলে নেবার আলাদা ঘর আছে। অনেকেই ডিউটি সেরে বেরিয়ে আসবার আগে সাধারণ মেয়ের মতো বেশবাস করে নেয়।

দেখা হলে হীরালাল যে বারবার তার মুখের দিকে তাকায়, আড়চোখে দেহের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, চামেলী সেটা বোঝে। তাই রাস্তায় হীরালালকে দেখতে পেলেই সে এগিয়ে আসে। গায়ে পড়ে কথা বলে। দুটো বেশী প্রশ্ন করে। চামেলী জানে ভামিনী এটা আদৌ পছন্দ করে না। টের পেলে বউয়ের কাছে দুটো ধমক খেতে হয় হীরালালকে। রাস্তার এপারে নিজের ঘরে বসে চামেলী তা শোনে। আর তখন বেশ মজা লাগে তার। এ পাড়ায় হীরালাল একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। গাড়ি-বাড়ি, প্রভাব প্রতিপত্তি সব আছে। সেই মানুষটার হেনস্থা হচ্ছে জানলে চামেলী কেমন এক ধরণের আমোদ অনুভব করে।

হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে চামেলী ফের চড করে হাসল। আগের সেই কথার জের টেনে বলল,—'গাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার তো বেরোতে হবে আপনাকে।'

'হ্যাঁ।' হীরালাল এক গাল হাসল। বলল,—'নিখিলের অপেক্ষায় আছি। এলেই বেরিয়ে পড়ব।'

অন্যদিনের মতো আজও তার খালি গা। একটা গামছা পরনে। মাঝে মাঝে হীরালালের অবশ্য মনে হয়, এখন আর গামছা পরে হুটহাট বেরিয়ে

আসা ভালো দেখায় না। সকালবেলা অন্তত একটা লুঙ্গি-টুঙ্গি জড়িয়ে নিতে হয়। কিন্তু অনেকদিনের অভ্যেস, কিছুতেই যেন আর পাল্টাতে পারে না।

চামেলীর মুখের দিকে তাকিয়ে হীরালাল জিজ্ঞাসা করল,—'নাইট-ডিউটি সেরে আসতে দেরি হ'ল যে? রুগীর অবস্থা বুঝি ভালো নয়?'

প্রশ্নটা এমনিতে সরল, একটু উৎকণ্ঠার ভাবও আছে। কিন্তু আসলে ওর শেকড়টা অনেক গভীরে। নাইট-ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরতে এত দেরি হ'ল কেন, হীরালাল তার কারণ জানতে চায়। এবং সেই জিজ্ঞাসা হয়তো ওর একার নয়, পাড়ার অনেকের। সাহস করে তারা বলতে পারে না।

চামেলী ফিক করে হেসে জবাব দিল,—'আর বলেন কেন? রঘুনন্দনের কাণ্ড কাল নাকি সেনগুপ্ত সাহেব খুশি হয়ে ওকে একটা কেক কিনে দিয়েছেন। তাই ভোর না হতেই আমাকে ডাকাডাকি। ওর ঘরে গিয়ে সেই কেক আর চা খেয়ে আসতে হ'ল।'

জবাবের ধরন দেখে হীরালাল চুপ করে গেল। মেয়েটা খুব সেয়ানা। নইলে নির্লজ্জ, বেহায়া। তা না হলে সকালবেলা রঘুনন্দনের ঘরে গিয়ে চা আর কেক খেয়ে এসেছে, সেই কথা কেউ এমনি ফলাও করে বলে? রঘুনন্দনকে পাড়ার সকলেই এখন চেনে। চামেলীর সঙ্গে তার যে বেশ মাখামাখি বসন্ত বিলাস রোডে অনেকে তা জানে। এরই মধ্যে দু-একটা উড়ো খবর আসছে। রঘুনন্দনের সঙ্গে গাড়িতে করে চামেলীকে নাকি এয়ারপোর্টের দিকে যেতে দেখা গেছে। পাড়ার হারাণ দত্ত কী কারণে যেন লেকটাউনে গিয়েছিল। স্বচক্ষে চামেলীকে একজন জোয়ান পুরুষ মানুষের সঙ্গে হাসতে হাসতে সিনেমা হলে ঢুকতে দেখেছে।

রঘুনন্দনের সঙ্গে তার মেলামেশা নিয়ে পাড়ায় যে একটা কানাকানি চলছে, চামেলীর তা অজানা নয়। অবশ্য এসব কথা খানিকটা রঙ চড়িয়ে লোকে বলে। অন্যে তাই বিশ্বাস করে। আর রঘুনন্দন গাড়ি নিয়ে বেশ কয়েকবার বসন্তবিলাস রোডে তার বাড়িতে এসেছে। সেই গাড়িতে নগেনকে তুলে তাকে ডাক্তারের চেম্বারে দেখাতে নিয়ে গেছে। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যাই হোক, পাড়ার লোকের চোখে এটা নিশ্চয় বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। তবে গাড়িতে করে নগেনকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে, এমন কথা সে কল্পনাও করেনি। রঘুনন্দন নিজেই এটা তাকে বলেছিল। শুনে বরং চামেলী লজ্জায় জিভ কেটে উত্তর দিল,—'তাই কখনও হয়? ডাক্তারবাবুর গাড়িতে আমরা যেতে পারি?'

রঘুনন্দন তাতে দমেনি। বলল,—'ডাক্তারবাবুর গাড়িতে কেন যাব? নার্সিং হোমের তো আরো গাড়ি আছে। রাত দুপুরে সেই গাড়িতে করে কত

সিরিয়াস কেসের পেশেন্টকে আমি বড় হাসপাতালে নিয়ে গেছি।'

নগেনের অসুখের কথা ডাক্তার সেনগুপ্ত জানতেন। বন্ধুর কাছে কর্তা কিছু গোপন করেনি। নার্সিং হোমে কাজে লাগবার মাসখানেক পরে রঘুনন্দন হঠাৎ একদিন তার সামনে এসে হাজির। হাতে দু-তিনটে ওষুধের শিশি, এক গুচ্ছের ফয়েল কাগজে মোড়া ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনন্দন শুধোল, –'তোমার নাম চামেলী ?'

লোকটাকে সেদিন প্রথম সে দেখল। শক্তসমর্থ পুরুষ। বয়স ত্রিশের নিচে হবে। গায়ের রঙ ফর্সা ছিল, তবে রোদ-জলে এখন সামান্য তামাটে হয়ে গেছে। মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি ঈষৎ পিঙ্গল।

তার মুখে নিজের নাম শুনে চামেলী যে খুব অবাক হয়ে গেছে, রঘুনন্দন তা বুঝতে পেরে হাসল। তাই পরিচয় দিয়ে বলল,—'আমি সেনগুপ্ত সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার। উনি এই ওষুধগুলো তোমাকে দিতে বলেছেন। কখন কোনটা খাওয়াতে হবে শুনে নাও।'

ভ্রূ কুঁচকে আর একবার লোকটাকে দেখল চামেলী। মনে হ'ল মানুষটা সোজাসুজি, অন্তরে মারপ্যাঁচ নেই। তবু তখনও তার সঙ্কোচ কাটেনি। নার্সিং হোমে মোটে এক মাস হ'ল এসেছে। এখনও সকলকে চেনে না। চট করে সহজ হতেও শেখেনি।

চামেলীর মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল,—'কী দেখছ অমন করে ? আমি বাঘ-ভালুক নাকি ?'

'না-না।' চামেলী এবার ফিক করে হাসল।

লোকটা বলল,—'আমার নাম রঘুনন্দন। এই নার্সিং হোমে দশ বছর কাজ করছি। এখন বড় সাহেবের গাড়ি চালাই। তা শুনলাম, তোমার মরদের ভারী অসুখ। কোন ডাকদার সাহেবকে দেখাচ্ছ ?'

লোকটা নিজে ডাক্তারের খোঁজ খবর নিচ্ছে, তাই চামেলীর ভালো লাগল। ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু নগেনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে সে মাত্র দুবার গিয়েছিল। রুগী দেখালে আট টাকা ফি দিতে হয়। সে টাকা জোগাড় করতে কী কষ্ট না পেয়েছে। তারপর এক কাঁড়ি ওষুধ আর ইনজেকশন। শেষ পর্যন্ত কানের দুটি দুল স্যাকরার কাছে বন্ধক রেখে জোড়ামন্দির বাজারের এক কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে ইনজেকশন নেবার ব্যবস্থা করেছে।

ডাক্তারের নাম বলতেই রঘুনন্দন প্রশ্ন করল,—'স্পেশ্যালিস্ট ?'

কথার ঠিক মানে ধরতে না পেরে চামেলী নির্বোধের মতো তাকাল।

রঘুনন্দন ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করল,—'উনি কী টি. বি.-র ডাগদার ?'

নানা রোগের যে ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তার হয়, চামেলী এই এক মাসে সেটা বুঝতে শিখেছে। যেমন মেয়েদের ডাক্তার হার্টের ব্যামোর রুগী দেখবে না। তেমনি টি. বি. রোগের ডাক্তার শুধু ওই রোগের চিকিৎসা করে। চোখের ডাক্তার স্রেফ চোখের ব্যাপার নিয়ে থাকে। এটুকু ভেবে সে তাই বলল,—'না, উনি তো সব রুগীকেই দেখে ওষুধ দেন।'

রঘুনন্দন হেসে বলল, —'বুঝেছি। তার মানে জেনারেল প্র্যাকটিশনার।'

চামেলী এ কথারও অর্থ ধরতে পারল না। রঘুনন্দন বলল,—'শক্ত অসুখ। আমার তো মনে হয় একজন স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো ভাল।'

চামেলী চুপ করে রইল। ওই স্পেশ্যাল কথার মানে যে একজন বড় ডাক্তার তা সে বেশ বুঝতে পারছে। নগেনকে টি. বি. রুগীর ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তার ভালো চিকিৎসা হয়, এ কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? কিন্তু স্পেশ্যাল ডাক্তারের তো খাঁই বেশী। অত ফি'জ দেবার মুরোদ কী চামেলীর আছে?

মুখ নিচু করে সে বলল,—'বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার তো ক্ষমতা নেই।'

শুনে এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনন্দন কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের হাসল। বলল,—'তুমি কী ভাবছ, স্পেশ্যালিস্টকে দেখাতে ফি'জ দিতে হবে?'

—'বারে! ফি'জ লাগবে না?'

—'কেনো লাগবে?' রঘুনন্দন মুচকি হাসল। বলল,

—'সব বড় ডাগদার তো সেনগুপ্ত সাহেবের দোস্ত আছে। হামেশা নার্সিং হোমে আসে। আমার সঙ্গেও জান-পহচান আছে।'

চামেলী নিবিষ্টের মতো শুনছিল। লোকটার কথা বলার ভঙ্গিতে কী যেন একটা আকর্ষক শক্তি লুকোন আছে যা সহজে মুগ্ধ করে। রঘুনন্দন বলল,—'দাঁড়াও, কালই মজুমদার সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েমেণ্ট করে আসছি। ডেট দিলেই তোমার মরদকে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসব।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। দিন দুই-তিন বাদেই রঘুনন্দন ফের এসে হাজির। কোনোরকম ভণিতা না করেই বলল,—ডাগদার সাহেব টাইম দিয়েছেন। কাল তৈরি থাকবে বাড়িতে। বিকেল চারটের যেতে হবে।'

চামেলীর খুশি হওয়ার কথা। অত বড় ডাক্তার বিনা ফি'জে তার স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখবেন। তবু কোথায় যেন একটা বাধা,...এমন সুন্দর প্রস্তাব সে সর্বান্তকরণে স্বীকার করতে পারছে না।

রঘুনন্দন বলল,—'আমি গাড়ি নিয়ে ঠিক টাইমে বাড়িতে পৌঁছে যাব। কিন্তু দেরি করলে চলবে না।'

চামেলী আপত্তি করল। 'না—না। গাড়ির প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ডাক্তারবাবুর গাড়িতে আমরা যেতে পারি?'

—'আরে!' রঘুনন্দন বিস্ময়ের ভঙ্গি করল। 'ডাগদার সাহেবের গাড়ি নেব কেন? নার্সিং হোমের আরো গাড়ি আছে। রাত দুপুরে কত সিরিয়াস কেস আমি বড় হাসপাতালে নিয়ে গেছি।'

তবে গাড়ি নইলে যাওয়া কঠিন হ'ত। ডাক্তারের চেম্বার সাউথে— রাসবিহারীর কাছে। অসুস্থ, রোগা মানুষটাকে এতদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না।

ঠিক পৌনে চারটে নাগাদ রঘুনন্দন এসে হাজির। নগেনকে মোটামুটি বলে রেখেছিল। নার্সিং হোম থেকে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার আসবে। তবু পুরুষের মন' তাই একটু মিথ্যে কথা না মিশিয়ে দিলে সবদিক রক্ষে হয় না। স্বামীকে তাই বলল,—'নার্সিং হোমের ডাক্তারবাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে। তারপর চেম্বারে তোমাকে দেখিয়ে আবার ওই গাড়িতেই ফিরে আসব।'

নগেন খুব খুশি। না, বউটা সত্যি ভালো। তাকে সারিয়ে তুলতে এত চেষ্টা করছে। চামেলীকে সে এতদিন ভুল বুঝেছিল। উল্টোপাল্টা একটা সন্দেহ। দোজবরে, আর বয়সের অনেক ফারাক বলে নগেনকে তার মনে ধরেনি। ছিঃ! স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা মিথ্যে সন্দেহ করা তার খুব অন্যায় হয়েছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াতেই হৈ-চৈ। নগেনের ঘরের দরজায় সাদা রাজহংসীর মতো এমন সুন্দর একটা মোটরগাড়ি এসে থামবে, এটা কেউ যেন ভাবতে পারেনি। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে চারপাশে ঘিরে আছে। আশেপাশে বাড়ির সামনে শুধু বৌ-ঝিরা নয়, অনেক পুরুষমানুষও বিস্ময়ের সঙ্গে সব লক্ষ্য করছিল। আর গাড়িতে উঠে সকলের নাকের ডগা দিয়ে নগেন আর চামেলী পিছনে ধোঁয়া উড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় ভুবন পিসী এসে ডাকল,—'অ চামেলী মেমসাহেব।'

মাথায় সামান্য কাপড় টেনে দিয়ে চামেলী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। তার বুকের ভিতর একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। ভুবনপিসী তো নয় সাক্ষাৎ মা মনসা। ওর জিভকে বিশ্বাস নেই। কী বলতে বাড়ি এসে ঢুকেছে কে জানে?

তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে ভুবনপিসী বলল,—'অ নগেন। তা ভাগ্যি করে

এবার বউ পেয়েছিলি বটে। কত বড় একখানা গাড়িতে করে তোকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে এলো।

নগেন সলজ্জ হেসে উত্তর দিল,—'তা যা বলেছ।'

ভুবনপিসী এবার চিমটি কেটে বলল,—'দেখিস, যা রয়-সয় তাই ভালো। তবে পাড়ার লোকে বলছিল, ওই সুন্দরপানা ডেরাইভারটার সঙ্গে চ্যামেলীর নাকি বেশ ভাব আছে। ড্যাকরা ছোঁড়াটা গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকেই তোর বউয়ের নাম ধরে হৈ-চৈ শুরু করেছিল।'

নগেন কোনো জবাব দেবার আগেই চামেলীর দিকে কটাক্ষ হেনে ভুবন-পিসী কেমন ঢঙ করে বলল,—'সেলাম গো মেমসাহেব। এখন চলি।'



হীরালাল ঘরে পা দিতেই ভামিনী ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। বউয়ের কাঠ-কাঠ ভঙ্গি আর ফ্রিজে রাখা মাংসের টুকরার মতো ঠাণ্ডা শক্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে হীরালালের গলা শুকিয়ে এলো। আরো পাঁচটা সাধারণ পুরুষের মতো হীরালাল তার বউকে ভয় করে। তবে ভামিনী এমনিতে দিব্যি মেয়ে। নিজের ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত। মন ভালো থাকলে স্বামীর সঙ্গে কলকল করে কথা বলে। শুধু ক্ষেপে গেলেই সর্বনাশী। তখন আর মুখের আগল থাকে না। ঠোঁটের ডগায় যা আসে চেলাকাঠের মতো হীরালালকে তাই ছুড়ে মারে।

বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হীরালাল ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করল। দুটো মিষ্টি, তোষামোদের কথা বলে ওর মনটা প্রসন্ন করবে ভাবল। কিংবা স্যাকরার কাছে সাড়ে চার ভরির যে বালা দুটো গড়াতে দেওয়া আছে, একবার তার খোঁজ নিতে যাবে কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? কিন্তু ভামিনী তাকে কোনো সুযোগ দিল না। মুখখানা বিকৃত করে চড়া গলায় বলল,—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই চ্যামনা মেয়েমানুষটার সঙ্গে কী এত রসের কথা বলছিলে?'

হীরালাল কাছে এসে শুধু বউয়ের মুখে হাতচাপা দিতে বাকি রাখল। বলল

—'চুপ, চুপ। শুনতে পেলে কী মনে করবে।'

—'তাই নাকি?' ভামিনী চোখ ঘুরিয়ে বেয়াড়া ঘোড়ার মতো ঘাড় শক্ত করে দাঁড়াল। বলল,—'ও কী মনে করবে তাই নিয়ে তোমার দেখি বড় মাথাব্যথা। তার চেয়ে বরং যাওনা ওই ছেনাল মাগীটার ঘরে গিয়ে আরো দু-দণ্ড গল্প করে এস।'

হীরালাল মিনতি করল,—'ওগো, পূজোর ঘরে মা। দোতলায় ছেলে দুটো রয়েছে। তোমার এই সব বাক্যি ওদের কানে গেলে…'

ভামিনী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল,—'কান থাকলেই বাক্যি গিয়ে সেখানে ঢুকবে। এই তো আমি ঘরে বসে দিব্যি শুনলাম, ওই মেয়ে মানুষটার কেন ফিরতে দেরি হ'ল তুমি কেমন হেসে হেসে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে।'

হীরালাল থ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে তো প্রায় গলা নামিয়ে কথা বলছিল। ঘরে বসে ভামিনী তাই শুনেছে? বড় প্রখর কান। রাগের মাথায় তার মা ঠিকই বলে। বউয়ের কান নয়,—কুলো। ছুঁচ পড়লেও তাই বুঝতে পারে।

ভামিনীর সঙ্গে বিয়ের আগে হীরালালের এমন রবরবা ছিল না। ওই কোনোমতে দিন কেটে যাচ্ছিল। অবশ্য সংসারে তখন অনেক খরচ। দুটো বিয়ের যুগ্যি বোন ঘাড়ে। তাদের একটা হিল্লে হবে, তারপর তো নিজের সংসার ধর্মের কথা। একটু চেষ্টা-চরিত্র করতেই বোন দুটো দিব্যি পার হয়ে গেল। আরো বছর দুই পর খানিকটা সামলে নিয়ে হীরালাল একদিন টোপর মাথায় গাড়িতে গিয়ে বসল।

তা সেই ভামিনী ঘরে আসবার পর থেকেই হীরালালের পৌষমাস। বাড়িঘর, পয়সাকড়ি, কাজ-কারবার, এই দুটো গাড়ি, সব দশ-বারো বছরে হয়েছে। আত্মীয়জন, পাড়ার লোকে তাই বলে, বউয়ের আয়-পয় ভালো। নইলে কী ছিল হীরালালের? অবিনাশ দত্ত রোডে একতলার ভাড়াটে। খুপরির মতো চারখানা ছোট-ঘর। খান দুই তক্তপোশ, রথের মেলা থেকে কেনা একটা অতি সাধারণ পালঙ্ক। দু-তিনটে কাঁঠাল কাঠের চেয়ার। ব্যস্! এ ছাড়া ঘর-সংসারের হাঁড়ি-কুড়ি, তৈজসপত্র। সেই হীরালাল বলতে গেলে এখন একটা মান্যি-গণ্যি লোক। পিছনে খানিকটা পেট্রলের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে হুস করে গাড়িতে বেরিয়ে যায়। ব্যাক সীটে বুক চিতিয়ে বসে থাকে। লোকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।

হীরালালের মা শুভঙ্করী কিন্তু সে কথা একবারও স্বীকার করে না। খরখরে গলায় জবাব দেয়,—'বউয়ের ভাগ্যি কত সে আমার জানা আছে। তা মেয়ে যদি পয়মন্ত, তাহলে ওর বাপ ঘরের অবস্থা কেন খারাপ বলতে পার?' ফের অপরপক্ষের যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলে,—'ও সব কথা নয়। আসলে হীরে

আমার লক্ষ্মী-পুরুষ। ও হাত বাড়িয়ে ধুলোমুঠি করলেও সোনামুঠি হয়ে আসবে।'

ভামিনী আড়ালে রাগে গরগর করে। 'আমার বাপের বাড়ির কী অবস্থা তাই নিয়ে ওঁর এতো মাথা কামড়ায় কেন?' সে ভুরু কুঁচকে হীরালালকেই প্রশ্নটা ছুড়ে মারে। তারপর স্বামীকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়,—'তোমার মাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বল। আর আমি এ বাড়িতে পা দেবার আগে কটা জিনিস তুমি করতে পেরেছ, তাই না হয় একবার জিজ্ঞেস করে এস।'

হীরালাল স্ত্রীকে নানাভাবে তোয়াজ করে। বলে,—'মায়ের কথা ছেড়ে দাও। তুমি হলে গিয়ে আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এই ঘরে পা দেবার পর থেকেই তো সংসার উথলে উঠেছে।' বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে হীরলাল কখনও আদর করে, মাথা নুইয়ে ঠোঁটে আলতো চুমু খায়।

সোহাগে-আদরে ভামিনী নরম হয়। তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে যায়। ফের মুখ তুলে বলে,—'আমি হলাম গিয়ে তোমার মায়ের দু-চক্ষের বিষ।'

হীরালাল চুপ করে থাকে। আসল ব্যাপারটা সে বোঝে। দুটো মেয়ে একসঙ্গে থাকলেই খিটিমিটি, চুলোচুলি। আবার একজনের প্রশংসা আর একজন কখনও বরদাস্ত করতে পারে না। সংসারে সব শাশুড়ি আর বউয়ের এই দশা। ওরই মধ্যে যারা একটু নরম, ভালো স্বভাব, তারা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অন্যের সঙ্গে সহাবস্থান করতে অসুবিধে হলেও মুখ ফুটে তা বলে না।

শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্ক যাই হোক, হীরালাল তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। কাজ কারবার নিয়ে যতই মত্ত থাক, তবু সপ্তাহে একটা বেলা অন্তত সে বউয়ের জন্য আলাদা করে রাখে। সেদিন বিকেলে হীরালাল গাড়িতে করে বউকে নিয়ে বেরোবে। সিনেমা-থিয়েটার কিম্বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যায়। হীরালালের শ্বশুরবাড়ি বারাসতের কাছে। বউয়ের ইচ্ছে হলে কখনও তাকে বাপের বাড়ি থেকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনে।

তাই বলে স্বামী-স্ত্রীতে যে ঠোকাঠুকি লাগে না তা নয়। মাঝে মাঝেই ভামিনী তাকে ঠেস দিয়ে কথা বলে। আসলে বউয়ের একটা সন্দেহবাতিক আছে। গোপনে হীরালাল অন্য কোনো রমণীর প্রতি আসক্ত, এমনি একটা ধারণা ভামিনী মনের মধ্যে পুষে রেখেছে।

রাগ হলে সেই সন্দেহের কথা গলা ফাটিয়ে বলে। পাড়ার পাঁচজনে শোনে। হীরালাল রীতিমতো অনুনয় বিনয়ে স্ত্রীকে শান্ত করে।

অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভামিনীর কষ্ট-কল্পনা। হীরালালের চরিত্রদোষ প্রায়

নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পুরুষের মনে ওই ছিটে ফোঁটা কামনা থাকতেই পারে। নইলে হীরালালের যা ক্ষমতা, গোছা নোট সর্বদাই পকেটে নিয়ে ঘোরে। এই মহানগরীতে জীবন ধারণের আরো পাঁচটা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো মেয়েমানুষও সওদা করা যায়। হীরালালকে কখনও কখনও তার ব্যবস্থা করতে হয়। জলন্ধর, হরিয়ানা থেকে ব্যবসায়ী বন্ধুরা শীতের মরশুমে সাইবেরিয়ার হাঁসের মতো একবার উড়ে আসে। তারা এলে হীরালাল নানা ভাবে তোয়াজ করে। ভালো হোটেলে আগেই ঘর বুক করা থাকে। কলকাতায়—সিনেমা-থিয়েটার, বাইরে ডায়মণ্ডহারবার, বকখালি। একবার লঞ্চে সুন্দরবনেও ঘুরতে গিয়েছিল। কোনোদিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে হীরালাল পার্ক স্ট্রীটে যায়। সেখানে খানাপিনা, মদের গ্লাসে চুমুক দিতে হয়। কড়া সুরা এক ঢোক গলা দিয়ে নামতেই তার কানের পাশটা গরম হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের কারো এখানে এসে একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। তাই বলে নিষিদ্ধ পল্লীতে যেতে অনেকেই অনিচ্ছুক। একটু গোপনে লোক চক্ষুর আড়ালে ফুর্তিটুর্তি করতে পারলেই নিরাপদ বোধ করে। সে রকম একটা ব্যবস্থা হীরালালকে করতে হয়। তবে নিজেকে সে জড়ায় না। মৌলালীর কাছে 'দি স্টারওয়ে' বলে একটা কোম্পানী আছে। সিনেমা লাইনে কী সব কাজ করে। তার সঙ্গে ফিল্মে একস্ট্রা সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। মালিকের নাম ভবতারণ বরাট। খাটো চেহারা, মাথায় ছোট চুল। গালে, নাকের পাশে বাঁদিকে দু-একটা বসন্তের দাগ। লোকটার মুখে সর্বক্ষণই চতুর হাসি। কেউ গিয়ে সামনে দাঁড়ালেই যেন অন্তর্যামীর মতো তার প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারে। গোপনীয় কথা হ'লে চোখাচোখি হবার পর দু-চার মুহূর্ত আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঈষৎ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে মদ্দা হাঁসের মতো খ্যাসখেসে গলায় বলে,—'একটু এদিকে এসে বসুন। হাতের কাজটা সেরে নিয়ে কথা বলছি।'

সব ব্যবস্থা ভবতারণ করে দেয়। হীরালাল শুধু টাকা ধরে দিয়ে খালাস। এই কলকাতাতেই দিন-দুপুরে এই সব কাজ কারবারের জন্য নিরাপদ কক্ষ ভাড়া মেলে। পার্ক সার্কাসের কাছে এমনি একটা বাড়িতে প্রথম গিয়ে হীরালাল বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। রীতিমতো নামকরা একটা ম্যানসন। বহুতল বাড়ি। ছোট-বড় অনেক ফ্ল্যাট। তার মধ্যে ফ্যামিলি নিয়ে লোকে দিব্যি বসবাস করছে। আবার দোতলা-তিনতলাতে অফিস ঘর। কিন্তু ওর মধ্যে দু-একটা যে স্রেফ মেকি হীরালাল প্রথমে তা বুঝতে পারে নি। দরজার সামনে তেমনি একটা অফিসের নাম সুন্দর প্লাস্টিকের অক্ষরে লেখা। ভিতরে হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদী মোড়া চেয়ার, ছোট আলমারিতে কিছু

ফাইলপত্র, এমন কী একটা টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ওইটুকু যা ভাল। আট-ফুট বাই ছ-ফুট অফিস ঘরটার সঙ্গে একটা সুন্দর এন্টি-চেম্বার। লাগোয়া বাথরুম। সেখানে ডবলবেড ইংলিশ কট, ডানলোপিলোর গদী। আলমারিতে কাপ-ডিস, মদের গ্লাস, দু-এক বোতল সুরাও থাকে। কাস্টমার এসে প্রথমে অফিসেই বসে। ঠিক সময়ে ভবতারণ অপর পক্ষকে পৌছে দেয়। বাকিটুকু স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে।

গোপনে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার এমন সব অন্ধিসন্ধি জানলেও হীরালাল এ পথ মাড়ায় নি। তার মতো মানুষের পক্ষে বরং এটাই আশ্চর্য। দু-দুটো গাড়ির মালিক, পকেটে সর্বদাই একগোছা বড় পাত্তি। তবু হীরালাল নিজের তাগিদে কোনোদিন 'দি স্টারওয়ে' কোম্পানীতে যায় নি। উল্টে ভবতারণই বরং কুতকুতে চোখ দুটি তার দিকে তুলে বলেছে,—'নতুন এক্সট্রা কাল পেলাম। ফাইন দেখতে মশায়। ফিল্মে ভালো রোলে দিব্যি চলে। তবে এ লাইনে তো সবই কপাল।' ফের তার সেই খ্যাসখেসে কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে প্রস্তাব করে,—'চলবে তো বলুন। তিন-চার'শ টাকার বেশী খরচ হবে না। আপনার জন্যে সেফ জায়গায় ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

কিন্তু হীরালাল সায় দেয় নি। প্রথম সেই যা একবার পার্ক সার্কাসের কাছে একটা বাড়িতে গিয়েছিল। তাও নেহাৎ কৌতূহলের বশে। তারপর ভবতারণ এসে পেঁাছতেই হীরালালের গলা শুকিয়ে কাঠ। নার্ভাস অবস্থা। এক নজর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে যে কিছুক্ষণ উসখুস করে উঠে পড়ল। জলন্ধরের সেই ব্যবসাদার লোকটি কিন্তু ঘাবড়ায় নি। বোধহয় হীরালালের মনের অস্বস্তির কথা বুঝতে পেরেই মুচকি হেসে বলল,—ঠিক হ্যয় গুরু। আব তুম্ চলা যাও। পিছে মিলেঙ্গে।'

কিন্তু তাই বলে হীরালাল যে ধোয়া তুলসীপাতা ঠিক তাও নয়। নারীর প্রতি তার যে একটা দুর্বলতা আছে, একথা অনেকেই জানে। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে হীরালাল গায়ে পড়ে কথা বলে। বাস স্টপে কিংবা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষামান সুসজ্জিতা রমণীর দিকে সে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। রমণেচ্ছু বলীবর্দ যেমন গাই-গরুর গা চাটে, তার নির্লজ্জ দৃষ্টি অনেকটা তেমনিভাবে মেয়েদের অঙ্গে বুলোতে থাকে। এ বিষয়ে হীরালাল নেহাৎ অল্পজলের মাছ। গভীর জলে গিয়ে ঘাই মারবার মতো ল্যাজের জোর তার নেই। সম্ভবত ভামিনীও স্বামীর দৌড় জানে। তাই মুখে যতখানি গাল-মন্দ দেয়, হীরালালকে তার চেয়ে অনেক কম অবিশ্বাস করে।

তবে শুভঙ্করী প্রায় সখেদে বলে,—'আহা! ওই কী আমার হীরের ঘুগ্যি বউ

হয়েছে ? মরে যাই রূপের বাহার দেখে। আবার তাইতেই কত গুমোর। নেহাৎ ছেলেটা শুদ্ধ, গঙ্গাজল। তাই ওই মেয়েকেই মন সঁপে দিয়ে বসে আছে। নইলে পকেটে তো টাকা ঝমঝম করছে। তবু পাড়ার কেউ কখনও বলতে পারবে যে হীরের আমার বারটান আছে ?'

ভামিনী অবশ্য দেখতে আহামরি নয়। গায়ের রঙ একটু চাপা। মুখখানা ঠিক রুটি-বেলা চাকির মতো গোল। তবে স্বাস্থ্যবতী। হীরালালের সংসারে লোকজনের অভাব নেই। তবু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভামিনী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। একটা বেলা সংসারে কেউ তাকে বসে থাকতে দেখে নি।

সকালে বেরোবার আগে হীরালাল স্নান সেরে নেয়। এক গ্লাস মিছরির শরবত পান করে। সমস্তদিন খাটাখাটুনি, পরিশ্রম। মিছরির শরবত খেলে নাকি দেহ শীতল থাকে। দুপুরে বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে উঠতেই বেলা দুটো হয়। একটু বিশ্রাম নেয়। ফের ঘড়িতে চারটে না বাজতেই আবার বেরিয়ে পড়ে। রাত্তির নটা-দশটার আগে ঘরে ফিরতে পারে না। আবার ফিরেও কী নিস্তার আছে ? এই সময়টা ট্রাঙ্ককলে যোগাযোগ করতে হয়। হীরালালের ব্যবসা এখন জলন্ধর হরিয়ানার সঙ্গে। ট্রাক ভর্তি মাল প্রায় সেখান থেকে চালান হচ্ছে। সেই মাল খালাস করে গুদামে তোলা। তারপর মওকা বুঝে বাজারে ছেড়ে দাও। তাহলেই মোটা টাকা ঘরে এসে যাবে। ট্রাঙ্ককলে কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে হীরালাল বাক্যালাপ করে। কথা শেষ হতে দেয়াল ঘড়িতে বারোটা কখনও পেটা ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজে।

টাকা রোজগারের যে এমন সব সুন্দর ফন্দি আছে, পনের-কুড়ি বছর আগে হীরালাল তার বিন্দু-বিসর্গ জানত না। পূর্ব বাংলা থেকে সীমান্তের চোরা-গোপ্তা পথ দিয়ে মায়ের সঙ্গে যখন এদেশে এসেছিল, তখন তার বয়স সতেরো-আঠারো হবে। গায়ের রঙ কালো, ঈষৎ ঢ্যাঙা। মাঠের ধানচারার মতো ছিলছিলে গড়ন। মা, ছেলে আর দুই মেয়ে,—এত বড় একটা পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে। ঘাড়ের ওপর উটকো একটা বোঝা এসে পড়লে কেউ খুশি হয় না, হতে পারে না। সেই দূর সম্পর্কের কাকা, কিংবা তার বউ,—ব্যাপারটা দুজনেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। তবু প্রায় তিনমাস মা-বোন সবাই মিলে ওই কাকার বাড়িতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে কাকা তাকে শেয়ালদ'তে কোলেবাজারে এক আলুর আড়তদারের কাছে কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল। মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে। একবেলা খোরাকী। এছাড়া সকালে বাসি রুটি আর তরকারি জলখাবার। দুবেলা চা আর ছটা বিড়ি বাড়তি। তার বিনিময়ে সকাল আটটা থেকে রাত্তির আটটা

পর্যন্ত খাটুনি। শুরুতে খুব কষ্ট হ'ত হীরালালের। গায়ে-গতরে ব্যথা। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ভাবত সকালে আর এই হাড় কখানা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। এক এক সময় চিন্তা করত; ধুত্তোর ছাই। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বরং আবার সেই গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানেই বা কী আছে? নিজে কী খাবে? মা আর বোন দুটোকে দু-মুঠো খেতে দিতে পারবে?

সেই আড়তদারের কাছে তার ব্যবসায় হাতেখড়ি। কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে নতুন আলু উঠলেই লোকটা হীরালালকে সঙ্গে নিয়ে যেত তারকেশ্বরে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীর কাছে আলুর সওদা হ'ত। বস্তায় ভরে ট্রাক ভর্তি সেই আলু পাঠাত হিমঘরে। কোল্ডস্টোরেজ থেকে আবার থলি বোঝাই মাল বেরিয়ে আসত শ্রাবণ ভাদ্র মাসে। তখন তরি-তরকারিতে টান। সবজি দুর্মূল্য। বাজার আক্রা। সিকিতে প্রায় টাকা লাভ। চাহিদা বুঝে হিমঘর থেকে আলু ছাড়াতে পারলেই নিশ্চিত মুনাফা। হীরালাল নিজের চোখে ছোট্ট সিকিকে ক-মাসের মধ্যে একটা গোটা টাকায় রূপান্তরিত হতে দেখল।

বছর সাতেকের মধ্যেই আলুর ব্যবসার অন্ধি-সন্ধি; গলি-ঘুঁজি সব চিনে ফেলল হীরালাল। তবে সোজা ব্যবসা। মার-প্যাচ তেমন নেই। তারকেশ্বর, হরিপাল আর সিঙ্গুরের চাষীদের সঙ্গে একটু মিষ্টি সম্পর্ক রাখতে পারলেই কারবার ফুলে ফেঁপে উঠবে। শীতের শুরুতেই আলুর ফসল চাষীর ঘরে আসে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে সওদা করে নিতে হবে। তারপর বস্তা ভর্তি মাল কোল্ডস্টোরেজে ফেলে রাখ। শ্রাবণ-ভাদ্রে তরিতরকারি বাজারে মেলে না। আলুর দর তখন কম্প দিয়ে আসা জ্বরের মতো চড-চড করে বাডতে থাকে। বাস্ এখন ঝোপ বুঝে কোপ। পূজোর আগে আসল টাকা তিন-চারগুণ বেড়ে ঘরে ফিরে আসবে।

তবু ব্যবসা গড়ে তুলতে সময় লেগেছে। হীরালাল এক লাফে গাছের মগডালে চড়ে বসেনি। আড়তের কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রথমে কিছুদিন ছুটকো কারবার করেছিল। যেমন কোলে-বাজারে একটা পিঁড়ি ভাড়া নিয়ে বসত। দৈনিক পাঁচ সিকে। এক বস্তা আলু এনে সেই পিঁড়ির ওপর রেখে পাল্লা হিসেবে বিক্রি করত। এক পাল্লা মানে আড়াই কে. জি.। সারাদিনে দু-তিন বস্তা আলু কাটিয়ে হীরালাল যখন উঠে দাঁড়াত, তখন লাভের অঙ্কটা নেহাৎ মন্দ মনে হয় নি।

শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুকে অংশীদার জুটিয়ে হীরালাল কারবার শুরু করেছিল। হরিপাল, সিঙ্গুর আর তারকেশ্বরে চাষীদের ঘরে অনেকদিন ধরে আনাগোনা আছে। কার্তিক-অঘ্রাণে মাল পেতে তেমন অসুবিধে হ'ল না। হিমঘরে

বাবুদের সঙ্গেও মুখ শোঁকাশুঁকি হয়েছিল। টাকা জমা দিতেই বস্তাবন্দী আলু তারা ব্যাঙ্কে তুলে দিল। তা প্রথম বছরেই চারগুণ লাভ। কুইন্টল পিছু কুড়ি পঁচিশ টাকা দরে যে আলু কিনেছিল, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে সেই আলু এক'শ সোয়া'শ টাকাতে বাজারে ছাড়ল।

সেই সব দিনের কথা ভাবলে হীরালালের নিজের এখন অবাক লাগে। মনে হয় যেন রূপকথার দিন। অগ্রাণ-পৌষ মাসে নতুন ফসল এলে বাজারে আলুর দর পড়ে যেত। কিলো পিছু চার আনা, তিরিশ পয়সায় নামত। আর এখন ? দিনে দিনে জিনিসের দাম যেন লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। এখন শীতের মরশুমেও আলুর দর এক-টাকা, দেড়-টাকার কম হতে চায় না। কালে কালে জিনিসের দাম আরো কত বাড়বে, তাই বা কে বলতে পারে ?

তারকেশ্বরে তখন দু-রকমের আলু সওদা করত হীরালাল। একনম্বর আলু হ'ত চন্দ্রমুখী। আর এক ধরনের আলুর নাম জ্যোতি। চন্দ্রমুখী আলুর ফলন কম। তাই সে আলুর চাষ এখন নেই বললেই চলে। গেরস্থ নিজের ঘর-সংসারের জন্য সামান্য কিছু তৈরি করে। এখন হরিপাল, সিঙ্গুর আর তারকেশ্বরের মাঠ জুড়ে শুধু জ্যোতি আলুর চাষ। ফলন বেশী, তাই চাষীর কাছে কদর। চন্দ্রমুখীর চাষ এসব অঞ্চল থেকে উঠে গেছে বললেই হয়।

কিন্তু বছর দশ বাদে ব্যবসার খোল নলচে আমূল পাল্টাতে হ'ল হীরালালকে। সরকার থেকে কোল্ডস্টোরেজের মালিকের ওপর ফতোয়া জারি হ'ল, হিমঘরে সর্বাগ্রে চাষীর ফসল মজুত রাখতে হবে। তারপর যদি বাড়তি জায়গা থাকে, তাহলেই মজুতদারের মাল নেওয়া চলতে পারে। ততদিনে চাষীও রীতিমতো সেয়ানা হয়ে উঠেছে। শরীরের রক্ত জল করা ফসল সস্তার মরশুমে জলের দরে বিকোবে কেন ? তার চেয়ে নিজেই বরং বস্তাবন্দী মাল হিমঘরে জমা দিয়ে আসবে। প্রয়োজনমতো সেই আলু বের করে এনে বাজারে বিক্রি করতে পারে।

হীরালাল তাই আলুর আমদানী ব্যবসা ধরল। পাঞ্জাব আর হরিয়ানায় আলুর ফলন পর্যাপ্ত। সেই আলু এনে বাজারে ছাড়লে মুনাফা কিছু কম হয় না। তবে টাকা বেশী লাগে। তা টাকা এখন জোগাড় করতে অসুবিধে নেই। ব্যাঙ্কে ধার মেলে। তাছাড়া বাজারে হীরালালের একটা গুডউইল তৈরি হয়েছে। হাত পাতলে লোকে বিশ্বাস করে টাকা দেয়। যাই হোক অর্ডার দিলেই ট্রাক বোঝাই বস্তাবন্দী আলু দু দিন পরে তার গুদামের সামনে এসে দাঁড়াবে। পড়তা বুঝে বাজারে মাল ছাড়তে পারলে লাভের কথা আর ভাবতে হবেনা।

তবে ইদানীং হীরালালের মাথায় আর একটা নতুন ব্যবসার ফন্দি ঘুরছে।

এই বেচাকেনার ব্যবসায় লাভের মতো লোকসান ও রয়েছে। হঠাৎ বাজার পড়ে গেলেই মাথায় হাত। অত টাকার মাল কদিন আর দম ধরে গুদামে মজুত রাখতে পারে? হিমঘরে থাকলে আলাদা কথা কিন্তু মাল একবার নষ্ট হতে শুরু হ'লে গোটা টাকাটা বরবাদ। তাছাড়া আলুর দর বাড়ছে, কেবলি বাড়ছে বলে দেশে যেন একটা রব উঠে গেছে। সকলে মনে করে আলুর ব্যবসায় দ্বিগুণ—তিনগুণ লাভ। এক একজন কারবারী রাতারাতি লাল হয়ে যাচ্ছে। তাই ইদানীং হীরালাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা চিন্তা করছে। নতুন একটা জিনিসের ব্যবসা সে অনেক দিন থেকেই ভাবছে। এতদিন সাহস আর সামর্থ্য, দুইয়ের অভাব ছিল। কিন্তু হীরালাল এখন সেই আগের আনাড়ি নেই। প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর লাইনে থেকে সে এখন ঝানু ব্যবসাদার। সামনে দাঁড়িয়ে কেউ হাঁ করে ইঙ্গিত করলে সে অনায়াসে হাওড়া বুঝে নিতে পারে। আদৌ অসুবিধে হয় না।

যে জিনিসটার কথা হীরালাল চিন্তা করছে সেটা হ'ল তার নিজস্ব একটি হিমঘর। তবে ঠিক নিজের না হলেও চলতে পারে। আর দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে হীরালাল পার্টনারশিপ ফার্ম খুলবে। কিম্বা একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। আজকাল এই সব লিমিটেড কোম্পানীর কদর বেশী। হিসেবপত্তর অডিট হয়। সেই লাভ-লোকসানের পাতাটা সঙ্গে দিলে ব্যাঙ্কের কাছে কর্জ পেতে সুবিধে। তা একটা হিমঘর বানাতে অন্তত পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকা চাই। এত টাকা ঘর থেকে বের করা অসম্ভব। তাই ব্যাঙ্কের দরজায় না গিয়ে উপায় নেই। তবে হীরালাল জানে ভালো স্কীম আর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে পারলে লোন পাওয়া শক্ত হবে না। তাই হিমঘর বানাতেও অসুবিধে নেই।

একটা হিমঘর থেকে যে কী পরিমাণ লাভ হতে পারে, হীরালাল সেটা অনেকদিন খতিয়ে দেখেছে। খুব বড় গোছের না হ'লেও একটা কোল্ড স্টোরেজে পঁচিশ-তিরিশ হাজার কুইন্টল আলু অনায়াসে রাখা চলে। কুইন্টল পিছু মালের ভাড়া তিরিশ টাকা নিলে শুধু আলুতেই আট-ন লাখ টাকা হেসে খেলে উঠে আসবে। এ ছাড়াও হিমঘরে আরো কত জিনিস থাকে। তেমনি ঝামেলা কম। লোকজন বেশী পুষতে হয় না। খরচ বলতে শুধু ইলেকট্রিসিটি। তাতে আর কত টাকা বেরিয়ে যাবে?

জামা কাপড় পরে হীরালাল বাইরে এসে দাঁড়াল। একটু আগে নিখিল এসে গাড়ির চাবি নিয়ে উড স্ট্রিটের দিকে রওনা হয়ে গেছে। যাক, এই ব্যাপারে সে এখন নিশ্চিন্ত। নিখিল না আসা পর্যন্ত একটা অস্বস্তি মনের ভিতর খচখচ

করে। তবে ছেলেটা হঠাৎ ডুব দেয় না। ছোঁড়ার সে গুণটুকু আছে। কালে-ভদ্রে এক-আধদিন হয়তো গরহাজির থাকে। নইলে কামাই করবার আগে হীরালালকে জানিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সেই কটা দিন অন্য ব্যবস্থা করতে হয় অন্যথা টার্নবুল কোম্পানীর পারেখ সাহেব যে একটা ঝামেলা বাধিয়ে বসবে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হীরালাল দেখল, সেজেগুজে হিয়া চৌধুরী কোথায় যেন যাচ্ছে। এই সকাল বেলা তার যাওয়ার সময় নয়। হিয়া চৌধুরী সাধারণত বাড়ি থেকে বেরোয় বেলা একটা নাগাদ জংলা কিম্বা ওই ধরণের চটকদার শাড়ি পরনে। গায়ে চোলির মতো খাটো জামা। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পায়ে হাল ফ্যাশানের উঁচু হিলের জুতো। হাতে প্রায় নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ঘোরে। ফি-মাসেই হিয়া চৌধুরী একটা-দুটো ব্যাগ কিনবে গড়িয়াহাটা কিম্বা নিউ মার্কেটে হামেশা যায়। কোনো নতুন ডিজাইন চোখে পড়লে আর কথা নেই। হিয়া চৌধুরী যে কোনো মূল্যে সেটি তুলে নেবে।

হিয়া চৌধুরীরা থাকে এই বসন্তবিলাস রোডের আরো দক্ষিণে প্রায় সেই খালের ধারে বসন্তবিলাস রোডে নিজেদের বাড়ি নয়। বছর তিন আগে এখানে ভাড়াটে হয়ে এসেছে। রাস্তাটার আরো ভিতরে জিভেগজাদের একটা ছোট দোতলা বাড়ি আছে। ওপরে তিনখানা ঘর। একদিন কার কাছ থেকে খবর পেয়ে রতীশ চৌধুরী বাড়িটা দেখতে এসেছিল। তা এক নজরেই পছন্দ। নতুন বাড়ি। দুখানা বড় ঘর, একটা সামান্য ছোট। কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই রতীশ চৌধুরীর বাড়ীতে দুটি প্রাণী। স্বামী-স্ত্রী। একটি মাত্র ছেলে। তা সাত বছর বয়স থেকে রাঁচীর কাছে কী একটা মিশনারী স্কুলে ভর্তি হয়ে সে পড়াশুনো করে। হস্টেলে থাকে। ছুটিছাটায় বাড়ি আসে। আবার ছুটি ফুরোবার আগেই হিয়া চৌধুরী তাকে সেই স্কুলে পাঠিয়ে দেয়।

জিভেগজাদের এই বাড়িটা রতীশ চৌধুরী মোটা টাকায় ভাড়া নিয়েছিল। আর সামান্য কিছু বেশী দিলেই সি. আই. টি. রোডে নিশ্চয় ফ্ল্যাট বাড়ি পাওয়া যেত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক রতীশ চৌধুরী সে চেষ্টা করে নি। এমনি অনগ্রসর সাধারণ মানুষের মধ্যে বসবাস করতেই পছন্দ করেছিল। নইলে তার পয়সার অভাব নেই। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। নিজের দুখানা ট্রাক। তাছাড়া প্রয়োজনমতো গাড়িভাড়া নিয়ে দেশের দূর দূরান্তে মাল পাঠাচ্ছে।

জিভেগজারা অবশ্য প্রথমে বাড়িভাড়া দিতে চায় নি। অনজানে লোক। এ দিকের কেউ প্রায় চেনে না। তবে হাঁ, রইস আদমী। হাতের আঙুলে তিনখানা সোনার আঙটি। তাতে দুর্মূল্য পাথর বসানো। একটা বোধহয় হীরে।

পরনে বিলিতি কাপড়ের স্যুট। চোখে সুন্দর চশমা। বাড়ির কর্তা হারাধন মোদক তো প্রথমে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'আপনি সত্যি এই পাড়ায় থাকবেন ?'

রতীশ চৌধুরী হেসে জবাব দিয়েছিল,—'থাকব বলেই তো আপনার কাছে বাড়িটা ভাড়া নিতে এসেছি।'

জিভেগজারা আসলে মোদক, অর্থাৎ ময়রা। তিনপুরুষ ধরে মিষ্টান্নের ব্যবসা। রাসমণি বাজারে বড় দোকান। দোকানটা হারাধনের বাবা প্রথম শুরু করে। বছর পাঁচ ছয় হ'ল বড় ছেলে বৌবাজারে একটা হাল ফ্যাশানের মিষ্টির দোকান খুলে বসেছে। সেখানেও বেশ ভালো বেচাকেনা, দিন দিন বিক্রী বাড়ছে। তবে বড় রাস্তার ওপর আর ভালো জায়গায় দোকান। তাই ইনকাম ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্সের চোটপাট বেশী। হারাধন অবশ্য রাসমণি বাজারের দোকানেই বসে। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত। আবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্তির আটটা-নটা অব্দি। তাদের এই জিভেগজা নামটা অনেকদিন ধরেই চালু হয়ে গেছে। হারাধনের বাবা যখন প্রথম এই রাসমণি বাজারে দোকান করেছিল, তখন এ দিককার অবস্থা এমন বাড়বাড়ন্ত হয়নি। ভালো মিষ্টি কেনার মতো খরিদ্দার ছিল না। হারাধনের বাবা তখন নিজের হাতে জিভেগজা তৈরি করত। সস্তার মিষ্টি, বিক্রি হ'ত প্রচুর। জিভেগজা বিক্রি করে হারাধনের বাবার তখন বেশ নাম ডাক হয়ে গেছল। লোকের মুখে তার ওই জিভেগজা নামটা চালু হয়ে গেল। খরিদ্দারেরা বলতে শুরু করল, ওটা জিভেগজার দোকান। তারপর ধীরে ধীরে বসন্তবিলাস রোডের এই পৈতৃক নিবাসটুকু জিভেগজাদের বাড়ি বলে চিহ্নিত হ'ল।

তিনখানা ঘরের জন্ত তিন'শ টাকা ভাড়া দিতে রতীশ চৌধুরী আপত্তি করে নি। বলতে গেলে এক কথাতেই রাজি। হারাধন নিজেও কেমন অবাক হয়ে গেছল। ভেবে ছিল, লোকটা ভাড়া নিয়ে একটু দর কষাকষি করবে। টাকার অঙ্কটা কমিয়ে দু'শ করতে বলবে। শেষ পর্যন্ত ওই টাকাতেই রফা হবে। কিন্তু রতীশ চৌধুরী আশ্চর্য মানুষ। তিন'শ টাকা ভাড়া শুনে পকেট থেকে দু-মাসের ভাড়া হিসেবে ছখানি পাত্তি বের করে হারাধনের দিকে এগিয়ে দিল।

পাড়ার মানুষরা অবশ্য পরে হারাধনকে দোষ দিতে ছাড়েনি। ভুবনপিসি এসে বলল,—'চালচুলো, স্বভাব-চরিত্তির কিছু না জেনেই অমনি লোকটাকে ভাড়ার রসিদ কেটে দিলে ? দেখ, এবার ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে।'

হীরালাল মন্তব্য করল,—'তা ভুবনপিসী কিন্তু অন্তায় বলেনি হারাধনদা। বাড়ি ভাড়া দেবার আগে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। অন্তত

মানুষটা কেমন, কী ধরনের লোক কারো কাছ থেকে সেটা একটু খতিয়ে নিতে পারতে।'

হারাধন হেসে বলল,—'না হে হীরালাল। তেমন কোনো ভয় নেই। মানুষটাকে এক নজর দেখে আমার তো খারাপ লাগেনি। ভারি সৌখীন লোক। হাতে তিনখানা সোনার আংটি। তাতে দামী পাথর, একটা হীরে বলেই মনে হ'ল। শুনলাম, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে। নিজের দু-খানা ট্রাক। ভাড়ায় আরো গাড়ি নিচ্ছে। আসাম থেকে কেরালা পর্যন্ত সর্বত্র মাল যায়। উল্টে বরং আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের পাড়ায় আপনি সত্যি থাকবেন ?'

তা হারাধনের প্রশ্নটা নিরর্থক নয়। রতীশ চৌধুরীর মতো লোক এ পাড়ায় একটু বেমানান বৈকি। বসন্তবিলাস রোডে তার জিনিসপত্র এলো আরো মাস-খানেক পরে। দু-ট্রাক বোঝাই মাল। ডাইনিং টেবিল, সঙ্গে ছ-খানা চেয়ার। শোয়ার জন্য সানমাইকা বসানো ইংলিশ কট্, ডানলোপিলোর নরম গদী। ফ্রিজ, তিনখানা ষ্টীল আলমারি। তার একটায় ডিমালো আয়না বসানো। এ ছাড়াও জামা-কাপড় রাখবার ওয়ার্ড-রোব, কাচ বসানো শো-কেস, আলনা, আরো অনেক আসবাবপত্র। এত মাল যে তিনখানা ঘরে আঁটলে হয়। বসন্তবিলাস রোডের বাসিন্দার পক্ষে কিঞ্চিৎ আতিশয্য নিশ্চয়।

পিতুর মা দেখে এসে গালে হাত রেখে বলল,—'আরি বাপস্! জিনিস একখানা করেছে বটে। এ পাড়ায় হীরেদাদার বাড়িতেও অমন সুন্দর পালঙ্ক-বিছানা নেই।'

ভুবনপিসী বলল,—'বাড়িতে তো মনিষ্যি বলতে দুজন। দেবা আর দেবী, —তা অত আসবাবপত্তর, আলমারি, চেয়ার-টেবিল কার ভোগে লাগে ?'

এ পাড়ায় এসে রতীশ চৌধুরী কারো সঙ্গে বেশী মাখামাখি করেনি। এমনি আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। ব্যস্ ওই পর্যন্ত। কিন্তু তাই বলে বাড়িতে বসে হৈ-হল্লা, কিম্বা পাড়ায় কারো সঙ্গে দহরম-মহরম হয়নি। বেলা আটটার আগে তার ঘুমই ভাঙে না। বিছানা থেকে উঠে বাসি মুখে এককাপ চা খায়। তারপর সোজা বাথরুমে ঢোকে। একেবারে স্নান সেরে বেরোয়। জামাকাপড় পরে মোটা জলখাবার খেয়ে নটা সওয়া নটা নাগাদ দোতলা থেকে নেমে আসে। হনহন করে বসন্তবিলাস রোড বরাবর হেঁটে যায়। বড় রাস্তায় পা দিয়ে ট্যাক্সি নেয়। না পেলে সি. আই. টি রোডের মোড় পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ধরে। দুপুরে কোনোদিন বাড়ি আসে। খাওয়া সেরে বেলা দেড়টা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ে। রাত্তির আটটা-নটার সময় ফের ট্যাক্সি করে বাড়ির দরজায় এসে নামে।

বসন্তবিলাস রোডে রতীশ চৌধুরীকে নিয়ে ফিসফিসানি শুরু হ'ল দিন সাতেক বাদে। অফিসের সাহেবের গোপন কথা যেমন কেরানী-পিওনেরা টের পায়, তেমনি কর্তা-গিন্নির সম্পর্কে চিড় ধরলে বাড়ির ঝি-চাকরেরা তা ঠিক বুঝতে পারে : রতীশ চৌধুরীর বাড়িতে কাজের লোক তুজন। একটি কমবয়সী ছেলে,—ফাইফরমাস খাটে। সর্বক্ষণ থাকে। ভিতরের বারান্দায় রাত্তিরে ঘুমোয়। আর একজন রাঁধুনী। পিতুর মা তাকে জোগাড় করে দিয়েছে। সেই মেয়েটি সকালে আসে। বেলা বারোটা পর্যন্ত থাকে। তারপর চলে যায়। ফের আসে সন্ধ্যে নাগাদ। রুটি গড়ে, তরকারি রাঁধে। রাত্তির দশটার পর হেঁসেলের পাট চুকলে তার ছুটি। হিয়া চৌধুরী কোনোদিন রান্নাঘরের ধার মাড়ায় না। বড়জোর কী তরকারি হবে, সকালবেলা একবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার নির্দেশ দিয়ে গৃহিণীর দায়িত্ব সারে।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে রতীশ মদের বোতল নিয়ে বসে। প্রতিদিন একই ব্যাপার। যেদিন মাত্রা একটু বেশী হয়, সেদিন অনর্গল বকতে শুরু করে। আবোল-তাবোল কথা বলে। তু-এক কলি হাল্কা সুর ভাঁজে। কখনও বউয়ের নাম ধরে চটুল রঙ্গ-রসিকতার বুলি ছাড়ে। অসহ্য হ'লে হিয়া চৌধুরী চেঁচামেচি শুরু করে। বউয়ের মেজাজ চড়লেই রতীশ কিঞ্চিৎ নরম হয়। বকবকানি কমে। কোনোদিন আবার নেশার ঝোঁকে গিন্নির মানভঞ্জন করতে বেফাঁস একটা কথা বলে হিয়া চৌধুরীকে আরো চটিয়ে দেয়।

রাত্তিরে তার আহার নামমাত্র। তাগাদা দিলে সাজানো থালার সামনে একবার বসে। মদের নেশায় তু-একখানা রুটি চিবিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। তাই বলে হিয়া চৌধুরী আর তুখানা বেশী খাওয়ার জন্য কোনোদিন মাথার দিব্যি দেয় না।

রতীশ চৌধুরী যে একটা পাঁড় মাতাল রাঁধুনি মেয়েটি তা পাড়ায় ফাঁস করে দিল। অবশ্য কথাটা এমনিতে চাউর হয়ে যেত। আসলে মাল আর মদের সমান তুর্গন্ধ। তবে যে মাল টানে, তার অবস্থা অনেকটা মরুভূমির বালিতে মুখ গুঁজে থাকা উটপাখির মতো। ভাবে এটা কেউ টের পাচ্ছে না। কিন্তু পাড়াসুদ্ধ লোকের কাছে ব্যাপারটা যে জানাজানি হয়ে গেছে বোকার মতো এটা বোধগম্য হতে বেশ বিলম্ব হয়।

কিন্তু স্রেফ মাতাল হলেও মেয়ে-মহলে এমন টি-টি পড়ত না। আর আজকাল কার ঘরের পুরুষ মানুষ না মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে? ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। শুধু পুরুষ কেন, বড় ঘরের মেয়েমানুষেরাও তো এখন ক্লাবে অথবা বারে বসে দিব্যি সুরাপান করছে। মেয়ে মহলে ফিসফিসানি

শুরু হ'ল অন্য বিষয়ে, – স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে। রাত্তির বেলা মদের নেশায় বেসামাল হয়ে রতীশ নিজের ঘরে শয্যায় গড়িয়ে পড়ে। গিন্নি নাকি সে বিছানায় শোয় না। আর একটা ঘরে আলাদা বিছানা থাকে। হিয়া চৌধুরী দরজায় খিল তুলে দিয়ে সেই ঘরে শুয়ে পড়ে।

মাঝ রাত্তিরে নেশা কেটে গেলে রতীশের ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় কিছুক্ষণ উসখুস করে। পাশে হাত বাড়িয়ে বউকে খুঁজে না পেয়ে শেষে বেরিয়ে আসে। ঘুম-ভাঙা চোখে হিয়া যে ঘরটায় খিল তুলে দিয়ে শুয়েছে, তার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ কচলাতে কচলাতে কপাটের গায়ে টোকা মারে, ধাক্কা দেয়। জড়িত কণ্ঠে বউকে দরজা খুলে দিতে অনুনয় করে। কিন্তু হিয়া চৌধুরী সাড়া দেয় না। ঘুম ভাঙলেও মটকা মেরে পড়ে থাকে। বেশী ধাক্কাধাক্কি করলে বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়,— 'রাত দুপুরে আবার ঢঙ করছ কেন? যাও, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড। মানুষকে একটু ঘুমুতে দেবে না?'

বাড়িতে যে ছোঁড়া চাকরটা ভিতরের বারান্দায় শুয়ে থাকে গভীর রাতের এই দাম্পত্যলীলার কাহিনী সেই পাড়ায় গল্প করেছিল। এমন রসালো ঘটনা নিয়ে মেয়েমহলে সবিস্তারে আলোচনা হতে দেরি হয়নি। সব শুনে পিতুর মা বলল,—'আহা! তা এতে দোষের কী আছে ভাই? রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেলে সোয়ামীর নিশ্চয় বউয়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করতে পারে।'

হরেন দাসের স্ত্রী ফিক করে হেসে মন্তব্য করল,—'বউয়ের কাছে যেতে ইচ্ছে নয়। বল গিন্নির সঙ্গে শুতে সাধ হয়েছিল।'

ভুবনপিসী ভুরু বাঁকিয়ে বলল,—'তা সাধ হলেও সেটা অন্যায় নাকি? শক্ত-সমর্থ পুরুষ-মানুষ। রাত্তির বেলা হঠাৎ বউকে না পাশে দেখতে পেলে মনে তো একটা সন্দেহ হতে পারে।'

খালধারের জগমাসী বলল,—'বউটার নিশ্চয় স্বভাবচরিত্তির ভালো নয়। নইলে সোয়ামী মদ খায় বলেই কী তাকে একটা ঘরে ফেলে নিজে অন্য ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুতে হবে?'

হরেন দাসের বউ জবাব দিল,—'তা খিল না দিয়ে ওর উপায় কী বলো? মদের গন্ধ শুঁকলে কার না গা গুলিয়ে ওঠে?'

ভুবনপিসী ধমক দিল,—'থাম দিকি না। তোকে আর অত ওকালতি করতে হবে না। রোজগেরে পুরুষ, ঝমঝমিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। ঘরে কোন অভাবটা তার রয়েছে? সে মানুষ বাড়িতে বসে মদ গিলবে না তো কী চুমুক দিয়ে দুধ খাবে?' ফের মুখনাড়া দিয়ে কেমন বিকৃত ভঙ্গি করে বলল,—'আর কর্তাকেও বলিহারি। এমন পুরুষমানুষ তো জন্মে দেখিনি। দুপুর হলেই বিবি

যে সেজেগুজে অভিসারে যাচ্ছে, তাই জেনেও তাকে শাসন করবার মুরোদ নেই।'

এ পাড়ায় হিয়া চৌধুরী একটু ব্যতিক্রম,—আর পাঁচজনের থেকে ভিন্ন। কোথায় যেন তার একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তাই বলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যে মেলামেশা নেই, তা নয়। কারো সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হ'লে মিষ্টি হাসে। কখনও দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে। পিতুর মা কিম্বা পাড়ার পাঁচটা মেয়ে মাঝে-মধ্যে এসে গল্প করে যায়। তবু নিজের চারপাশে একটা স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী সে বজায় রেখেছে। সেই সীমানা ডিঙিয়ে অন্যে তার সঙ্গে বেশী মাখামাখি করতে সাহস পায় না।

সকালবেলা হিয়া চৌধুরী বাড়িতেই থাকে। কদাচিৎ বের হয়। অবশ্য কোনোদিন ছোঁড়া চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায়। পছন্দমতো সব্‌জী, মাছ-মাংস, কিনে আনে। দুপুরবেলা প্রায় রতীশ বাড়ীতে খেতে আসে। যেদিন আসতে পারবে না, সকালে বেরোবার সময় বলে যায়। হঠাৎ কোনো কাজে আটকা পড়লে টেলিফোনে খবর দেয়। খেতে এলেও বড়জোর ঘণ্টাখানেক থাকে। খাওয়া সেরে পনের-কুড়ি মিনিট গড়িয়ে নেয়। তারপর যেমন ব্যস্ত হয়ে এসেছিল, তেমনি দ্রুত জামা-কাপড় পরে ব্যস্তভাবে নিজের ধান্দায় চলে যায়।

স্বামী রওনা হলেই হিয়া যেন আর বাড়িতে টিকতে পারে না। বেলা দুটো আড়াইটের মধ্যে সাজগোজ শেষ করে সেও বেরিয়ে পড়ে। পরনে রঙবাহার শাড়ি, চোলির মতো খাটো জামা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পায়ে হাই হিলের জুতো। হাতে সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগ। মুখে সযত্ন প্রসাধনের চিহ্ন। ঠোঁটে হাল্কা রঙ। সচল একটা বিজ্ঞাপনের ছবির মতো হিয়া চৌধুরী টুকটুক করে হেঁটে বড় রাস্তায় বাসস্টপে গিয়ে থামে।

দুপুরবেলা বসন্তবিলাস রোড থেকে বেরিয়ে হিয়া তার আত্মীয়-স্বজন কিম্বা বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে যায় না। তেমন স্বভাব নয়। আর পাঁচটা মেয়ে-মানুষের মতো শুধু ঘর-গেরস্থালীর গল্প হিয়া চৌধুরীর মুখ থেকে কেউ শোনেনি। বড় রাস্তায় বাস ধরে সে আসে এসপ্ল্যানেডে। হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটে ঢোকে। দোকানে সাজানো এটা-সেটা জিনিস চোখে বুলিয়ে, কখনও হাতে তুলে যাচাই করে। পছন্দ হ'লে কেনে। ফের মার্কেট থেকে বেরিয়ে লাইট হাউস কিম্বা রক্সীর পাশ দিয়ে হেঁটে আবার চৌরঙ্গীতে এসে ওঠে। বিকেল হবার আগেই রাস্তার ধার ঘেঁষে হকারেরা পশরা সাজিয়ে বসে। তার মধ্যে বিলিতি সেন্ট থেকে হাতে সেলাই করবার মতো ছোট্ট জাপানী

মেশিনেরও খোঁজ মেলে। কোনোদিন ইচ্ছে হ'লে হিয়া চৌধুরী গড়িয়াহাটাতে চলে যায়। সেখানেও দোকানে পথের ধারে নানা পণ্যের ছড়াছড়ি। অগুণতি ক্রেতাদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিয়া চৌধুরী পছন্দ মতো জিনিস সন্ধান করে। খোঁজ পেলে ব্যাগ থেকে পয়সা তুলে সেটি সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু এমনি এলোমেলো বেড়ানো আর কেনাকাটি ছাড়াও হিয়া চৌধুরীর অন্য একটি নেশা আছে। সেটি সিনেমা দেখা। ভালো-মন্দ যাই হোক, সপ্তাহে তিন-চার দিন তার কোনো হলে ঢোকা চাই। ম্যাটিনি কিংবা ইভনিং শো'তে যেতেও আপত্তি নেই। সাধারণতঃ হিন্দি ছবি দেখতেই বেশী পছন্দ করে। তবে ভালো বাংলা বই হ'লেও টিকিট কেনে। ইদানীং বাংলা বইতেও ঝাড়পিট থাকে। সাদামাটা ঘর-গেরস্থালীর গল্প, কিম্বা প্যানপ্যানে প্রেমের কাহিনী হিয়াকে আদৌ আকর্ষণ করে না। ছবির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানো ঘটনা না থাকলে হিয়ার কাছে সে বই লবণহীন রান্নার মতো পানসে লাগে। তেমন বিরক্তিকর হ'লে ইনটারভ্যালের সময় সেই যে বেরিয়ে আসে আর ভিতরে ঢোকে না।

সিনেমা যাওয়ার সঙ্গী-সাথী কদাচিৎ মেলে। সাধারণতঃ ছবি সে একলা ছাখে। স্বামীর সঙ্গে কবে ফিল্ম দেখতে গিয়েছিল, সে কথা এখন তার ভালো করে মনে পড়ে না। বোধহয় অষ্ট মঙ্গলার পরে রতীশ তাকে একবার সিনেমা নিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম এবং শেষ। আর এখন তো রতীশের সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়ার কথা তার নিজের কাছেই কেমন অবাস্তব মনে হয়। ট্রান্স-পোর্টের ব্যবসা নিয়ে সমস্ত দিন লোকটা যেন নেশায় ডুবে আছে। কারো দিকে তাকাবার মন নেই। একবার সাসারাম কিম্বা বখতিয়ারপুরের কাছে ওর একটা ট্রাক ঠিক গুবরে পোকার মতো উল্টে চিৎ হয়ে গিয়েছিল। কত মাল যে নষ্ট। তখন রতীশের কী মনের অবস্থা। চোখেমুখে দুর্ভাবনা। বাড়িতে ওই দুঃসংবাদ আসার পর আর কিছু মুখে দেয়নি। সমস্ত রাত চোখে ঘুম নেই, জেগে ছটফট করে কাটাল। ফের ভোর হতেই সেই যে বেরিয়ে পড়ল, আর দশ দিন ঘরে ফেরে নি। আশ্চর্য মানুষ! এর মধ্যে একছত্র চিঠি লিখেও তাকে খবর পাঠানো প্রয়োজন মনে করল না। অথচ হিসেব মতো হিয়ার যেদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কথা, সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রতীশ দিব্যি কাজে বেরিয়ে গেল। লজ্জার মাথা খেয়ে হিয়া তাকে একবার বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করেছিল। তারপর স্বামীর দোমনা ভাব দেখে নিজেই তাকে অব্যাহতি দিল। শেষে শোভাবাজারে বাপের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে ভাই আর বোনকে এনে কাছে রাখল। এই

মানুষ। কাজের দিনে দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যায় ফিল্ম দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব শুনলে রতীশ হয়তো এখন বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে তাকাবে। তাই বলে যেদিন ছুটি, সেদিনও যে বউকে সঙ্গে নিয়ে তার কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ থাকে, এমন ক া বললে সত্যের অপলাপ হবে। আসলে রতীশ কেমন এক ধরনের। এই সব ছবি ‍ৃবি, ফিল্ম, জীবনের কোনো শৈল্পিক বিকাশ,—কিছুই যেন তাকে আকর্ষণ করে না। মানুষটার মন বলে কোনো পদার্থ আছে বলে হিয়ার অন্তত উপলব্ধি হয় নি। বিধাতা পুরুষ ওকে গড়বার সময় ওই বস্তুটি দান করতে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। ত ব ফলে আচারে ব্যবহারে রতীশ স্রেফ যান্ত্রিক হয়ে গেছে। কিন্তু সেই যন্ত্রের মতো একজন পুরুষের সঙ্গে একটা রক্তমাংসের মেয়ে সমস্ত জীবন কীভাবে কাটাবে তার উত্তর কেউ দিতে পারে?

গায়ে পড়ে অনেকেই অবশ্য তাকে সঙ্গ দিতে এসেছে। এমন পুরুষ সর্বত্রই আছে। এর আগে যেখানে ছিল, সেখানেও সুযোগ-সন্ধানী, নারীসঙ্গলোভী মানুষের অভাব হয় নি। কিন্তু ধীরে ধীরে হিয়া চৌধুরী এই সংসারটাকে চিনতে শিখেছে। বাকিটুকু অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। তাই এখন সে পোড়-খাওয়া, শক্ত, অভিজ্ঞ। ভুল ভ্রান্তি করে বিপথে পা বাড়িয়ে নিজের বিপদ ঘটাবে না। এই বসন্তবিলাস রোডে আসবার পর হীরালালও তার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছিল। একদিন মৌলালীর কাছে দেখা হতে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। সে কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইল। এমন কী তাকে গাড়িতে ধর্মতলা পর্যন্ত লিফট্ দিতে ইচ্ছে জানাল। কিন্তু হিয়া রাজি হয় নি। হেসে জবাব দিল—‘এইটুকু রাস্তা। আমি ট্রামে দিব্যি চলে যাব।’ তবু হীরালাল তাকে যেতে দেয় নি। ফের এমন দু-একটা বেফাঁস কথা বলেছিল, যা প্রথম পরিচয়ের দিনে কোনো পুরুষের মুখে শুনলে যে কেউ মেয়ে যথেষ্ট বিরূপ হতে পারে। এরপরও হিয়া অভদ্রতা করে নি। দাঁড়িয়ে কথা বলেছে,—যতটুকু উত্তর দেওয়া চলে ততটুকু জবাব দিয়েছে। অবশ্য হীরালাল ঝানু ব্যবসায়ী। গাড়ি-বাড়ি, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি,—এখন সবই হয়েছে। এ মেয়ে যে শক্ত ঠাঁই, বেশী ঘাঁটালে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে তা একদিনের আলাপেই হীরালাল পরিষ্কার টের পেল। তাই আর কোনোদিন হিয়ার সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেও গায়ে পড়ে ভাব জমাতে সে চেষ্টা করে নি।

কিন্তু হীরালালকে যত সহজে এড়ানো গিয়েছিল, কোৎনা ঘোষের বেলায় তা সম্ভব হ'ল না। লোকটা বসন্তবিলাস রোডের বাসিন্দা নয়। বড় রাস্তা ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে তার বাড়ি। তাগড়া জোয়ান। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে। ঈষৎ রোদ পোড়া তামাটে রঙ। পানের ছোপ লাগা দাঁত।

পরনে পাতলুন,—হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সেটা পায়ের কাছে বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। একদিন দুপুরে বাস স্টপে তার কাছে এসে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল,—'রোজ কোথায় যান বলুন তো?'

আলাপ-পরিচয় নেই। তবু গায়ে পড়ে এমনি অভব্য কথা বলতে আসে। তাই হিয়া চটে অস্থির। চোখ পাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল,—'সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন জানতে পারি?'

'হি—হি—হি—হি।' তার জবাব শুনে লোকটা গা দুলিয়ে অশালীন ভঙ্গিতে হেসে উঠল। ফের বলল,—'প্রয়োজন আছে বৈকি। পাড়ার বৌ, ভরদুপুরে একলা কোথায় চরতে যান, সেটা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতে পারি।'

—'না। এ কথা জানতে চাইবার আপনার অধিকার নেই।' হিয়া ভ্রূ কুঁচকে মুখখানা শক্ত করে বলল,—'নির্লজ্জের মতো এখনও দাঁড়িয়ে কেন? যান, চলে যান এখান থেকে।'

লোকটা মুচকি হেসে বাঁ চোখটা ঈষৎ ক্ষুদ্র করল। বলল,—'আমার নাম কোৎনা ঘোষ। এ তল্লাটে সব্বাই একডাকে চিনবে। আপনি নতুন, তাই এমন গরম দেখাচ্ছেন। একটু সমঝে কথা বলবেন কিন্তু।'

হিয়া বুঝতে পারল লোকটা সাজ পোশাকেই যা ভদ্রলোক। ভদ্রতার ধার মাড়ায় না। মুখের তো লাগাম নেই। বিশ্বাস কী, এরপরই হয়তো একটা খিস্তি আউড়ে হা—হা করে হেসে উঠবে।

কোৎনা নিজেই বলল,—'জানি, খোঁজখবর সব রাখি। হপ্তায় তিন-চার দিন সিনেমা যান। ঝাড়পিটের বই ভালোবাসেন। তা মাইরি, একা একা বই দেখে কী সুখ হয় বলুন?' ফের একটা চোখ সামান্য টিপে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বলল, —'সঙ্গে তো আমাকেও নিতে পারেন।'

রাগে-দুঃখে হিয়া থরথর করে কাঁপছিল। চোখ-মুখ লাল করে বলল,—'মুখ সামলে কথা বলবেন। ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয়, তাও শেখেন নি?'

আশ্চর্য! কোৎনা কিন্তু চটল না। বরং দাঁত বের করে নির্লজ্জের মতো হাসল। বলল,—'মাইরি। রাগলে আপনাকে এমন সুন্দর আর মিষ্টি লাগে। ঠিক বায়োস্কোপের হিরোইনের মতো।'

অপমানে হিয়ার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। তাকে সাহায্য করার মতো কাউকে চোখে পড়ল না। এই অসভ্য লোকটার হাত থেকে বুঝি তার রেহাই নেই। রতীশ এখন কোথায়, অফিসে আছে কিনা তাই বা কে জানে? হঠাৎ উত্তেজনার বশে সে বোকার মতো বলে বসল,—'আপনি এখান থেকে

যাবেন কিনা বলুন ? নইলে কিন্তু আমার স্বামীকে খবর দিতে বাধ্য হবো, চিৎকার করে লোক জড়ো করব।'

তবু কোংনা ঘোষ আগের মতো অনড় হয়ে রইল। সম্ভবত এবার তার অহমিকায় ঘা লেগেছিল। মুখখানা শক্ত, নির্মম করে সে বলল,—'বেশী রোয়াব দেখাবেন না। মনে রাখবেন, আপনার স্বামীর লাশটা আজ রাত্তিরেই খালধারে ফেলে দিতে পারি।'

হিয়া নির্বাক, মুখ দিয়ে একটি শব্দও নিঃসৃত হ'ল না।

তার অসহায় ভঙ্গি দেখে কোংনা ঘোষ একটু নরম হ'লো। নির্লজ্জের মতো হেসে শুধোল,—'ভয় পেলেন ?' জিভের সাহায্যে চুক চুক করে একটা শব্দ করল সে। ফের বলল,—'আপনাকে এই যুবতী বয়সে বিধবা করতে একটুও ইচ্ছে নেই। তবে আপনার স্বামী যদি খচাখচি করতে আসে, তাহলে কি করব জানেন ?' এক মুহূর্ত থেমে হিয়ার মুখের দিকে তাকাল সে। কেমন ঢঙ করে দেহের পশ্চাদ্দেশের একটি বিশেষ স্থানের প্রতি কুৎসিৎ ইঙ্গিত হেনে বলল,—'ওখানে একটু আদা ঘষে দেব।'



রাত্তিরে রতীশ বাড়ি ফিরলে হিয়া তাকে কিছু বলেনি। কী হবে মুখ নষ্ট করে ? রতীশের মুরোদ জানতে তার বাকি নেই। কোংনা ঘোষের কাছে খানিকটা বড়াই করেছিল ঠিক। কিন্তু স্বামীর দৌড় যে কতদূর, এতদিনে সেটা ভালোমতো জানা হয়ে গেছে। সংসারে ঝামেলার কথা শুনলেই রতীশ আঁতকে উঠে। পারলে সন্তর্পণে এড়িয়ে যায়। আর প্যাচে পড়লে তো একেবারে লম্ফ-ঝম্প শুরু করে দেয়। কী হবে এমন মানুষের কাছে সমস্যার কথা বলে ? তাই হিয়া তাকে আগেই অব্যাহতি দেয়। ঝামেলার ব্যাপার কখনও রতীশের কানে তোলে না।

পরদিন সকালে রতীশ বেরিয়ে যাবার পর পিতুর মা এলো। তখন প্রায় দশটা বাজে। হিয়া একটু অবাক হয়েছিল। তবে কী পিতুর মা আজ কাজে যায় নি ? কিন্তু কেন ? বাড়িতে কারো রোগ-অসুখ ? কিম্বা হঠাৎ টাকার

টানাটানিতে পড়ে গেছে। যতীশ বেরিয়ে যাবার পর সেই কথা বলতেই হিয়ার কাছে এসেছে। নইলে মানুষটা সাধারণত কামাই করে না। তাছাড়া ফুলবাগানে যে বাড়িতে কাজে লেগেছে, সেখানে পিতুর মা ভিন্ন সংসার অচল। বাড়িতে দুটি প্রাণী,—কর্তা-গিন্নি। দুজনেরই বয়স ষাটের বেশী। কর্তা তবু একটু শক্ত রয়েছে। কিন্তু গিন্নি মোটা, দেহভারে জবুথবু। তার ওপর গিঁটে বাত। সকাল সাতটা পর্যন্ত বিছানাতেই পড়ে থাকে। বেলা হলে রোদ উঠলে সামান্য হাঁটা-চলা করে।

পিতুর মাকে ঢুকতে দেখে হিয়াকে দাঁড়াতে হ'ল। মতলব যাই থাক, মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে বলেই মুখের ওপর মানুষকে তো আর সেকথা বলা যায় না। তাই অনিচ্ছাতেও হিয়া সামান্য হাসল। শুধোল,—'কিগো পিতুর মা? আজ বুঝি কাজে যাও নি?'

—'না হিয়াদি।' পিতুর মা একগাল হাসল। বলল,—'কাল বিকেলে গিন্নির দূর সম্পর্কের এক ভাইঝি এসেছে। সে নাকি দুদিন থাকবে। তাকে বলেই আজকের দিন ছুটি চেয়ে নিয়েছি।'

—'তাই বুঝি?' মনের সন্দেহ কাটতেই হিয়ার মুখ-চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাল। এতক্ষণ মিছিমিছি আনাই-ধানাই কত কী ভাবছিল। পিতুর মা টাকা ধার চাইতে এই সকালবেলা তার বাড়িতে এসে ঢুকেছে। এক মুহূর্তের জন্য হিয়াকে বিবেক দংশন করল। ছি ছি! পিতুর মা গরীব বলেই না তার সম্বন্ধে এমন সব কথা চট করে সে ভাবতে পেরেছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে হিয়া তাড়াতাড়ি বলল,—'ব'স পিতুর মা। তোমার জন্য চা করতে বলি।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এমনি আলগোছে কথাটা সে জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু লোকটার নাম শুনে পিতুর মায়ের মুখের চেহারাটা যেন পালটে গেল। আঁখি দুটি ঈষৎ ছোট হয়ে এলো। চোখের তারায় শঙ্কার ছায়া। কিঞ্চিৎ ভাবনামিশ্রিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে জিজ্ঞাসা করল,—'কোতোনের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হ'ল হিয়াদি?'

কোৎনা নয়, কোতোন। নামের উচ্চারণের ঢঙ শুনেই হিয়ার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এলো। শুধু পরিচয় নয়, তবে ওই লোকটার সঙ্গে পিতুর মার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে? সুতরাং কোৎনা ঘোষের সঙ্গে তার কোথায় কীভাবে দেখা হয়েছিল, এখনই আদ্যোপান্ত বলা নিশ্চয় উচিত হবে না। বরং সেটা চেপে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু লোকটা কেমন, ওর সম্বন্ধে পিতুর মা কতখানি খবর রাখে সেটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট।

কিন্তু পিতুর মা তাকে প্রায় চমকে দিয়ে হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষল। অস্ফুটে

বলে উঠল,—'বেজন্মার বাচ্চা।'

মস্তব্যটা নিশ্চয় সেই কোংনার উদ্দেশে। মরালীর মতো গ্রীবা বাড়িয়ে হিয়া তাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

গলা নামিয়ে পিতুর মা ফিসফিস করল,—'কিন্তু এই কথা ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে এমন বাপের ব্যাটা তো এ তল্লাটে নেই।'

ভ্রূ কুঁচকে হিয়া শুধোল,—'কেন? লোকটা বুঝি গুণ্ডা-বদমাশ?'

—'তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক।' পিতুর মা চাপা গলায় জবাব দিল,—'জ্যান্ত শয়তান। পৃথিবীতে ওর অসাধ্য কাজ আছে নাকি?'

হিয়া কিছু বলার আগেই পিতুর মা তাকে সাবধান করল,—'কোতোনের সঙ্গে তুমি যেন কথা বলতে যেওনা হিয়াদি। ও যদি মনে করে, তাহলে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তোমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কারো সাধ্যি নেই রক্ষে করে।'

গতকালের সেই অপমানটা বুকের মধ্যে বিঁধে আছে। পিতুর মায়ের কথা শুনে হিয়া তাই জ্বলে উঠল। বলল,—'মগের মুল্লুক নাকি? থানা-পুলিশ তাহলে রয়েছে কী জন্য?'

—'পুলিশ?' কথাটা অস্ফুটে বলেই পিতুর মা মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে খুক খুক করে হাসল।

হিয়া ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,—'হাসচ কেন? এতে হাসবার কী আছে?'

—'হাসি পেল যে।' পিতুর মা চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল,—কোতোনের গায়ে পুলিশ কোনোদিন হাত দিয়েছে নাকি?'

—'তাহলে নিশ্চয় ওর নামে কেউ থানায় ডায়েরি করে আসেনি।'

—'ডায়েরি?' পিতুর মা ফের খুকখুক করে হাসল। বলল,—'নালিশটা করবে কার কাছে? লোকে তো বলে, থানার পুলিশের সঙ্গে ওর মুখ শোঁকা-শুঁকি আছে। শুধু হাঁটাহাঁটি সার। কোংনা ঘোষকে ঘাঁটিয়ে সে তো আর পার পাবে না।'

হিয়া বলল,—'তাহলে কিল খেয়ে কিল হজম করবে?'

—'তাছাড়া উপায় কি গো হিয়াদি? আর কোংনাকে ধরে নিয়ে গেলেও পুলিশ কী ওকে আটকে রাখতে পারবে?'

—'আলবত পারবে। ওর বিরুদ্ধে নালিশ থাকলে পুলিশ নিশ্চয় ওকে অ্যারেস্ট করতে পারে। আইনে তাই আছে।'

—'তা হয়তো আছে।' পিতুর মায়ের কণ্ঠস্বর কেমন নেতিবাচক শোনাল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের ফিসফিস করে বলল,—'কোৎনা ঘোষের পিছনে পার্টির সব বাবুরা আছে না? খবর পেলেই তারা টেলিফোনে থানা-পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে মারবে। বড় দারোগাকে বলবে, কোৎনা নির্দোষ। মিছিমিছি ওকে এই কেসে জড়াবেন না।

হিয়া চৌধুরী চুপ করে গেল। পিতুর মায়ের যুক্তি অকাট্য। পাড়ার এই মস্তানদের সঙ্গে পুলিশের একটা অংশের হয়তো যোগসাজস আছে। কিন্তু শুধু মাত্র সেই কারণেই এরা এমন বেয়াড়া, বেপরোয়া হয়ে সাধারণ মানুষের মাথায় চড়ে বসে নি। আসলে পেছন থেকে এদের শক্তি জোগায় রাজনৈতিক দলের লোকেরা। সামনা-সামনি এই সব বিপথগামী যুবকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তারা হয়তো স্বীকার করবে না। কিন্তু নেপথ্যে উভয়ের মধ্যে যে একটা আঁতাত থাকে, তা এখন দেশসুদ্ধ সকলেই জানে। সত্যি কথা বলতে এ দেশের গণতন্ত্রের এই চেহারা। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে শুধু ভোটের জন্য প্রচার যথেষ্ট নয়। কব্জীর জোরেরও রীতিমতো প্রয়োজন। তাই অপরিহার্য কারণেই দরকার এদের। এরই মধ্যে হঠাৎ কেউ ফেঁসে গেলে কিম্বা পুলিশের খপ্পরে পড়লে প্রভাবশালী নেতার কাছ থেকে টেলিফোনে অনুরোধ আসে। লোকটি তার পার্টির আশ্রিত এবং নানা ভাবে প্রয়োজনে লাগে। তাই সম্ভব হ'লে ওকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। থানার পুলিশও হাওয়া বুঝে চলে। কী দরকার নিজেকে মিছিমিছি ঝুট-ঝামেলায় জড়ানোর? আজ হয়তো অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের জিদ বজায় রাখা চলবে। কিন্তু কাল? কাল যদি সে নিজেই একটা ঘটনায় ফেঁসে যায়? তখন ওপরওয়ালা কী তাকে ছেড়ে কথা কইবে?'

পিতুর মা ফের বলল,—'তারপর যদি মামলা হয়, তাহলে সাক্ষী-সাবুদ চাই। তা ওই কোৎনা ঘোষের বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়িয়ে কে সাক্ষী দিতে যাবে বল? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে?'

হিয়া বুঝতে পারছিল লোকটা সাঙ্ঘাতিক। এই এলাকাতে ওর একটা মস্তান পার্টি আছে। সবাই তাই ওকে ডরায়, ভয় করে চলে।

পিতুর মা বলল,—'ওর সাকরেদগুলোকে তো দেখনি হিয়াদি। কী জুলপির বাহার। সব গুণ্ডা বদমাশ। বিশ্রী চোয়াড়ে চেহারা। চোখের দিকে তাকালেই ভয়ে ছোট ছেলে মেয়ের হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধোতে চাইবে। আর সন্ধ্যের পর কার সাধ্যি সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে।'

—'কেন?'

—'কেন আবার? মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।' ঠোঁটটা বিকৃত করে পিতুর মা ফের বলল,—'ওসব বিলিতি মদে ওদের নেশা হয় না।

ছোঁড়াগুলো দিশি মদ খায়। শুনেছি তাড়ি টানে।'

—'কিন্তু টাকা-পয়সা ?' হিয়া শুধোল,—'নিত্যি মদ খেতে রেস্ত জোটে কেমন করে ?'

—'এবার তুমি হাসালে হিয়াদি।' পিতুর মা ঈষৎ ভ্রূ নাচিয়ে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করল।

—'তার মানে ?'

—'মানে অতি সরল। মস্তানদের হাতে কোথা থেকে টাকা আসে তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?'

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলেও হিয়া প্রায় অজ্ঞতার ভান করল।

পিতুর মা বলল,—'শুনেছি কোৎনা ঘোষের হাতে ফি-মাসে দশ হাজার টাকা তোলা আসে।'

—'তোলা ?' কথার মানে বুঝতে না পেরে হিয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

পিতুর মা জবাব দিল,—'তোলা মানে একটা থোক টাকা। ফি-মাসে ওটা দিতে হয়। এ তল্লাটের যত ব্যবসাদার, কল-কারখানার মালিক কারো রেহাই আছে নাকি ?' মুচকি হেসে সে ফের বলল,—'কোৎনা ঘোষের প্রণামী ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

—'আর না পাঠালে ?'

—'না পাঠালে তার ওপর শনি ঠাকুরের দৃষ্টি পড়বে। রাত দুপুরে কারখানায় কিম্বা বাড়িতে বোমা ফেলবে। সে কী একটা দুটো নাকি ? অন্তত বিশ-পঁচিশটা বোমা ফাটিয়ে এলাকাটাকে কাঁপিয়ে ছাড়বে।'

হিয়া চৌধুরী বলল,—'তাহলে এ তল্লাটের লোকে কোৎনা ঘোষকে যমের মতো ভয় করে ?'

—'না করে তো উপায় নেই হিয়াদি। পিস্তল, ভোজালি, বোমা, পাইপ-গান আরো কত সব অস্তর ওদের হাতে। আর দু-একটা খুন-খারাপি তো চড়-চাপড়ে মশা মারার সামিল। তাই প্রাণের ভয়ে লোকে চুপ করে থাকে। টুঁ শব্দটি করে না।'

হিয়া কোনো উত্তর দেবার আগেই পিতুর মা ফের বলল,—'থাক না, সামনের কালী পূজোতে দেখতে পাবে। কী ধচ্চরখানা কাণ্ড হয়। গত সালে আঠারো হাত কালী এনেছিল। আর তেমনি সব আলোর সাজ। এ বছর নিশ্চয় আরো উঁচু প্রতিমা করবে।'

—'তাই নাকি ?' হিয়া সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাল।—'চাঁদার জন্ম তাহলে খুব জুলুমবাজী করে ?'

—'জুলুমবাজী বলতে পার। তবে এখন লোকের গা-সহা হয়ে গেছে। জানে টাকাটা দিতেই হবে। এই তো হীরেদাদা, ফি-বছর কোৎনা ঘোষের পূজোতে পাঁচ'শ এক টাকা চাঁদা দিচ্ছে।' এক মুহূর্ত থেমে পিতুর মা ফের বলল, —'কিন্তু সেই চাঁদার জন্যে কোৎনা ঘোষ তোমার দরজা মাড়াবে না।'

—'তাহলে ?' চাঁদা বুঝি তার ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ?'

—'ঠিক তাই।' পিতুর মা যেন ব্যঙ্গ করল। বলল,—'বড় জোর কোৎনা ঘোষের এক সাকরেদ এসে চাঁদার বিলটা তোমাকে ধরিয়ে দিয়ে যাবে। তারপর দু-তিন দিনের মধ্যে টাকাটা তাকে পৌঁছে দিতে তোমাকেই সেখানে যেতে হবে।'

—'কী অন্যায় জুলুম।' হিয়া রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল।

পিতুর মা বলল,—'দাদাবাবুরও শুনি বড় ব্যবসা। নিজের ট্রাক আছে। এ বছর কোৎনা ঘোষ কিন্তু মোটা টাকা চাঁদা না নিয়ে ছাড়বে না।'

—'তাই নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই।' হিয়া মুখ কুঁচকে জবাব দিল,— 'ওসব চাঁদাব ব্যাপার সে নিজে বুঝবে।'

পিতুর মা ফের বলল,—'এমনিতে গুণ্ডা-বদমাশ ঠিক, কিন্তু কোৎনা কখনও এলাকার গরীব মানুষের ওপর অত্যাচার করে নি। আর পাড়ার বউ-ঝিউড়ি মেয়ে মানুষের দিকে তার কুনজরও নেই।' এক মুহূর্ত থামল পিতুর মা। ফের যেন নিজেকে সংশোধন করে বলল,—'শুধু একবার।'

—'একবার কি ? বল, থামলে কেন।' হিয়া বাকিটুকু শোনার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করল।

পিতুর মা যেন একটা গোপন কথা ফাঁস করছে। তাই ফিস-ফিস করে বলল,— 'ওই যে পেয়ারী মিত্তির লেনের বসাক বাড়িতে কোথা থেকে যেন একটা মেয়ে এসেছিল।'

—'মেয়ে ?'

—'হ্যাঁগো শিলিগুড়িতে নাকি তার মা-বাপ থাকে। এখানে মাসীর বাড়িতে মাসখানেক ছিল। তা সে বছর দেড়েক আগে।' চোখ দুটি প্রায় গোল করে পিতুর মা সবিস্তারে বলল,—'মেয়েটাকে আমি চোখে দেখেছি। তেইশ—চব্বিশ বছর বয়স হবে। বেশ ঢল ঢল মুখখানি। মাজা-মাজা গায়ের রঙ। সুন্দর মেয়েলি গড়ন। খুব সেজে-গুজে রাস্তায় বেরুত। একদিন রাত্তির সাড়ে সাতটার সময় পোস্টাফিসের মোড়ে বাস থেকে নেমে মেয়েটা হেঁটে বাড়ি ফিরছে। তা কোৎনা ঘোষ নাকি তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।'

—'বল কী ?' হিয়া চৌধুরী সভয়ে শুধোল। 'জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে

রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল, আর কেউ রুখে দাঁড়াল না ?'

—'কী জানি হিয়াদি। ব্যাপারটা আমার কাছেও ঠিক পস্ট মনে হয় নি। তবে তখন পাড়ায় একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী। গাড়ির সীটে বসেই কোৎনা নাকি হাত বাড়িয়ে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ভিতরে টেনে তুলেছে। দু-চারজন স্বচক্ষে তাই দেখেছিল।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আবার কী ? খবর পেয়ে ওর মেসো-মাসী দুজনেই থ। মুখে দিয়ে আর বাক্যি সরেনি। খানিক বাদে থানায় খবর দিতে ছুটছিল। কিন্তু দু-একজন আত্মীয় বন্ধু নাকি তখুনি যেতে দেয় নি।'

—'কেন ?' হিয়া প্রশ্ন করল।

—'কেন আবার ?' পিতুর মা ব্যাখ্যা করে বলল,—'পুলিশে খবর দিলে নিস্তার আছে ? কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কেলেঙ্কারী শেষ পর্যন্ত কোর্ট-কাছারিতে গড়াবে। তারপর মেয়েটাকে কাঠগড়ায় তুলে কেচ্ছার কচ-কচি করে ছাড়বে।'

—'মেয়েটাকে আবার ফিরে পাওয়া গিয়েছিল ?' উত্তরের আশায় সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

—'পাওয়া গেল বৈকি।' পিতুর মা হেসে জবাব দিল।

—'কখন ?'

—'রাত দশটার পর। মেয়ে নাকি নিজেই বাড়ি ফিরে এসেছিল।'

—'ওমা !' হিয়া অবাক হয়ে শুধোল,—'কোৎনা ঘোষ ওকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল কিছু বলে নি ?'

—'না। ওর মুখ থেকে সে কথা কেউ জানতে পারে নি।'

—'তার মানে ?'

—'মানে সোজা। রাত্তিরে মেসো-মাসী কাউকে ওর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। পরদিন খুব ভোরে কাকপক্ষী ডেকে ওঠার আগেই মেসো ওকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়িতে ওর মা-বাবার কাছে জিম্মা করতে চলে গেল।'

—'বুঝতে পেরেছি।' হিয়া একটু ভেবে বলল। 'এই নিয়ে কেউ থানা-পুলিশ করে নি। করলে বাছাধন মজা টের পেত।'

—'জানো হিয়াদি' পিতুর মা নিজেই বলল,—'কোৎনা ওকে জোর করে গাড়িতে তুলেছিল এমন কথা মোটে স্বীকারই করল না। উল্টে বলল, তার সঙ্গে মেয়েটার আগেই ভাব-সাব হয়েছিল। দমদমের এরোড্রোম দেখতে নাকি খুব

ইচ্ছে। কোংনা তাই ওকে গাড়িতে করে রাত্তির বেলায় এরোপ্লেনের ওড়া-নামা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'এই কথা তোমার বিশ্বাস হয়?' হিয়া সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'অত রাত্তিরে একটা সোমত্থ মেয়ে কোংনার মতো গুণ্ডা-বদমাশের সঙ্গে এরোড্রোম দেখতে যাবে?'

—'আমার তো বিশ্বাস হয় না।' পিতুর মা মাথা নাড়ল। ফের কী যেন চিন্তা করে বলল,—'তবে মেয়েমানুষের মন না মতি। আর স্বভাব-চরিত্তির যাই হোক, কোংনা দেখতে সুপুরুষ। পাড়ার লোকে তাই বলছিল, জোর করে ওকে গাড়িতে তুলতে হয় নি। তলে তলে ডবকা ছুঁড়িটা নিশ্চয় কোংনার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ঢলাঢলি করেছে। এই তো মেসো ভোর না হতেই সাত তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে তার মা-বাবার হাতে জিম্মা করতে ছুটে গিয়েছে।'

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল পিতুর মা এক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল,—'ওই আমার ছেলে এসেছে হিয়াদি। একটা দিন কাজে না গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব, তার কী জো আছে? সংসারে উনষাট প্রয়োজন একেবারে হাঁ করে গিলতে আসবে। অথচ যেদিন বাড়িতে থাকব না, সেদিন ঘর-সংসার দিব্যি চলে যাবে। নেই বলে একটুও আটকাবে না।'

—'তাই তো নিয়ম পিতুর মা।' হিয়া হেসে জবাব দিল। বলল,—'রাজা ভিন্ন কী রাজ্যি অচল থাকে? যেমন চলছিল, তেমনি চলবে।'

সিঁড়ি দিয়ে পিতু উপরে উঠে এলো। স্নান সেরে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। মাকে ডেকে দিয়ে কাজে চলে যাবে। হিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ফিক করে হাসল। শুধোল,—'ভালো আছ মাসী?'

পিতুর দিকে তাকিয়ে হিয়ার কী যেন মনে হ'ল। ওই ফাঁকে তার সাজ-সজ্জার ওপর এক নজর বুলিয়ে নিল। রাসমণি বাজারের কাছে কোথায় যেন একটা টুনি ল্যাম্পের কারখানা আছে। পিতু সেখানেই কাজ করে। তবে ফুরনে পয়সা। মাসে বড় জোর এক'শ টাকা কামায়। কিন্তু সাজগোজের বহর দেখলে মনে হবে যেন একটা বড় কোম্পানীর কেরানী কিংবা রিসেপশনিস্ট মেয়ে। হিয়া অপাঙ্গে ফের এক পলক তাকে জরিপ করে নিল। ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটা শাড়ি পরনে। সেই সঙ্গে ম্যাচ করা জামা। গলায় শাদা পুঁতির মালা। ঠোঁটে ঈষৎ রঙ। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ। মাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল,—'তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। উনুনে ভাত বসানো আছে। আর এক ফোট হলেই নামাতে হবে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পিতু ফের ব্যস্ত হ'ল। হিয়াকে লক্ষ্য করে বলল,—'এখন যাই গো মাসী। আর দেরি করলে ডিউটিতে

লেট হয়ে যাবে।'

মেয়ে চলে যাবার পর যাই-যাই করেও পিতুর মা আরো কিছুক্ষণ কথা বলল। মেয়েদের যা স্বভাব। কথা মানেই কাহিনী। তার শুরু হয়, কিন্তু শেষ হতে চায় না।

হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'হ্যাগো, পিতু কী সত্যি আর কোনোদিন শ্বশুর-বাড়ি যাবে না?'

এক ধরণের প্রশ্ন আছে যার এক কথায় জবাব হয়, কিন্তু গুছিয়ে না বললে ঠিক উত্তর হয় না। পিতুর মা মাথায় হাত রেখে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের বলল,—'সব আমার কপাল, বুঝলে হিয়াদি। নইলে দেখে শুনে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের যেমন সামর্থ্য। তা ওই ছেলের যে আরো একটা বউ আছে, এ খবর তো আগে জানতে পারি নি।'

দোষটা যেন পিতুর মায়ের। মুখচোখের তেমনি ভঙ্গি করে হিয়া মন্তব্য করল,—'ভালোমতো খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল।'

পিতুর মা সখেদে জবাব দিল,—'দিন-রাত্তির সেই কথা তো ওর বাপকে বলি। তা সে মানুষটা সরল, সাদা মাটা। আর পাঁচজনের মনে যে জিলিপির প্যাঁচ থাকতে পারে তা কিছুতেই ওর মাথায় আসে না।'

মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে পিতুর মা গজগজ করছিল,—'আমার মেয়েরও তেমনি ধনুক ভাঙা পণ। প্রথম পক্ষের বউ ঘরে থাকতে আর কোনোদিন সোয়া-মীর ঘরের চৌকাঠ মাড়াবে না। তা মেয়েমানুষের এমন জিদ করলে চলে?'

হিয়া কিন্তু পিতুকেই সমর্থন করল। বলল,—'তা মেয়ে তোমার কিছু অন্যায় বলেনি। সতীনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে স্বামীকে নিতে যাবে কোন দুঃখে? তারপর ধর, যদি দুদিন বাদে ঝগড়াঝাঁটি করে তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়, তখন?'

কথাটা পিতুর মায়ের মনে ধরল। হেসে জবাব দিল,—'যা বলেছ হিয়াদি। আর সোয়ামীর নাম শুনলে পিতু কী বুলি ছাড়ে জানো?'

—'কী?'

'পিতু বলে বিয়ে মানে বিশ্বাস। যে মানুষ আগেই বিশ্বাস ভেঙেছে, তার সঙ্গে ঘরকন্না কিসের? এখন রূপযৌবন আছে, তাই নিয়ে খেতে সাধাসাধি। দুদিন বাদে শরীর ভাঙলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।'

হিয়া কী যেন চিন্তা করছিল। হঠাৎ পিতুর মায়ের দিকে তাকিয়ে সে পরামর্শদাতার মতো বলল,—স্বামীর সঙ্গে তো ওর এখনও ডিভোর্স হয় নি। বরং কোর্ট থেকে সেটা করিয়ে নিলে পারতে।'

—'ডিভোরোস ?' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে পিতুর মা প্রায় একটা অনাবিল কৌতুকের সৃষ্টি করল। ফের বলল,—'তার মানে তো বিয়ে বাতিল। সোয়ামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তার বাকি কী আছে ? এয়োস্ত্রীর কোন চিহ্নটা ওর গায়ে দেখতে পেলে ? সিঁথির সিঁদুর তো কবে মুছে দিয়েছে। হাতের শাঁখা আর নোয়া দুই ঘুচিয়ে এসেছে। এখন আইবুড়ো মেয়ের মতো বেশবাস, ছখানা করে কাচের চুড়ি পরে থাকে।'

হিয়া বলল,—'তবু আইনের চক্ষে ওরা এখনও স্বামী-স্ত্রী। শাস্ত্রমতে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন সে বিয়েকে তো অস্বীকার করবার উপায় নেই।'

ব্যাপারটা পিতুর মায়ের ঠিক বোধগম্য হয় না। আগের দিনের সেই ধ্যান-ধারণা মনের মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। মেয়ে যদি সিঁথির সিঁদুর সব মুছে ফেলে, এয়োস্ত্রীর চিহ্ন সব ঘুচিয়ে আসে তাহলে আবার সোয়ামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের ? সেই মেয়ে নাকি আইনের চক্ষে এখনও একজনের স্ত্রী ? হি-হি ! ব্যাপারটা মনে হতেই পিতুর মায়ের যেন হাসি পেল। পরক্ষনেই নিরুত্তাপ শূন্যদৃষ্টিতে হিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল,—'আমি খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম, ছেলে সেই আগের পক্ষের বউটাকে নিয়ে মনের আনন্দে ঘর-সংসার করছে। পিতুর সতীনের এখন বেটা-বেটি হয়েছে। ছেলেটা ছোট। এই তো বছরখানেক আগে খরচপত্র করে সেই ছেলের অন্নপ্রাশন করল।' এক মুহূর্ত থামল পিতুর মা। ফের সখেদে বলল,—'পিতু যদি আমার কথা শুনত, তাহলে ওই ঘর সংসারের চাবিকাঠি আজ ওর আঁচলে বাঁধা থাকত। নইলে আমার পিতুর কাছে ওই সতীন মেয়েটা একটা প্যাঁচা বৈ তো কিছু নয়। আর পিতুরানী সামনে থাকলে জামাইয়ের কখনও ওই কেলে-কুচ্ছিৎ বউটাকে মনে ধরে ?'

হিয়া বলল,—'কিন্তু ধর, তোমার মেয়ে যদি ফের বিয়ে করে ? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক পলক তার মুখের দিকে তাকাল সে। পরক্ষণেই ঈষৎ হেসে বলল,—'মানে তুমি যদি আবার বিয়ে দাও।'

—'পিতুর বিয়ে ? চোখ ঘুরিয়ে পিতুর মা যেন আকাশ-পাতাল চিন্তা করল। ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—'না গো হিয়াদি। সে ক্ষ্যামতা আর নেই। ওর একবার বিয়ে দিতেই ধারদেনায় ডুবে গিয়েছিলাম। অনেক কষ্টে সব শোধ দিয়েছি। এখন চোখের সামনে ছোট মেয়েটা দিন দিন ডাগর হচ্ছে। বরং তার জন্যেই একটা সুপাত্তরের কথা ভাবি।'

পিতুর মা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। 'আর এক ফোট হলেই ভাত নামাতে বলে গিয়েছে পিতু। কে জানে এতক্ষণে হাঁড়ির ভাত আবার গলে গিয়েছে কি না ?

ওর কথার ধর৷ শুনে হিয়া নিশ্চিত হ'ল। না, পিতুর ব্যাপার-স্যাপার তার মা জানে না। খুব চালাক তো মেয়েটা। ডুবে ডুবে দিব্যি জল খাচ্ছে। অথচ মুখ দেখলে মনে হবে নিপাট ভালোমানুষ। ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানে না।

আসলে কদিন আগে পিতুকে একটা ছেলের সঙ্গে ধর্মতলায় সিনেমা হল থেকে সে বেরোতে দেখেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। মাস তিন আগে পিতুকে ওই ছেলেটার পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকতে দেখেছিল। প্রথম দিন হিয়ার মনে হয়েছিল ছেলেটা হয়তো ওদের কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় কিম্বা বিশেষ পরিচিত হবে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা, তাই দু-কাপ চা নিয়ে মুখোমুখি বসে কথা বলতে রেস্তোরাঁতে ঢুকেছে। কিন্তু দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যের মুখে ধর্মতলায় সিনেমা হল থেকে দুজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে হিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল। বছর চব্বিশ বয়স হবে ছেলেটার। পিতুর চেয়ে সামান্য লম্বা। স্বাস্থ্য ভালো। পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট। পায়ে চপ্পল। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। আড়াল থেকে অনেকক্ষণ সে দুজনকে লক্ষ্য করল। তারপর ওদের চোখের হাসি, কথার ঢঙ, আর বিদায় নেবার সময় বার বার পিছন ফিরে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই সম্পর্কটা বুঝতে হিয়ার দেরি হয় নি। আসলে এই ব্যাপারে মেয়েদের চোখ দুটো ঠিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। নারী আর পুরুষের গোপন সম্পর্ক যত গভীরেই থাক, মেয়েরা একবার তাকালেই তা ধরে ফেলবে।



হীরালাল ইশারা করতেই হারাধন গাড়ি নিয়ে এলো। এই গাড়িটা সে চালায়। বছর চার-পাঁচ আগে এক আর্মেনিয়ান সাহেবের কাছ থেকে হীরালাল গাড়িটা কিনেছিল। প্রায় নতুন গাড়ি। সাহেব বেশী ব্যবহার করে নি। বাগড়ি মার্কেটে সুতোর ব্যবসা ছিল সাহেবের। অনেকদিন আগেই স্ত্রী গত। এক মেয়েকে নিয়ে বুড়ো থাকত রয়েড স্ট্রীটের তিন কামরার ফ্ল্যাটে। তা কপাল যখন ভাঙে, তখন শুধু চিড় খায় না। একেবারে চৌচির হয়ে ফাটে। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই বুড়োর ব্যবসায় নালার ময়লা জলের মতো লোকসানের সরু স্রোত বইতে শুরু করল। মেয়েটারও কী যেন অসুখ হলো। চোয়ালের নিচে একটা

বীচি ফুলে উঠল। কলকাতার ডাক্তাররা সন্দেহ করল ক্যানসার। পরামর্শ দিল বোম্বাইতে গিয়ে টাটার হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। তা শুধু চিকিৎসার জন্য নয়, বুড়ো একেবারে ব্যবসাপাতি তুলে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বোম্বাই পাড়ি দিল। সাহেবের গাড়িটা হীরালাল কিনল সাতাশ হাজার টাকা গুনে দিয়ে। তা বন্ধুবান্ধব যারা এ লাইনে খোঁজখবর রাখে, তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিল যে হীরালালের জিত হয়েছে। বোম্বাই চলে যাবে বলে আর্মেনিয়ান সাহেব তাড়াহুড়ো করে খাট-পালঙ্ক আয়না আলমারি, আরো সব ফার্নিচার জলের দরে বেচে দিচ্ছিল। গাড়িটা প্রথমে বিক্রি করবার কথা ঠিক ছিল না। বোম্বাই নিয়ে যাবে। শেষে এক দালালের মারফত হীরালাল খবরটা সংগ্রহ করল। ভালো গাড়ি। এখনও বাজারে বেশী চাউর হয় নি। অথচ লোকটা সামনের সপ্তাহেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। ইচ্ছে করলে এই ফাঁকে কথাবার্তা বলে দাও বুঝে কিছু কম দামেই গাড়িটা সে কিনে নিতে পারে।

হীরালালের তখন গাড়ি ছিল না। কিনি কিনব বলে ইচ্ছে হ'ত। আবার ভাবত মিছিমিছি খানিকটা টাকা এমনি বেরিয়ে যাবে। বরং ব্যবসায় খাটালে দুটো পয়সা ঘরে আসবে। কিন্তু গাড়ি ভিন্ন কাজে কর্মে অসুবিধে হচ্ছিল। একা মানুষ, ট্রামে-বাসে অবশ্য যাওয়া চলে। কিংবা ট্যাক্সি। কিন্তু প্রয়োজন মতো ট্যাক্সি কী পথে মেলে? আর ট্রাম-বাসের কথা না বলা ভালো। মাঝে মাঝে তারও টিকি মেলা ভার। আবার সামনে পেলেও তাতে উঠতে পারে কার সাধ্যি? বাদুড় ঝোলা হয়ে মানুষ যাচ্ছে। তিল ধারণের ঠাই নেই।

শেষ পর্যন্ত আর্মেনিয়ান সাহেবের এই গাড়িটার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হতেই হীরালালের কেমন পছন্দ হয়ে গেল। নীচে নেমে এক চক্কর ঘুরে ট্রায়াল দিয়ে এলো। সেদিনই সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি থেকে নগদ সাতাশ হাজার টাকা এনে গাড়িটা সে খরিদ করে নিল। তবে মোটর ভেহিকিলস্ থেকে নীল বইটা তার নামে ট্রান্সফার হতে আরো কিছুদিন সময় লেগেছিল।

তখন থেকেই এই গাড়িটা শ্যামাপদ চালায়। মানুষটার বয়স হয়েছে। তাই বলে হীরালাল ওকে জবাব দিয়ে আর একজন ছোকরা ড্রাইভার বহাল করেনি।

পুরানো গাড়িটাকে কেউ কেউ বেচে দিতে পরামর্শ দিয়েছে। আর সত্যি তো, এই ক'বছরে বই খাতায় গাড়িটার দাম কমতে কমতে এখন নগণ্যতে ঠেকেছে। বেচে দিলে বরং মোটা কিছু টাকা ঘরে আসবে। বছর দুই আগে হীরালাল যখন নতুন গাড়ি কিনল, তখন লোকে তাই ভেবেছিল। পুরানো গাড়িটাকে এবার বাতিল করে দিয়ে নতুনটাকে ব্যবহার করবে। কিন্তু হীরালালের স্বভাব আলাদা। নতুন গাড়িটা কিনবার পর সেটাকে ট্রামবুল কোম্পানীকে

ভাড়া দিল। ওই গাড়ি চালাবার জন্য ছোকরা ড্রাইভার নিখিল বহাল হলো। হীরালাল তার সাবেকী ওল্ড মডেল গাড়িখানাকে ফের রঙ করিয়ে নিল। পিছনে কাচের সঙ্গে লাগোয়া সবুজ ভেনেশিয়ান ব্লাইণ্ড। গদীতে ফুলের নকশা আঁকা কভার। সীটের পাশেই রঙচঙে ছ ইঞ্চি ব্লেডের পাখা। সুইচ টিপলেই সেটা বনবন ঘোরে। তাছাড়া গাড়ির সঙ্গে রেডিও, টেপ-রেকর্ডার। মাথার পিছনে একটা ছোট্ট সাউণ্ড বক্স। এসব আগে ছিল না। নতুন গাড়ি কেনার পর হীরা-লাল পুরানো গাড়িটাকে ঢেলে সাজিয়ে নিল। সদ্য রঙ করা সুসজ্জিত গাড়িটা দেখে তার এক বন্ধু সহর্ষে মন্তব্য করেছিল,—'এ তো মাইরি, ফুলশয্যের রাত্তিরের নতুন বউ রে।'

গাড়িটা বসন্তবিলাস রোড ছাড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে এগোতেই হীরালাল দেখতে পেল বাসস্টপে জগমাসী দাঁড়িয়ে। খালের ধারে বাড়ি। অট্টালিকা নয়, ছোট দালানকোঠা। নিচে দুখানা মোটে ঘর, উপরে চিলেকুঠুরি। জগমাসীর স্বামী কর্পোরেশনে কাজ করত। মাইনে বেশী নয়, তবে কিছু উপরি ছিল। রিটায়ার করবার সময় থোক টাকা কিছু হাতে পেল। সেই টাকার খানিকটা খরচ করে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, চিলে-কুঠুরি তৈরী হ'ল। তা বেশীদিন সে এসব ভোগ করতে পারে নি। রিটায়ার করে বছর না ঘুরতেই মাত্র সাতদিনের অসুখে ভুগে মারা গেল। বিধবা হবার পর থেকে জগমাসী এখন বড় নাতিকে কাছে নিয়ে একটা ঘরে শোয়। অন্য ঘরটা ছেলে-বউয়ের। জগমাসীর এক ছেলে আর এক মেয়ে। স্বামী বেঁচে থাকতেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। এই কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ি। মানিকতলা যেতে বাগমারী, সেখানেই জামাই থাকে। খিদিরপুর ডকে চাকরি। মেয়েকে দেখতে জগমাসী বাগমারী যাচ্ছিল। তা বাসস্টপে আধ-ঘণ্টার বেশী দাঁড়িয়ে। দুখানা বাস তো সামনে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল, থামল না। পরে একটা থেমেছিল, কিন্তু গাড়িতে ওঠা দূরে থাক জগমাসী বাসের পাদানীতে একটা পা রাখবার জায়গা পায় নি।

গাড়ি থামিয়ে হীরালাল শুধোল,—'কিগো মাসী, কোথায় যাবে?'

—'বাগমারী।' জগমাসী জবাব দিল।

—'মেয়ের বাড়ি?'

—'হ্যাঁ।' পথের দিকে একবার শূন্যদৃষ্টি মেলে জগমাসী ফের দুঃখ করে বলল,—'আধঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি হীরালাল। তা একটা বাসেও উঠতে পারছি না।'

—'পারবে কেমন করে?' হীরালাল যেন ঠাট্টা করল। ফের হেসে বলল,—'অফিস-টাইমে কখনও বেরোতে হয়? মানুষজন বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাচ্ছে।

এখন বাসে উঠতে গেলে শরীরে তাগদ চাই। তা সে বয়েস কী তোমার আছে ?'

জগমাসীর মুখের ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে এক মুহূর্ত থামল হীরালাল। পরক্ষণেই গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সস্নেহে আহ্বান করল,—'উঠে এস। তোমাকে বাগমারীতে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

জগমাসী একগাল হেসে গাড়ির ভিতরে এসে বসল। বলল,—'ভাগ্যিস তুমি যাচ্ছিলে। নইলে আমাকে নিশ্চয় ঘরে ফিরে যেতে হ'ত।'

তা হীরালাল এটুকু করে। পাড়ার কাউকে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে গাড়ি থামিয়ে উঠতে বলে। বড়মানুষী মেজাজে নাকের ডগা দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যায় না।

গাড়িতে উঠে জগমাসী নিজেই বলছিল,—'শরীরে এখন আর ধকল সয় না। বয়স তো কম হয় নি। তিন কুড়ি পাঁচ, বুঝলে হীরালাল ? তবু সেকেলে লোক, তাই এখনও কোমর সোজা করে তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছি। এখনকার ছুঁড়িগুলোকে দেখবে পঞ্চাশ না পেরোতেই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।'

কথার খেই হারিয়ে মানুষ যেমন ভাবে, জগমাসী তেমনি ভ্রূ কুঁচকে কী যেন চিন্তা করল। ফের অপাঙ্গে হীরালালের দিকে তাকিয়ে বলল,—'অবিশ্যি তোমার বউয়ের কথা আলাদা। তার গতর আছে। দিনমান কী পরিশ্রমটা না করে, আমাদের মেয়ে-মজলিশে সে কথা একবাক্যে সকলে স্বীকার করবে।'

হীরালাল মুচকি হাসল। জগমাসী তার বউয়ের সুখ্যাতি শুনিয়ে তাকে একটু তোয়াজ করছে। যাতে সে একটু খুশি হয়, আবার কখনও এমনি দেখা হ'লে তাকে বাগমারী কিম্বা অন্য কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। প্রসঙ্গ বদলাতে হীরালাল তাই চটপট শুধোল, —'তা এমন অসময়ে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলে কেন ?'

—'না গেলে উপায় নেই।' জগমাসী কৈফিয়ত দিল। 'জামাই কাল গিরীশের কাছে খবর দিয়েছে। তিনদিন মেয়েটার জ্বর ছাড়ে নি। বিছানায় শুয়ে। হাত পুড়িয়ে রান্না করে জামাইকে কাজে যেতে হচ্ছে। রুগীর জন্যে একটু পথ্যি করে দেবে এমন লোক ঘরে নেই।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল হীরালাল। মেয়ের অসুখ। তাই সংসার সামলে দিতে জগমাসীকে এখন দু-চারদিন জামাইয়ের বাড়িতে থাকতে হবে। তা মাঝে-মধ্যে জগমাসী এমন যায়। মেয়ের কাছে গিয়ে দু-চারদিন থাকে। আবার চলে আসে।

পাড়ার মেয়েমহলে অবশ্য একটা কানাঘুষো আছে। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, বনিবনা না হলে জগমাসী মেয়ের কাছে চলে যায়। মন হ'লে নিজেই ফিরে আসে। কখনও ছেলে যায়। দুটো মিষ্টি কথা বলে মায়ের মন ভিজিয়ে দেয়।

সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তা সব সংসারেই তো এমন মান-অভিমান চলে। তাই কেউ এর ওপর তেমন গুরুত্ব দেয় না।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে জগমাসী হঠাৎ চাপাগলায় বলল,—'পটের বিবি তো সাত সকালে সেজেগুজে কোথায় বেরুলেন।'

আড়চোখে মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হীরালাল ইঙ্গিতটা বুঝল। পটের বিবি অর্থাৎ হিয়া চৌধুরী। একটু আগেই তো বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সে হন হন করে তাকে যেতে দেখেছে।

জগমাসী ফের বলল,— 'এখন বাসের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়েছিল। তা জিজ্ঞাসা করতে জবাব দিল ধর্মতলায় যাবে। কী নাকি জরুরি কাজ আছে।'

—'জরুরী কাজ?' হীরালাল জিজ্ঞাসু হ'ল।

—'কাজ না হাতি।' জগমাসী হাত ঘুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল। ফের আগের মতই ফিসফিস করে বলল,— পরশু রাত্তিরের খবর তো শুনেছ?'

—'খবর?' হীরালাল বায়সের মতো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। আসলে নিজের কাজ-কর্ম নিয়ে এখন সে ভীষণ ব্যস্ত গতকাল ভোরবেলায় বেরিয়েছিল। ফিরতে অনেক রাত্তির হ'ল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ট্রাঙ্ককল নিয়ে বসে থাকা। বিছানায় শোবার পর চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। ভামিনীর সঙ্গেও দুটো কথা বলার সুবিধে হয় নি। জগমাসী বলল,—'পরশু রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীর ধুন্ধুমার ঝগড়া।'

কলহের কথা শুনে হীরালাল শুধু হাসল। ঘরে ঘরে অমন মেয়েপুরুষের ঝগড়া ঝাঁটি লেগেই আছে। বাইরে থেকে মনে হবে সংসার বুঝি ভেসে গেল। চিরকালের জন্য দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আসলে কিছুই নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রে শোবার ঘরে ঢুকলেই সন্ধি। দাম্পত্য-কলহ কদাচিৎ বাসী হয়ে থাকে।

তবু হীরালাল প্রশ্ন করল,—'ঝগড়া কেন?'

—'কেন আবার?' জগমাসী জবাব দিল। 'বউয়ের স্বভাব-চরিত্তির নিয়ে সোয়ামীর মনে সন্দেহ ঢুকেছে।'

হীরালাল ফিক করে হাসল। বলল,—'সন্দেহ ঢুকেছে তুমি কেমন করে বুঝলে?'

—'আরে তাই নিয়েই তো গণ্ডগোল। জগমাসী ফের চাপাগলায় কথা কইল। 'কর্তা নাকি বউয়ের ওপর নজরদারি করতে ইস্পাই রেখেছে।'

—'ইস্পাই?' হীরালাল ভ্রূ কোঁচকাল।' পরক্ষণেই ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করে মুচকি হাসল সে। বলল,—'বুঝেছি, ইস্পাই মানে গোয়েন্দা।'

—'কী জানি বাপু। বাড়িতে যে ছোঁড়া চাকরটা থাকে সেই তো সব গল্প করছিল। রাত দুপুরে ওই কথা নিয়েই তর্কাতর্কি। তারপর তিল থেকে তাল। এদিকে বাবুর নেশা তখন কাটে নি। সেই নেশার ঘোরে গিন্নিকে গালমন্দ করে গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিল।'

—'বল কী?'

'হ্যাঁ। তাই তো শুনলাম।' জগমাসী সবিস্তারে ঘটনার কথা বলছিল। 'মেয়েও তো কম জাঁহাবাজ নয়। বাজারে অমন কত গণ্ডা লোককে চরিয়ে বেড়াচ্ছে। তা সেও নাকি ধাক্কা মেরে কর্তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর এক বালতি জল এনে সোয়ামীর গায়ে হুড়মুড় করে ঢেলে দিয়েছে।'

খবরটা শুধু মজার নয়, কিঞ্চিৎ রসালো। বসন্তবিলাস রোডে এমন একটা ঘটনা নিয়ে রীতিমত গুঞ্জন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাকিটুকু শোনার জন্য হীরালাল তাই সাগ্রহে তাকাল।

জগমাসী বলল,—'রাত-দুপুরে কর্তা-গিন্নির যুদ্ধু দেখে ছোঁড়া চাকরটা তো ভয়ে কাঠ। শেষে রাগ করে গিন্নি ঘর থেকে চলে গেলে কর্তাকে শুকনো গামছা আর জামা কাপড় ওই এনে দিয়েছে।'

হীরালাল শুধোল,— 'সেজেগুজে গিন্নি বুঝি এখন ধর্মতলায় গেল?'

—'হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।' জগমাসী ঠোঁটটা ঈষৎ বিকৃত করে ফের বলল,—'এতক্ষণ বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, তা উঠতে পারে নি। শেষে একটা ট্যাক্সি আসতেই সেটা ধরে চলে গেল।'

প্রথমটা হীরালালের আপশোস হচ্ছিল। আর একটু আগে এসে পৌঁছলেই হিয়াকে সে ধর্মতলা পর্যন্ত লিফট্ দিতে পারত। তবে যা একরোখা মেজাজ। হয়তো মুখের ওপর দুম করে না বলে বসত। তাহলেই লজ্জার একশেষ। আর সেকথা জগমাসীর মাধ্যমে সমস্ত পাড়াময়, শেষে ভামিনীর কানে পৌঁছতে বিলম্ব হ'ত না। তার চেয়ে বরং দেরিতে এসে ভালো হয়েছে। অবশ্য তার গাড়ির ড্রাইভার হারাধনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে। সে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কখন দেখা করে, হারাধন কোনোদিন কারো কাছে গল্প করে নি। কিন্তু জগমাসী? তার চোখের সামনে যদি হিয়াকে গাড়িতে তুলে ধর্মতলা পৌঁছে দেয়, তাহলে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার আগেই পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে যাবে। ঘরে পা দিলে ভামিনী যে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ আছে?

জগমাসী চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'বাবু তো সেই রাত থেকে নিপাত্তা। ভোরবেলা কখন চলে গিয়েছে কেউ জানে না। কাল সারাদিন ঘরে ফেরে নি।

মদ-মাতালে লোক। নেশা করে কোথায় পড়ে আছে কে জানে? তাই সোয়ামীর তল্লাসী করতে গিন্নি সাত-সকালে বেরিয়ে পড়েছে।'

'সংসারে আসল কথা হ'ল শান্তি, বুঝলে মাসী? হীরালাল দার্শনিকের মতো মন্তব্য করল। বলল,—'টাকা পয়সা তো অনেকেই কামাচ্ছে। কিন্তু ক'টা লোকের সংসারে সুখ-শান্তি আছে বলতে পার?'

'তা যা বলেছ তুমি।' জগমাসী জবাব দিল। পরক্ষণেই তার মনে হ'ল—অভাবের জন্যও কী সংসারে কম অশান্তি হয়? এই যে তার ছেলে গিরীশ। যা রোজগার করে মাসের পনের দিন না যেতেই তা ফুরিয়ে যায়। বাকি দিনগুলো যে কী কষ্টেসৃষ্টে কাটে জগমাসী তা বাতব্যাধির যন্ত্রণার মতো প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। তাই নিয়ে অশান্তি,—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদ, কখনও সেই বিরক্তির উত্তাপ তার ওপরেও এসে পড়ে। রাগ করে জগমাসী তখন মেয়ের বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও কী নিস্তার আছে? মাঝে-মাঝে খরচপত্র নিয়ে মেয়ে-জামাইয়েরও কলহ হয়। জগমাসী তখন চুপ করে ভাবে। এই অভাবের পৃথিবীতে কোথাও এক তিল শান্তি আছে বলে তার মনে হয় না।

তবে অশান্তি শুধু তার নিজের বাড়িতে নয়। এই বসন্তবিলাস রোডের দু-পাশেই অভাব। কোথাও বা নগ্ন দারিদ্র্য। দু-চারজন অবস্থাপন্ন লোকের কথা বাদ দিলে সব গেরস্তের প্রায় এক দশা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে। আঠারো-উনিশ বছরের কর্মক্ষম জোয়ানের সংখ্যা নগণ্য নয়। এই তো পিতুর মায়ের বড় ছেলে মোহন। একুশ-বাইশ বয়স হবে। এঁচড়ে-পাকা ছোঁড়া। অল্পবয়সেই একটা মেয়ের সঙ্গে নটঘট বাধিয়ে তাকে বিয়ে করে আনে। মোহন একটা প্ল্যাসটিকের কারখানায় দিব্যি কাজ করছিল। মাস গেলে শ-দেড়েক টাকা মাইনে পেত। দিনকতক সেই কারখানার কাছে একটা ঘর ভাড়া করে বউকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেখানে কী গণ্ডগোল বাধল। মালিক তালা ঝুলিয়ে কারখানার দরজা বন্ধ করে দিল। আজ ছ-সাত মাস হ'ল ছেলেটা বেকার বসে। খরচপত্র সামাল না দিতে পারলেই পিতুর মায়ের ঘরে মাঝে-মাঝে তুলকালাম কাণ্ড বাধে। রাগারাগি করে ছেলের বউটা একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পিতু কোনোমতে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনে।

গাড়ি মোড় ঘুরে ভি. আই. পি রোডে ঢুকল। প্রশস্ত রাজপথ। দুপাশে সুরম্য অট্টালিকা। বুলেভারে পুষ্পিত রাধাচূড়া, আরো কী যেন বিচিত্র ফুলের গাছ। পথ দিয়ে অনেক মোটরযান চলেছে। রাস্তার ডানদিকে একটা লম্বা গোছের

মোটরগাড়ি এসে থামতেই এক বিপুলা ভদ্রমহিলা তার ভিতর থেকে একরাশ জিনিসপত্র দুই হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ফুলবাগানের কাছে আসতেই সুদৃশ্য দোকান-পাট, নানা ধরনের পণ্য চোখে পড়ল। বিচিত্র রঙিন শাড়ি-পরা একদল তরুণী খিলখিল করে হেসে তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। অভাব-অনটনে ভরা বসন্তবিলাস রোডের এত নিকটে এ যেন একটা অন্য পৃথিবী। অন্ধকারের উল্টো দিকেই নাকি আলো। দারিদ্র্যের এত কাছে, বোধ হয় তাই এমন প্রাচুর্যের ছবি।

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে জগমাসীর বোধহয় পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। প্রায় বিড়বিড় করে সে স্বগতোক্তির মতো বলল,—'কী ছিল আর কী হয়ে গেল, তাই দেখছি।'

হীরালাল আরো কিছু শোনার আশায় তার মুখের দিকে তাকাল।

জগমাসী বলল,—'আমার বিয়ে তা গিয়ে ধর পঞ্চাশ বছরের ওপর হয়ে গেল। ত্যাখন এসব জায়গায় শুধু ঝোপ আর জঙ্গল। মাঝে মাঝে মুসলমানদের বাস। রাত্তিরের কথা বাদ দাও, দিনমানেই এ তল্লাটে লোকজন বড় একটা আসত না। রাস্তা বলতে ওই শেয়ালদা থেকে জোড়ামন্দির পর্যন্ত। তাও মাঝে মধ্যে জঙ্গল। খালপোল তৈরি হওয়ার আগে লাল সুরকির একটা রাস্তা ছিল। সেটা খালের ধার বরাবর। এখন যেখানে খালপোল হয়েছে, সেখানে বাস থেকে নেমে, নৌকোতে খাল পেরিয়ে লোকে কলকাতা যেত।'

হীরালাল বলল,—'সে সব দিনের কথা আর কে মনে রাখছ মাসী? এখন কলকাতা বদলাচ্ছে, আরো কত বদলাবে। এই তো শুনলাম আমাদের এ দিকটার অনেক কাজকর্ম হবে। সি. এম. ডি. এ. না কী যেন হয়েছে। তারাই সব পথঘাট, স্যানিটারী পায়খানা, মাটির নিচে ড্রেন তৈরি করবে।'

কে জানে? জগমাসী বোধহয় তখনও অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিল। বলল,—'আমাদের পাড়ার ফকির দাস কত গল্প করে। পুরানো দিনের অনেক ঘটনা তার মুখে শুনতে পাবে।'

সে কথা ঠিক। ফকির দাসের এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে। সেই যে একটা মস্ত যুদ্ধ হয়ে গেল, জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেছিল, এ তারও অনেক-দিন আগেকার কথা। এখন যেটা তালপুকুর রোড আর পঞ্চানন মিত্র লেন তার সংযোগস্থলে একটা ফরেস্ট অফিস ছিল। কাছাকাছি জঙ্গল থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে লোকে কাঠ কেটে নিয়ে যেত। সেজন্যই ফরেস্ট অফিস। খালের ধারে তখন ছিল শুধু মালের গুদাম। চালের একটা মস্ত আড়ত ছিল বলেই রাস্তার নাম হয়েছে চাউলপট্টি রোড। এ ছাড়াও তেজপাতা, লঙ্কা, বেত আরো নানা

রকমের মাল এনে আড়তে জমা হ'ত।

এখন যেটা ফুলবাগান তার নামটা কেন এমন হ'ল ফকির দাস সে কথা বলে। উত্তর দিকে যেতে ফুলবাগানের পাশেই ছিল গ্রীকদের কবরখানা। পুষ্পপ্রিয় গ্রীকেরা এখানে একটি সুন্দর ফুলের বাগান করেছিল। আর রাস্তার ওপারে ফুলবাগান থেকে প্রায় কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত ছড়ানো ছিল রিজিয়া নার্সারি। এত ফুলের সমারোহ। তাই ফুলবাগান নামটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি।

রিজিয়া নার্সারিতে যে শুধু ফুল ফুটত তাই নয়। মাঝে মাঝে নাচ-গানের আসর বসত। ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে বাবুরা আসতেন সন্ধ্যের মুখে। দু একটা পুরানো দিনের শেভ্রলে কিম্বা মরিস গাড়ি এসে থামত। চুনোট করা ধুতি, পরনে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। জুড়ি গাড়ি থেকে বাবু নামতেন। খানদানী মুসলমান হ'লে অঙ্গে থাকত শেরওয়ানী আর পাজামা। হাতে প্রস্ফুটিত গোলাপ। জামায় সুগন্ধী আতর। বাবুরা কানের পাশে আতরে ভেজানো তুলো গুঁজে সেজেগুজে এসে বসতেন। কত ফুর্তিবাজ লোক এসে জুটত আসরে।

তখনও কাঁচি সিগারেট চালু হয়নি। বাজারে ট্যাটলার সিগারেটের খুব নাম। এক প্যাকেট ট্যাটলার সিগারেট দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে ফকির দাস একবার মুজরো শুনতে ঢুকে পড়েছিল। আকাশে চাঁদের আলো, সামিয়ানার নিচে চার পাঁচটা ডে-লাইট ঝোলানো। বাঈজীর কানের পাশে মূল্যবান পাথর বসানো সোনার ঝালর। সলমা-চুমকির কাজ করা ঘাঘরা আর ওড়না গায়ে দিয়ে নাচওয়ালী বিচিত্র ভঙ্গিতে সেলাম জানিয়ে নাচ শুরু করত। বাঁ হাতের তেলো কানের পাশে চেপে বাঈজী সুমিষ্ট স্বরে গান ধরল,—

ও এক্কাবালারে
বেরিলী কা বাজার মে
ঝুমকা গিরা রে।

এই কলকাতা আর সেই কলকাতা! যেন আশমান-জমিন ফারাক।



ধর্মতলা নয়।

হিয়া চৌধুরী এসে নামল তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের মুখে। ট্যাক্সিটা এখানেই ছেড়ে দিলে সুবিধে। রাস্তার দুপাশে ট্রাক আর মাটাডর ভ্যান সারবন্দী দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যবসার জায়গা। সকাল দশটা থেকে রাত্তির আটটা-নটা পর্যন্ত লোক গিজগিজ করে। ট্রাকে মাল বোঝাই হয়। ঠেলাগাড়িতে যে মাল বয়ে আনে। কখনও বিকশতেও আসে। এই ভিড়ভাড়ের মধ্যে গাড়ি চালানো এক যন্ত্রণা। তার চেয়ে পায়ে হাঁটা সুখের, সোয়াস্তির।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হিয়া তাই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। রতীশের অফিসটা বেশী দূরে নয়। আগেও এখানে দু-একবার এসেছে। হঠাৎ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে। তাই বলে এই সাত-সকালে স্বামীর খোঁজে তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের অফিসে আসতে তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। বাড়িতে টেলিফোনটা ঠিক থাকলে ডায়াল করে রতীশের সঙ্গে কথা বলতে পারত। অবশ্য অন্য জায়গা থেকেও কী টেলিফোন করা যেত না? পোস্ট-অফিস কিম্বা কোনো দোকানে পয়সা দিলেও ফোন করা যায়। তবে একটা অসুবিধে। এখন যা কথাবার্তা হবে, পাঁচজনের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তা বলা চলে না। আরো একটা ব্যাপার হিয়া ভেবে দেখেছে। টেলিফোন করলেই যে মানুষটাকে পাওয়া যাবে, তার কী নিশ্চয়তা আছে? হয়তো সমস্ত-দিন মালের ডেলিভারী হ'ল কিনা তার খোঁজ নিতে টো-টো করে চারদিক চষে বেড়াচ্ছে।

রতীশের ট্রান্সপোর্ট বিজনেসের অফিস তিনতলায়। বাঁ দিকের গলির ভিতর একটা গো-ডাউন ভাড়া নিয়েছে। ট্রাকে তোলার আগে মালপত্র সেখানে থাকে। কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মালের ডেলিভারী নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। তখন মাল ফেরৎ আসে। যতদিন না মালিক এসে মালের ভাড়া আরো সব খরচ মিটিয়ে দিচ্ছে ততদিন সেটা ওই গুদাম ঘরে পড়ে থাকে।

তিনতলার অফিস ঘরটা বেশ ছিমছাম, সাজানো। প্রায় ষোল ফুট লম্বা ঘরখানা, চওড়াতেও ছোট নয়। পাশাপাশি দুটো চেয়ার-টেবিলে রতীশ ও তার

ফার্মের পার্টনার বসে। একপাশে ছোট-বড মিলিয়ে তিন-চারখানা আলমারি। তাতে অফিসের ফাইলপত্র, দরকারী কাগজ থাকে। রতীশের বসবার চেয়ারের বাঁ দিকে দুজন কেরানীর জন্য নির্দিষ্ট আসন আছে। তারা হিসেবপত্র রাখে। মালের রসিদ দেয়। কেউ মাশুল জমা দিয়ে ভাউচার লিখিয়ে নেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাশুলভাডা মাল ডেলিভারীর সময় আদায় হয়। রসিদে সেই মত নির্দেশ থাকে।

অফিস ঘরে ঢুকে হিয়া দেখল চেয়ারে শুধু চন্দ্রকান্ত বসে। চন্দ্রকান্ত, অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত সেন। রতীশের ট্রান্সপোর্ট বিজনেসের একমাত্র অংশীদার। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে আলাপ হ'ল সেদিন ওই নামটা শুনে হিয়া আড়ালে হেসেছিল। হি-হি। এমন একটা সুন্দর নাম কিনা ওই ভদ্রলোকের? যিনি নামকরণ করেছিলেন তাঁর কী সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? নইলে চন্দ্রকান্তর নামের সঙ্গে তার চেহারার এমন আশ্চর্য অমিল হবে জেনেও ওই নামটা কেউ রাখে? গায়ের রঙ বেশ কালো। চোখ দুটি ছোট বলা যায়। মাপে কিঞ্চিৎ খাটো। ঘাড়ের অস্তিত্ব প্রায় নেই। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হবে সৃষ্টিকর্তা মুণ্ডুটা তৈরি করে ওর ধডের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। চন্দ্রকান্তর অঙ্গসৌষ্ঠবে আরো কিছু ত্রুটি আছে। উপরের পাটির সামনের দুটি দাঁত বেশ উঁচু। হাসলে লাল মাড়ির খানিকটা অংশ বেরিয়ে বিশ্রী দেখায়।

হিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখে চন্দ্রকান্ত চোখ তুলে তাকাল। মুখভাবে প্রকাশ পেল বিজনেস পার্টনারের ঘরণীর আকস্মিক আগমন যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। অর্থাৎ হিয়া যে রতীশের খোঁজে এখানে আসতে পারে এমন একটা সন্দেহ তার মনে ছিল।

কেরানী দুজন তখনও আসেনি। চন্দ্রকান্ত একা, কথা বলতে তাই সুবিধে। প্রশ্ন যা আছে এখনই সেরে নিলে ভালো। নইলে স্বামী-স্ত্রীর এই ঘরোয়া কেচ্ছা শুনে উপস্থিত অফিসের কর্মচারীরা মুখ টিপে হাসবে।

ভনিতা না করে হিয়া তাই স্পষ্ট শুধোল,—'পার্টি কোথায়?'

চন্দ্রকান্ত মুচকি হাসল। বলল,—'বসুন না ওই চেয়ারটায়। এত ব্যস্ত কিসের?'

হিয়া গম্ভীরমুখে বলল,—'বাড়িতে অনেক কাজ। ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছি। যতক্ষণ না ফিরব, কাজের লোক দুটো হাত গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকবে।'

চন্দ্রকান্ত বলল,—'চৌধুরী তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল।'

—'ফিরবে কখন?' হিয়া ভ্রূ কোঁচকাল।

—'পরশু সন্ধ্যে নাগাদ। কিম্বা তার পরদিন সকালে।' চন্দ্রকান্ত একটু চিন্তা

করে উত্তর দিল।

হিয়া বুঝতে পারল রতীশ কলকাতায় নেই। ব্যবসার কাজে কিম্বা অন্য কোনো প্রয়োজনে গিয়েছে। চন্দ্রকান্ত যা বলছে তাই ঠিক। পরশু সন্ধ্যে নয়, রতীশ ফিরবে তার পরদিন সকালে। সম্ভবত আরো দেরিতে। রতীশের চরিত্র জানতে তার বাকি নেই। বাড়িতে একটা ঝুটঝামেলা হলেই কয়েকটা দিন গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দ্রকান্তকে এক পলক জরিপ করে নিল সে। জিজ্ঞাসা করল, —'পার্টি গিয়েছে কোথায়?'

—'শিলিগুড়ি।' চন্দ্রকান্ত একটা কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, —'না গিয়ে উপায় ছিল না। চেক পোস্টে একটা লরি আটক করে রেখেছে। কী সব পারমিট নেই, তাই নিয়ে ঝামেলা। সেই গণ্ডগোল মেটাতে চৌধুরীকে যেতে হ'ল।'

হিয়া চুপ করে শুনল। কোনো মন্তব্য করল না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রকান্ত বলল,—'এখনও প্লেন ছাড়তে দেরি আছে। জরুরী কথা থাকলে বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। দমদমে নিশ্চয় ওকে ধরতে পারবেন।'

রাগে হিয়ার গা জ্বলে যাচ্ছিল। ন্যাকা! চন্দ্রকান্ত সব জানে, তবু কেমন ভিজে বেড়ালের মতো ভাব করছে। যেন রতীশের ঘরোয়া জীবনের কোনো খবর সে রাখে না। আসলে লোকটা সোজা নয়, গভীর জলের মাছ। রতীশের এই ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার ও মাত্র চার আনার অংশীদার। কিন্তু চলাফেরায় কিংবা লোকজনের সঙ্গে কথায় ওর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হবে যে গোটা বিজনেসের ও একা মালিক। শুধু তাই নয়। হিয়া জানে, রতীশকে নানা কৌশলে ও এমন হাত করে ফেলেছে যে চন্দ্রকান্তর পরামর্শ ভিন্ন সে এক পা হাঁটে না।

গতকাল খুব ভোরে কখন রতীশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল হিয়া জানতেও পারেনি। অবশ্য জানলেও স্বামীকে নিশ্চয় সে বাধা দিত না। ঝগড়াঝাঁটি হ'লে রতীশ অমন সাতসকালে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দিনের বেলা না হোক রাত্তিরে অবশ্য ফিরে আসে। আর যাই দোষ থাক, মানুষটার ইদিক-সেদিক যাওয়ার অভ্যেস নেই। সে বিষয়ে হিয়া নিশ্চিন্ত। স্বামীর বারটান থাকলে মেয়েরা সর্বাগ্রে তার গন্ধ পায়। তবে রতীশের সম্বন্ধে হিয়ার সে ভয় নেই। মেয়েদের আশেপাশে ঘুরঘুর করা তার স্বভাব নয়। বরং স্ত্রীজাতিকে সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। নইলে বলতে নেই, স্বচ্ছল অবস্থা। টাকা-পয়সা ভালো আয়

করে। তাকে লুকিয়ে রতীশ যদি এই কলকাতায় একটা মেয়েমানুষ পুষত, তাহলে হিয়া নিশ্চয় বেশ কিছুদিন তা টেরও পেত না। আর জানতে পারলেও কী আর করত? প্রথমে খানিকটা চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি। শেষে ভাবত, দূর ছাই! কী হবে কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে? ঘরের মানুষটা তার কাছে খুঁটিতে বাঁধা। যেখানে পারে চরে আসুক। দড়ি ধরে টানলেই সুড়সুড় করে বাছাধনকে ফিরে আসতে হবে।

পরশু রাত্তিরে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, তার জন্য হিয়া নয়—রতীশ নিজেই দায়ী। ছি, ছি! বউকে তার এত সন্দেহ? হিয়া কোনো দিন কল্পনাতেও ভাবে নি। বলা যায় না হয়তো চন্দ্রকান্ত,—মানে ওই দুষ্টু লোকটা স্বামীর কানে কুপরামর্শ দিয়েছে। নইলে রতীশের মগজে এমন কুবুদ্ধি খেলাতে পারে কিছুতেই যেন তার বিশ্বাস হয় না।

ব্যাপারটা যখন জানতে পারল, তখন হিয়া নিজেও কম অবাক হয় নি। নইলে বেশ কিছুদিন ধরেই তো ওই লোকটাকে সে লক্ষ্য করছে। তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ঢ্যাঙা ছোড়া। রোজ দুপুরবেলা হিয়া যখন বাসে ওঠে, তখন ওই লোকটা কোথা থেকে ছুটে এসে বাসের পাদানীতে পা রাখে। প্রথম দিকে হিয়া তেমন গ্রাহ্য করে নি। নিশ্চয় ডিউটিতে কিংবা কোনো কাজে-কর্মে যায়। তার সঙ্গে একই বাসে হঠাৎ দেখা নেহাৎ ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কয়েকদিন যেতেই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল লোকটা তাকে ফলো করছে। শিয়ালদহতে বাস বদল করে অন্য বাসে উঠতেই হিয়া দেখল সেই ছোঁড়াটা বাসের হাতল ধরে ঝুলছে। শুধু তাই? ধর্মতলায় নেমে হিয়া যখন সিনেমার টিকিট কাউন্টারের কাছে দাঁড়াল, তখন মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল হাত দশ-বারো দূরে দাঁড়িয়ে শ্রীমান তার ওপর নজর রাখছে।

প্রথমে সে ভেবেছিল ছেলেটা এমনি তাকে ফলো করে। হয়তো তার মোহে, মনে মনে তাকে ভালবেসেছে। ছেলেটা জানে দুপুরবেলা হিয়া একা বেরিয়ে পড়ে। সেই আশায় আশায় তার পিছনে ঘুরছে। যদি কোনোদিন কথা বলার সুযোগ পায়।

শেষ পর্যন্ত হিয়ার মাথায় একদিন দুর্মতি চাপল। এ কি বিশ্রী ব্যাপার! জানা নেই শোনা নেই, কোথাকার একটা ছোঁড়া ছায়ার মতো রোজ তাকে ফলো করছে? এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মতলায় নেমে হিয়া তাই একদিন দাঁড়াল না। সোজা হাঁটতে লাগল। টাইগার সিনেমা ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর গিয়ে সে কীড্ স্ট্রীটে ঢুকল। আড়চোখে পিছনে তাকিয়ে দেখল অন্যান্য দিনের মতো মূর্তিমান ঠিক তাকে অনুসরণ করছে। ছেলেটাকে আজ

জব্দ করবে ভেবে হিয়া তার চলার স্পীড হঠাৎ কমিয়ে দিল। তারপর বাঁয়ে গলির ভিতর ঢুকে একটা দোকানের আড়ালে প্রায় আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

ছেলেটা এগিয়ে এলো। গলির ভিতর ঢুকে হিয়াকে না দেখতে পেয়ে সে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই কখনও হতে পারে? গলির ভিতর গিয়ে জলজ্যান্ত একটা মেয়ে কর্পূরের মতো উবে যাবে? তার দৃষ্টি সর্বত্র হিয়াকে সন্ধান করে ফিরছিল।

ঠিক সেই মূহূর্তে হিংস্র বাঘিনীর মতো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হিয়া তার মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'কি মতলব বলুন তো আপনার? রোজ একটা মেয়ের পিছু নিতে লজ্জা করে না?'

ছেলেটা এমন অতর্কিত আক্রমণের কথা চিন্তাও করে নি। কোনো জবাব না দিয়ে সে শুধু একটা ঢোক গিলল।

হিয়া ফের চোখ পাকিয়ে বলল,—'কী নাম আপনার? বাড়ি কোথায়? কী মতলব চটপট বলে ফেলুন। নইলে কিন্তু চিৎকার করে লোকজন ডেকে আপনাকে পুলিশের হাতে দেব।'

পুলিশের নাম শুনে ছোকরা একেবারে মিইয়ে গেল। মুখখানা শুকিয়ে আমসী; হিয়ার দুই চোখে আগুন। একটা কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটেছে তা যে কেউ বুঝতে পারবে। কলকাতার পথেঘাটে কৌতূহলী মানুষের অভাব নেই। দু-একজন লোক কিছু একটা সন্দেহ করে এদিকে আসছে। পুলিশে না দিলেও এদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে অবস্থাটা যে কী দাঁড়াবে সেই কথা চিন্তা করে ছোকরা ফের শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল,—'সব কথা স্বীকার করব। কিন্তু দয়া করে আপনি বড় রাস্তায় চলুন দিদি।'

দিদি? সম্বোধনটা শুনে হিয়ার কেমন খটকা লাগল। তাহলে এতদিন সে যা ভেবেছে তা ঠিক নয়? কিন্তু তাহলে কী মতলব এই ছেলেটার? একমাস ধরে, কেন তাকে ফলো করছে? তবে নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। ওর মুখ থেকে সেটুকু শোনার জন্য হিয়া রীতিমত ব্যগ্র হ'ল।

বড় রাস্তা নয়। কীড স্ট্রীট ধরে আরো অনেকদূর হেঁটে ছেলেটা দাঁড়াল। এক নিঃশ্বাসে বলল,—'আমার নাম অধীর—অধীর দত্ত। আজ প্রায় একমাস ধরে আপনার পিছনে স্পাইয়ের কাজ করছি।'

স্পাই? হিয়া আকাশ থেকে পড়ল। স্পাই মানে তো গুপ্তচর। কিন্তু তার পিছনে স্পাই কেন?

ছেলেটি নিজেই বলল,—'বেকার ছেলে দিদি। আজ তিন-চার বছর বহু চেষ্টা করেও কোথাও একটা পার্ট-টাইম কাজ জোটাতে পারি নি। শেষে

আপনার স্বামী মানে রতীশবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করি। অত বড় ট্রান্স-পোর্টের ব্যবসা, যা হোক একটা চাকরি যদি জোটে। তা সব কথা শুনে আপাতত, এক মাসেব জন্য উনি এই কাজে লাগিয়ে দিলেন।'

হিয়া চমকে উঠল। ছেলেটা বলে কী? রতীশ অর্থাৎ তার স্বামীর এই কাণ্ড? স্ত্রীর ওপর এত সন্দেহ আর অবিশ্বাস। তাই এই ছেলেটাকে বউয়ের গতিবিধির ওপর নজরদারি করতে রেখেছে? ছি-ছি! এতক্ষণ ছোঁড়াটার ওপর সে কত হম্বিতম্বি করছিল। কিন্তু এই কথা শোনার পর হিয়া নিজেই কেমন দুর্বল, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। স্বামী যে তাকে সন্দেহ করে, এই অবিশ্বাসের কথা তাহলে ওই ছেলেটাও জেনেছে?

ছোকরা নিজেই বলল,—'বিশ্বাস করুন দিদি। রোজ আপনাকে এমনি-ভাবে ফলো করতে খুব খারাপ লাগত। মাঝে মাঝে ভাবতাম, ধুত্তোর কাজ! বরং ঘরে ফিরে যাই। এমন রোজগারের চেয়ে উপোস করে মরা ভালো। কিন্তু মুখে তড়পানো যত সহজ, হাতে-কলমে করা তার থেকে সহস্রগুণ শক্ত। আর পেটেব জ্বালার চেয়ে বড় যন্ত্রণা বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। তাই দশটা টাকার জন্যে রোজ বেলা দেড়টা-দুটো থেকে রাত্তির আটটা নটা পর্যন্ত আপনার পিছনে ঘুরতাম। কোনোদিন সিনেমা হলে ঢুকলে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছি। শেষে শিয়ালদ'তে এসে আপনি বাসে উঠলে নিজের ঘরে ফিরে গেছি।'

হিয়া ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে শুধোল,—'কী দেখলে নিশ্চয় তার রিপোর্ট রোজ দিতে হ'ত?

রিপোর্ট? কথাটা শুনে ছোকরা দাঁত বের করে হাসল। বলল,—হ্যাঁ, একরকম রিপোর্ট বৈকি। সকাল দশটার মধ্যে রতীশবাবুর অফিসে দেখা করতাম। আমাকে দেখলেই উনি বাইরে বেরিয়ে এসে কথা বলতেন। খুঁটিনাটি প্রশ্ন, মাঝে মাঝে আমার মুখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করতেন,—'তুমি ঠিক ফলো করেছিলে তো? শেষে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আপনি কী রঙের শাড়ি পরে বেরিয়েছিলেন তা জানতে চাইতেন।

ছেলেটা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। যাবার সময় দুঃখ করে বলল,—'একমাস পরে রতীশবাবু আমাকে একটা কাজ দেবেন বলেছিলেন। কপালে নেই, তা চাকরি কেমন করে হবে দিদি?'

রাগ নয়, শেষ পর্যন্ত ছেলেটার জন্যে হিয়ার বরং সহানুভূতি হয়েছিল। বেচারা! একটা কাজের আশায় আজ পনের-ষোল দিন ধরে পরের বউয়ের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করছে। রোজ দশটা টাকা পাবে বলে তার পিছনে

স্পাইয়ের কাজ করেছে। তাই হিয়া ওকে পুলিশে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রতীশ যদি সত্যি ওকে একটা চাকরি দেয়, তাহলে হিয়া যে কী খুশি হবে তা কাউকে বোঝাতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্ম হিয়া তৈরি হয়েছিল। রতীশ ফিরল রাত্তির নটা নাগাদ। অন্তদিনের মতো কাপড়জামা ছাড়ল। তার সঙ্গে দু-একটা ছুটকো কথা বলল। তারপর বাথরুমে ঢুকল। কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে রাত্তিরে স্নান করা রতীশের বহুদিনের অভ্যেস। শীত-গ্রীষ্ম বলে কোনো বাছবিচার নেই। খুব ঠাণ্ডা পড়লে কখনও একটু গরম জল চেয়ে নেয়। কিন্তু রাত্তিরে একবার স্নান না করলে দেহের ক্লেদ যেন থেকে যায়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রতীশ জামা-কাপড় ছাড়ল। মাথার চুলে চিরুণী বুলোল, গায়ে পাউডার ঘষল। তারপর কোণের ঘরে গিয়ে আলমারির দরজা টানল। হিয়া বুঝতে পারল এবার সে মদের বোতল নিয়ে বসবে। রোজ তাই চলে। মনমর্জি ভালো থাকলে রতীশ অল্প খায়, তেমন নেশা করে না। জায়গা করে হিয়া খেতে ডাকলে মদের বোতল ফেলে পোষা জানোয়ারের মতো আসনে এসে বসে। পছন্দমত খাবার মুখে তোলে। ভালো লাগলে একটু চেয়ে নেয়। খেতে খেতে কোনোদিন অনর্গল কথা বলে, আবার কোনোদিন চুপচাপ উঠে যায়।

মেজাজ ভালো না থাকলে রতীশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ঢক ঢক করে মদ খায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নেশায় মেতে মাতাল হয়ে পড়ে। তারপর টলতে টলতে ওঠে, বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে অর্থহীন বকে। পথচারী কাউকে লক্ষ্য করে ছুটো মন্তব্য ছাড়ে। তেমন লোক হ'লে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিটকারি দিয়ে যায়। কখনও স্ত্রীর সঙ্গে অকারণ বাদানুবাদ সৃষ্টি করে হিয়ার চরিত্র নিয়ে অন্যায় কটাক্ষ করতে তার বাধে না। মাঝে মাঝে এমন চেঁচামেচি শুরু করে যে রাস্তায় লোক জড়ো হয়, মজা ভাখে। তিতিবিরক্ত হয়ে টানতে টানতে হিয়া তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। ভারী একটা বস্তার মতো বেসামাল মানুষটাকে খাটের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সমস্ত রাত্তির আর দরজা খোলে না।

পরশু রতীশের মনমেজাজ বোধহয় ভাল ছিল না। নিশ্চয় একটা গণ্ডগোল মাথায় নিয়ে ফিরেছে। আড়াল থেকে হিয়া লক্ষ্য করল একটা বোতলের প্রায় অর্ধেকটা সে ইতিমধ্যেই সাবাড় করে ফেলেছে। পাশে আর একটা বোতল আছে। এটা শেষ হলেই অন্তটা নিয়ে পড়বে। ইদানীং রতীশ দিশী মদের দিকে ঝুঁকেছে। বিলিতী মদ যাকে করেন লিকার বলে, আগে তাই খেত। ছোট

চ্যাপ্টা শিশিতে মদ, গ্লাসে ঢেলে তাতে সোডা আর বরফের কুচি মিশিয়ে তারিয়ে তারিয়ে টানত। কিন্তু বছর খানেক হ'ল রতীশের নেশার ঝোঁকটা যেন বদলে গেছে। এখন তো প্রায়ই দিশী মদের বোতল নিয়ে বাড়ি ফেরে। আলমারিতে তুলে রাখে। বিলিতী মদও আছে। কিন্তু রতীশের যেন তার প্রতি আকর্ষণ কম। এই তো কিছুদিন আগে কোথা থেকে একটা মহুয়ার বোতল জোগাড় করে এনেছিল। তাই খেয়ে যা মাতলামি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ওই বোতলটাকে হিয়া টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। আসলে এ হ'ল একটা প্রবৃত্তি। ফর্সা, সুন্দরী পটের বিবি বউ ফেলে পুরুষ মানুষের যেমন নিম্নশ্রেণীর স্বাস্থ্যবতী, কৃষ্ণকায় নারীতে বাসনা হয়,—এও প্রায় তেমনি।

মদের বোতলটা শেষ। নেশা জমে উঠেছে। রতীশ হাত বাড়িয়ে অন্য বোতলটা নিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে হিয়া এসে এক ঝটকায় বোতলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল।

জড়িত কণ্ঠে রতীশ বলল,—'এ কি ঢঙ শুরু করলে মাইরি। বোতলটা দিয়ে যাও।'

'না'। হিয়া দৃঢ়কণ্ঠে জানাল,—'তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও।'

—'জবাব?' রতীশ চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। নেশার ঝোঁকে অহেতুক খানিকটা হেসে বলল,—'শুধু একটা কেন তোমার দশটা কথার জবাব দিতে রাজি।'

হিয়া আগের মতো দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আপাতত একটা কথার জবাব পেলেই চলবে।'

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কেমন বেসুরো। নেশার ঘোরটা কেটে যাচ্ছে। কী একটা শক্ত কথা বউয়ের জিভের তলায় যেন লুকোন আছে। ভণিতা শেষ হলেই সেটা ছুঁড়ে মারবে। তাহলেই এমন সুন্দর নেশার বরবাদ। বিরক্ত হয়ে তাই সে বলল,—'মারো গুলি। নেশার সময় মেলা ক্যাচ ক্যাচ ক'র না তো। কথা-বার্তা সব সকালে হবে।'

হিয়া কণ্ঠস্বর আরো শক্ত করে বলল,—'সকালে নয়, আমার কথার এখুনি জবাব চাই।'

অগত্যা রতীশ চোখ তুলে তাকাল। জবাব না দিলে বোতলটা যে উদ্ধার হবে না, তা বুঝতে পেরেই বোধহয় সে কিঞ্চিৎ নরম হতে চেষ্টা করল।

শক্ত কথাটা হিয়া এবার উল্কিটের মতো নিক্ষেপ করল। বলল,—'বউয়ের পিছনে একজন স্পাই লাগিয়েছ কেন?'

—'স্পাই ?' যতীশ ভ্রূ কুঁচকে কয়েকটা কথা বিড়বিড় করল। স্ত্রীকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে বলল,—'বাজে কথা।'

—'বাজে কথা ?' হিয়া তার তূণের তাসখানা এবার টেনে বের করল। বলল,—'একটা বেকার ছেলেকে চাকরির লোভ দেখিয়ে আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করিয়েছ। সেটা অস্বীকার করতে তোমার লজ্জা করে না ?'

নেশাটা ফিকে হয়ে এসেছে। যতীশ তাই সোজা হয়ে বসল। বলল,— এসব কথা তোমায় কে বলেছে ?'

—'কেন ? তোমার সেই অধীর সরকার। আজ তাকে হাতেনাতে ধরেছিলাম যে। বেচারী ! পুলিশে দেব বলতেই ভয়ে সব স্বীকার করে ফেলেছে।' এক মুহূর্ত থামল সে। কেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যতীশের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'কই, আমার কথার উত্তর দিলে না ? বউয়ের পিছনে স্পাই লাগিয়েছ কেন ?'

—'এমনি।' যতীশ আলগোছে জবাব দিল, খানিক পরে বলল,—'তুমি কোথায় যাও, কী কর—সেটা জানতে ইচ্ছে হয়েছিল তাই।'

—'স্ত্রীকে নিশ্চয় সন্দেহ কর ?' হিয়া ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল। ফের বলল, —'তোমার বোধহয় ধারণা রোজ বাইরে গিয়ে আমি কারো সঙ্গে কষ্টিনষ্টি করে আসি ?'

যতীশ অপাঙ্গে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল,—'ধারণাটা শুধু আমার নয়, আরো পাঁচজনের। তোমার স্বভাব চরিত্র নিয়ে অনেক কথা আমার কানে আসে।'

—'তাই নাকি ?' হিয়া ব্যঙ্গ করে বলল,—'সেই জন্যই বোধহয় ওই ছোকরাকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলে ?'

—'হ্যাঁ।' যতীশ চেঁচিয়ে উত্তর দিল। বলল,—'রোজ দুপুরে অমন সাজ-গোজের ঘটা করে তুমি কোথায় যাও ? আটটা-নটা অব্দি বাইরে থাক। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ ?'

—'যাই, বেশ করি।' হিয়া সদম্ভে জবাব দিল। বলল,—'সমস্ত দিন একা ঘরে মুখ বুজে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই একটু নিশ্বাস নিতে বেরিয়ে পড়ি। সেটুকুও তোমার সহ্য হয় না ?'

—'নিশ্বাস নিতে ?' যতীশ বাঁ চোখটা টিপে প্রায় কদর্য ইঙ্গিত করে বলল, —'কিসের টানে ঘরের বউ বাইরে যায়, তা জানতে বাকি নেই।'

স্বামীর কথা শুনে হিয়া যেন ক্ষেপে উঠল। এগিয়ে এসে যতীশকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'কিসের টানে ? চুপ, থামলে কেন ? জবাব দাও... ।'

রতীশ মুখখানা বিকৃত করে বলল,—'সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? ধর্মতলার সিনেমাপাড়ায় তোমার লীলেখেলা অনেকে স্বচক্ষে দেখেছে।'

—'মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা।' উত্তেজনায় হিয়া থরথর করে কাঁপছিল। স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুড়ে সে বলল,—'ঘরের বউ বাইরে গেলেই দোষ? লীলেখেলা, তাই না? কিন্তু ঘরের বউকে বাইরে যাবার রাস্তাটা প্রথমে কে চিনিয়েছিল? সে কথা মনে নেই?'

রতীশ নির্বাক। কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

সেই মুহূর্তে হিয়া একটা কাণ্ড করল। আচমকা স্বামীকে সজোরে ধাক্কা দিতেই সে গোড়া কাটা গাছের মতো মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বাথরুমে জল ভর্তি একটা বালতি থাকে। দ্রুত পায়ে গিয়ে সেটা তুলে এনে হুড়মুড় করে রতীশের গায়ে ঢেলে দিল।

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে হিয়া সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে দাঁড়াল। সামনেই মহম্মদ আলী পার্ক। বিকেলে বোধহয় এখানে একটা সভা-টভা হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে। ইচ্ছে করেই হিয়া আর ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করল না। দমদমে গিয়ে রতীশের সঙ্গে দেখা করতে তার বয়ে গেছে। কোনো প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বৌবাজার স্ট্রীট। ট্রাম কিংবা সরকারী বাস ধরে শিয়ালদ যাবে। সেখান থেকে বাড়ি পৌঁছতে বড় জোর মিনিট কুড়ি লাগতে পারে।

খানিকটা যেতেই বিজয়ের সঙ্গে দেখা। বিজয় ঘোষ,—এক সময় রতীশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তখন তাদের বাড়িতে হপ্তায় দু-তিন দিন আসত। প্রায় বছর দশ হতে চলল দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অনেকদিন তাদের বাড়ি আসেনি। বজবজের কাছে কোথায় থাকে যেন। রতীশ একবার বলেছিল, বিজয় নাকি এখন একটা জুট মিলে ভালো চাকরি করে।

তাকে দেখে বিজয় খুব অবাক হয়ে বলল,—'আরে বৌদি, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

রতীশের চেয়ে বছর চার-পাঁচ ছোট। সেই হিসেবে বিজয় তাকে বৌদি বলে ডাকে। হিয়া মুচকি হেসে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলল,—'তবু ভালো, চিনতে পেরেছেন।'

বিজয় কপট রাগ দেখাল, 'চিনতে পারব না মানে? কী যা-তা বলছেন?'

হিয়া মৃদু হাসল। বলল,—'তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে আপনার বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে কী ঝামেলা হয়েছে। তাই প্লেন ধরতে উনি এই

মাত্র দমদম চলে গেলেন। এখন একাই বাড়ি ফিরছি।'

বিজয় বলল,—'আপনাকে দেখে সে কথা মনে হচ্ছে বৌদি। যেন হাতে কাজ নেই, অথচ অবসর।'

হিয়া অপাঙ্গে একবার বিজয়কে দেখল। রতীশের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুদর্শন। কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। দোহারা গড়ন, মিষ্টি ব্যবহার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দেখলে তিরিশ-বত্রিশের বেশী বয়স মনে হয় না। একটা কথা ভাবলে এখনও তার খুব অবাক লাগে। এই বিজয়ের সঙ্গে একদিন কলকাতা শহরটা চষে বেড়িয়েছে হিয়া। সত্যি বলতে মহানগরীর চৌরঙ্গীপাড়া, গঙ্গার তীর, গড়িয়াহাট, কত সিনেমা-থিয়েটার, সব তাকে বিজয় চিনিয়েছে। তাই বলে স্বামীকে লুকিয়ে কোনোদিন সে বিজয়ের সঙ্গে বেরোয়নি। আশ্চর্য মানুষ রতীশ! সগুপরিণীতা স্ত্রীকে নানা অছিলায় নিজেই বন্ধুর সঙ্গে সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের বছর দুই পরে হঠাৎ একদিন এর কার্যকারণ তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিজয়কে দেখে হিয়ার আবার সেই আগের মতো একসঙ্গে সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করল। এই কলকাতা শহরে একদিন দুজনে কত বেড়িয়েছে। বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রতীশ তাকে খুব জব্দ করবে ভেবেছে? হুঁ, হিয়াও তার জবাব দিতে জানে। রতীশ নাই বা থাকল, বিজয়কে নিয়ে হিয়া এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াবে। কারো রাগ-রোষের সে তোয়াক্কা করে চলে না।

আড়চোখে বিজয়ের মুখের ওপর এক নজর বুলিয়ে হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'সাতসকালে কলকাতায় কেন? কিছু কাজ ছিল?'

—'হ্যাঁ, কোম্পানীর হেড অফিসে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম। তা যার সঙ্গে কথা বলতে হবে, সেই ভদ্রলোক আজ ছুটিতে। ফালতু আসা, —একটা হতাশ ভঙ্গি করে বিজয় তার মুখের দিকে তাকাল। ফের বলল,—'অবশ্য লাভের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা।'

—'তাহলে সবটা লোকসান নয়, লাভও আছে।' হিয়া পরিহাস করল। পরে জিজ্ঞাসা করল,—'এখন বুঝি বজবজে ফিরে যাবেন?'

—'হ্যাঁ, আজ তো অফ-ডে আমার। কোনো কাজ নেই।' বিজয় এক নিশ্বাসে কথা শেষ করল। ফের মুচকি হেসে বলল—'রতীশ বাড়ি থাকলে না হয় আপনার সঙ্গে যেতাম।'

এটা অছিলা, না অভিপ্রায়? নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে হিয়া যেন নিজেকে প্রশ্ন করল। হেসে বলল,—'বন্ধু বাড়িতে নেই তো কী হয়েছে? চলুন

আমার সঙ্গে।' ফের সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করে বলল,—'অবশ্য আপনার যদি ঘোরতর আপত্তি না থাকে।'

—'আপত্তি? না, আপত্তি কিসের?' বিজয় নিমরাজী মনে হ'ল। ফের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'তবে এই অসময়ে আপনাকে আবার ঝামেলায় ফেলা।'

—'ঝামেলা কিসের?' হিয়া এক নজর তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। বলল,—'বুঝেছি, আপনার জন্তে আবার আহারের ব্যবস্থা করতে হবে, তাই? তা সেজন্ত চিন্তা নেই। বাড়িতে লোক আছে। রান্নাবান্না সেই করবে।'

বিজয় বলল, 'তাহলে চলুন। আপনাদের বেলেঘাটার বাড়িতে তো কোনোদিন যাই নি। এই সুযোগে না হয় একবার ঘুরে আসি।'

হিয়া হাসল। একটু আগে সে যা ভাবছিল, এখন নিশ্চয় তা বলা যেতে পারে। আড়চোখে বিজয়ের মুখভাবটা একবার লক্ষ্য করে সে বলল,—'আমার কিন্তু একটা প্রস্তাব আছে।'

—'প্রস্তাব?'

—'হ্যাঁ, অবশ্য সেটা আপনার ইচ্ছের ওপর। যদি সময় থাকে, তবেই...।'

—'কী প্রস্তাব বলুন তো? অত ভণিতা কিসের?' বিজয় শান্তরে তাকাল।

—'আজ ইভনিং শোতে দুজনে একটা সিনেমা দেখব, সেই আগের মত।' হিয়া সলজ্জ হাসল। অতীত স্মৃতির জের টেনে ফের জানাল,—'কত ছবি তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।'

বিজয় এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ঈষৎ সঙ্কোচের সুরে বলল,—'ইভনিং শোতে ছবি দেখে বজবজে ফিরতে অসুবিধে নেই। তবে আমি ভাবছি যতীশ কী মনে করবে। জানতে পারলে একটা ভুল বোঝাবুঝি...।'

তার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হিয়া জবাব দিল,—'উঃ! বন্ধুকে এত ভয় আপনার? আচ্ছা, সে তো রইল শিলিগুড়িতে। কলকাতায় কার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেলাম, তা কী হাত গুনে টের পাবে?' মাটির দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হাসল। তেমনি মুখ নিচু করে বলল,—'ভুলে যান কেন, একদিন সেই আমাকে জোর করে আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছে।'

বিজয় চুপ করে রইল। হিয়ার অভিযোগের কোনো জবাব নেই। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজে কতবার বন্ধুকে সে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যতীশ একটা অদ্ভুত চরিত্র। সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী হিয়াকে দেখে এক সময় তার মনেও যে দুর্বলতা জাগে নি তা নয়। কিন্তু বিজয় তার ইঙ্গিত

রিপুর কাছে কোনোদিন পরাভব স্বীকার করেনি। দুর্বলতা প্রকাশ করলে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা যে কেউ অনুমান করতে পারে।

দুপুরে আহারের পার্ট চুকতে বেলা দেড়টা বাজল। বিজয়ের খাওয়া আগেই শেষ হয়েছিল। হিয়া স্বহস্তে তার বিশ্রামের আয়োজন করল। যে খাটে রতীশ ঘুমোয়, তার ওপর একটা সুন্দর ফুল তোলা চাদর বিছিয়ে দিল। মাথার বালিশটাকে ঠিক জায়গায় রাখল। ওপরে একটা হলুদ রঙের ছোট তোয়ালে পেতে দিয়ে বিজয়কে বলল,—'নিন, এবার শুয়ে পড়ুন। ঠিক সময়ে আপনাকে ডাকব।'

বিজয় হেসে জবাব দিল;—'যা ভুরিভোজ হ'ল। বেলা পাঁচটার আগে ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না।'

—'পাঁচটা ?' হিয়া যেন আঁতকে উঠল। 'আপনি সব মাটি করবেন দেখছি। তিনটের আগে তো বেরুতেই হবে।'

—'ইভনিং শো সাড়ে পাঁচটায়। বিজয় প্রায় তর্ক করল। অত আগে বেরিয়ে কী করবেন ?'

—'বারে! আমি বুঝি শুধু সিনেমা দেখব বলেই আপনার সঙ্গে বেরুতে চাইছি ?' হিয়ার কণ্ঠে ঠিক অভিমান নয়, বরং পুরোন ব্যথার মতো অনেক-দিনের একটা লুকানো বেদনা ফুটে উঠল।'

বিজয় বলল,—'সিনেমা দেখার আগে অন্য কোথাও যাবেন বুঝি ?'

—'আপনি সব ভুলে গিয়েছেন দেখছি।' হিয়া মুচকি হাসল। বলল,—'চৌরঙ্গীপাড়ায় ছবি দেখার আগে একবার নিউমার্কেটে যেতাম মনে নেই ? একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে দুজনে চা খেয়েছি।'

অনেকদিন আগের কথা। তা দশ-বারো বছর তো হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল বিজয়। বকের মতো আলতো পা ফেলে সেই দিনগুলোর নরম মাটিতে চক্কর দিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত এই ছবি দেখা নিয়েই রতীশ একদিন তাকে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে বসল। কী একটা কথার মাঝখানে ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলল,—'আমার বউকে নিয়ে দিব্যি মজা লুটছিস। সিনেমা যাওয়ার নাম করে কোথায় নিয়ে যাস কে জানে ?'

শুনে বিজয় ক্ষেপে উঠেছিল। 'ছি, ছি! এত নোংরা মন তোর ? তাছাড়া আমি কোনোদিন ওকে নিয়ে বেরুতে চাইনি। বরং ঘর থেকে বউকে সরানোর দরকার ছিল বলেই আমার সঙ্গে ওকে সিনেমা-থিয়েটারে পাঠিয়ে দিয়েছিস।'

অবশ্য তারপর সেই প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। রতীশ ট্রান্সপোর্টের

ব্যবসা ধরল। আগের ওই সব ছুটকো কাজ-কারবারে আর নিজেকে জড়ায় নি। কিন্তু ব্যাপারটা বিজয় এবং আরো দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানত। কিছুদিন পরে হিয়াও জানতে পেরেছিল। কিন্তু তার আগে রতীশের নাড়ি-নক্ষত্র, আচার-ব্যবহার, ধরনধারন উল্টেপাল্টে বারবার দেখা করতলের রেখার মতো তার কাছে সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেছে।

পাশের ঘরে তার নিজের খাটে শুয়ে হিয়াও সেই দিনগুলির কথা ভাবছিল। চতুষ্পদ এক প্রাণীর অলস জাবর কাটার মতো স্মৃতি রোমন্থন। আগাগোড়া রতীশের সমস্ত জীবনটা না জানলে তাকে বিচার করা খুব শক্ত। এই বিয়েটা তার এক মামা যোগাযোগ করেছিল। রতীশের কোন এক বন্ধুর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল। সম্বন্ধের খবরটা দিদিকে জানিয়ে মামা বলেছিল,—'ছেলেটা অনেক টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছে। এবার বিয়ে-থা করে ঘর-সংসারী হতে চায়। এখানেই ব্যবসা-ট্যবসা ধরে থিতু হয়ে বসবে।'

তবু তার মা জিজ্ঞাসা করেছিল,—'হ্যাঁ ভাই, তা ছেলের স্বভাব-চরিত্তির, মন-মর্জি কেমন তার তো একটু খোঁজখবর নিতে হয়।'

—'সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি।' তার মামা রতীশের সম্বন্ধে প্রায় ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিল। বলল,—'ওর বন্ধুদের কাছে আমি খোঁজখবর নিইনি ভেবেছ? তুমি যা সন্দেহ করছ বরং তার উল্টো। ছেলেটা নাকি মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। তবে ' হিয়ার মামা কী যেন বলতে গিয়ে ফের চোখ তুলে তাকাল।

তার মা ব্যগ্রতা করল,—'থামলে কেন? যা বলছিলে শেষ কর।'

মামা বলল,—'তেমন কিছু নয়। আর এই সামান্য বিষয় নিয়ে যদি খুঁতখুঁত কর, তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।'

ভাই কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তার মা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মামা অবশ্য তখুনি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে জানাল। রতীশের একটু পান-দোষ আছে। তা আজকালকার দিনে ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কে আর ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বলতে পার? মাঝে মাঝে অমন এক-আধ ঢোক সকলেরই চলে। আজকাল শুনি মদের বোতল ভিন্ন পার্টি-পিকনিকের কথা কেউ ভাবতেই পারে না।'

তার মা তবু বলেছিল,—'একটু ভালো করে খোঁজখবর নিও। শেষ পর্যন্ত কেউ না বলে যে হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছি।'

শুনে মামা হাসল। বলল,—'দেখবে, মেয়ে তোমার রাজরানীর মতো থাকবে। আমি পাকা খবর পেয়েছি। বিদেশ থেকে রতীশ প্রায় লাখখানেক

টাকা রোজগার করে এনেছে।'

—'লাখ টাকা ?' তার মা বিস্ময়ে চোখ দুটি বড়ো করে বলল,—'এত অল্প বয়সে…'

—'তবে আর বলছিলাম কী…', তার মামা কথার রঙে সোনালী ভবিষ্যতের ছবি আঁকল। কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে বলল,—'ধর, যদি ওর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তোমার হিমারানী কলকাতার রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াবে।'

মামা অবশ্য মিথ্যে বলেনি। সেই মরুভূমির দেশ থেকে রতীশ অনেক টাকা রোজগার করে এনেছিল। শিলচরের ছেলে। আঠারো বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসে। আই. এ. পাশ। বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। তার মা মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করে। এই পক্ষের চারটি ছেলেমেয়ে। সেই মা কোনোদিন তাকে সুনজরে দেখেনি। স্নেহ-ভালোবাসা দূরে থাক, ছেলেবেলায় রতীশকে গালমন্দ ছাড়া কথা বলত না। রাগ হ'লে প্রচণ্ড মারধোর করত। আড়ালে দাঁড়িয়ে সৎ ভাইবোনেরা তার দুরবস্থা দেখে হাসত। মাঝে মাঝে রতীশের বাবা যে দ্বিতীয় পক্ষের বউকে বোঝাতে চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু দজ্জাল স্ত্রীকে আয়ত্বে রাখা তার সাধ্যের বাইরে ছিল। কিছু বলতে গেলে উল্টে সেই তাকে ধমক দিত,—'এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। এটা বোঝার মতো বুদ্ধি নিশ্চয় তোমার আছে।'

তার বাবার অবস্থা কিন্তু খারাপ ছিল না। ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ছোট-খাটো একটা সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। কিন্তু ওই,—সংসারে রতীশকে নিয়ে নানা অশান্তি। ক্রমেই সেটা এমন বাড়ছিল যে তিতিবিরক্ত হয়ে সে একদিন কলকাতায় পালিয়ে এলো। পকেটে শ'খানেক টাকা,—এই পুঁজি। প্রথমে শেয়ালদার কাছে এক হোটেলে উঠেছিল। দিন দশ-বারো না যেতেই একটা টিউশানী পেয়ে জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির হঠাৎ অবলম্বন আশ্রয় করার মতো সে বেঁচে গেল। দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে সকাল-সন্ধে পড়াতে হবে,—বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ফ্রি। গোলদীঘির কাছে মস্ত বাড়ি। এককালের বনেদী পরিবার। নিচের একটা ঘরে রতীশের থাকার জায়গা হ'লো। খুব রক্ষে। টিউশানীটা না পেলে ওই ক'টা টাকায় আর ক'দিন চলত ? তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাকে ফের শিলচরে সেই বিমাতার আশ্রয়ে ফিরে যেতে হ'ত।

সমস্ত দুপুর-বিকেল রতীশ শহরটা চষে বেড়াত। পায়ে হেঁটে একদিন সে গড়িয়াহাট পর্যন্ত চক্কর দিয়ে এলো। ময়দান পেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়াতে খুব ভালো লাগত। ওপারে সূর্য অস্তমান। আউটরাম ঘাটে সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে। কখনও নিজের মনে অলস স্বপ্ন রচনা করত। যেন এমনি

একটা জাহাজের সে যাত্রী। মহাসাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে কোন এক অজানা দেশের দিকে চলেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! দিন কয়েক না যেতেই অপ্রত্যাশিতভাবে সেই স্বপ্নটা তার জীবনে বাস্তব রূপ নিল।

সুযোগ যখন আসে, যোগাযোগ তখন আপনি হয়। গঙ্গার ধারে এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়। তার অবস্থার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'চাকরি নিয়ে আবুধাবি যেতে পারবে?'

আবুধাবি? জায়গাটার নামই রতীশ এর আগে কখনও শোনে নি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—'ওটা আরব দেশ। আমাদের কোম্পানী সেখানে অনেক কনস্ট্রাকশনের কাজ করছে। তুমি চাকরি নিয়ে যেতে চাইলে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

রতীশ রাজি হয়ে গেল। কী আছে তার এদেশে? শিলচরের সঙ্গে সম্পর্ক তো কবে ছেদ হয়ে গেছে। নইলে কতদিন হয়ে গেল সে কলকাতায় এসেছে। তার বাবা, বিমাতা, সৎ ভাইবোন কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত নেয় নি। শিলচরের বাড়িতে কোনোদিন সে ফিরে যাবে না। আর এই মহানগরীতে একটা চিত্তশালী শহর,—পদ্ম-পত্রে নীরের মতো সেটা যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝতে রতীশের বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি।

আবুধাবিতে একটানা চোদ্দ বছর। একবারও সে ঘরে ফেরার নাম করেনি। কিন্তু মরুভূমির মাটিতে দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে রতীশ যে এক বহুমূল্য বস্তুকে হারিয়ে এসেছে তা বোধহয় সে নিজেও জানত না।

বিয়ের কয়েকদিন বাদে হিয়া প্রথম তা জানতে পারল। তালতলায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ি নিয়েছিল তারা। ঘরদোর মনের মতো করে সাজিয়ে হিয়া সংসার পাতল। শোবার ঘরে একটা ডবল-বেড খাট। দুজনের পাশাপাশি শয্যা। তবু দিন চার-পাঁচ পরে কোথা থেকে একটা ফোল্ডিং কট্ এনে রতীশ ঘরের একপাশে রাখল।

—'ওটা আবার আনলে কেন?' হিয়া খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। ফের পরিহাস করে বলল,—'বেডরুমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ বলেই তো শুনেছি।'

রতীশ মুখ না তুলে জবাব দিল,—'কদিন ধরে ভালো ঘুম হচ্ছে না।'

হিয়া ভ্রূ কোঁচকাল,—'তার জন্যে আলাদা খাট?'

—'হ্যাঁ। কথাটা তোমাকে বলব ভাবছিলাম।' রতীশ সঙ্কোচের সঙ্গে জানাল,—'মানে, এক বিছানায় কারো পাশে শুলে আমার ঘুম আসে না, তাই...।'

শুনে হিয়ার প্রথমে লজ্জা, পরে নিজেকে অপমানিত মনে হ'ল। এ কোন সৃষ্টিছাড়া পুরুষ? এক বিছানায় নতুন বউয়ের পাশে শুলে তার চোখে ঘুম আসে না? তাই সুনিদ্রা হবে বলে একটা সিঙ্গল কট্ কিনে এনেছে।

হিয়ার ইচ্ছে করছিল স্বামীর মুখের ওপর পাল্টা জবাব দেয়। বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে যদি ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাহলে মিছিমিছি একটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনবার কী দরকার ছিল বাপু? সমস্ত রাত্তির ভিতের খাটে শুয়ে কষ্ট করবার কোনো অর্থ হয় না।

পাশের ফ্ল্যাটে রমলাদির কাছে সে গল্প করেছিল। ভদ্রমহিলা বয়সে তার চেয়ে আট-দশ বছরের বড়। হিয়ার মতো অর্বাচীনা নতুন-বৌ নয়। রমলাদি প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। চোখ দুটি বড়ো করে কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'হ্যাঁরে, তোর বর সাধু-সন্নিসি নয় তো?'

—'ওমা! সাধু-সন্নিসি হতে যাবে কেন?' হিয়াকে বেশ সিরিয়াস মনে হ'ল। বলল,—'আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক। শুধু রাত্তিরে আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে না। ওই ছোট খাটটায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোবে।'

ঠোঁট টিপে হাসল রমলাদি। বলল—'এমন পুরুষমানুষের কথা তো এই প্রথম শুনছি। ঘরে চাঁপার কলির মতো বউ থাকতে কেউ অন্য খাটে ঘুমোয়?' এক মুহূর্ত থামল রমলাদি। ফের চোখ ঘুরিয়ে রঙ্গ করে বলল,—'এই তো আমাদের সাত-আট বছর বিয়ে হ'ল, কিন্তু রাত্তিরে কোমর জড়িয়ে না শুলে কর্তার চোখে ঘুমই আসবে না।'

হিয়া নির্বাক, মুখে কথা জোগায় নি। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে ছিল।

কী মনে হতে রমলাদি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করল,—'হ্যাঁরে, তোদের সেক্স হয় না?'

—'তা হবে না কেন?' হিয়া সলজ্জ হাসল। বলল,—'সে যখন ইচ্ছে হয়, তখন কাছে আসে।'

—'এ তো ভারী মজার পুরুষ রে।' বলেই গা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল রমলাদি। ফের হাত ঘুরিয়ে ছড়া কেটে বলল,—

'ইচ্ছে হলে বউকে চাই
কাজ সেরে ফের শুতে যাই।'

সেদিন রমলাদির মুখে ওই মন্তব্য শুনে হিয়ার খারাপ লেগেছিল। অন্যের মুখে স্বামীর নিন্দে শুনতে কার ভালো লাগে? কিন্তু রমলাদি যে মিথ্যে বলেনি, হিয়া তা পরে মর্মে মর্মে টের পেয়েছে। আসলে রতীশ তাই। স্ত্রীর সঙ্গে একটা

প্রয়োজনের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারে নি। কোনোদিন তার মনের দিকে তাকায় নি। বিয়ের পর একটা মেয়ে যে অনেক আশা নিয়ে স্বামীর কাছে আসে এই স্বাভাবিক ইচ্ছের কথা হয়তো তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। হিয়ার মনে হ'ত মানুষটা ঠিক যন্ত্রের মতো, শুধু একটা যান্ত্রিক প্রবৃত্তি নিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বোধহয় এ সেই মরুভূমির দেশে নিঃসঙ্গ চৌদ্দটি বছর বাসের ফল। রতীশের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে মরু দেশের অনার্দ্র শুষ্ক বাতাস নিংড়ে শুষে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

বরং রতীশ যা দিতে পারে নি, বিজয়ের কাছ থেকে হিয়া তাই পেয়েছে। এই মহানগরীতে ওই মানুষটার সঙ্গে সে কত জায়গায় বেড়িয়েছে। সিনেমা-থিয়েটার, নিউ-মার্কেট, রেস্তোরাঁ, গঙ্গার ধার,—এক আধবার দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু সংযমী পুরুষ। কোনোদিন তার দিকে লোভীর মতো হাত বাড়ায় নি। এখন স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ক্রমে ক্রমে বিজয়ের প্রতি তার মনে দুর্বলতার সঞ্চার হয়েছিল। সুদর্শন, কোঁকড়া চুল, ফর্সা রঙ, উজ্জ্বল দুটি চোখ। কিন্তু সব চেয়ে আকর্ষক তার মিষ্টি ব্যবহার। হিয়া উপলব্ধি করত মানুষটা তার মনের দিকে তাকায়। তাকে বোঝার চেষ্টা করে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দেয়। রতীশের মতো শুধু পাওনা-গণ্ডা আদায় করে পালিয়ে যাবে বলে কাছে আসে না। অথচ সত্যি যদি বিজয় তাকে প্রেম জানাত, হিয়ার সাধ্য ছিল না ওই মানুষটাকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

বিজয়ের সঙ্গে রতীশ নিজেই তাকে প্রথম সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছিল। তখন তালতলার ফ্ল্যাটে ছিল তারা। ওই বাড়িতে বিজয়, চন্দ্রকান্ত এবং আরো দু-একজন বন্ধু আসত। ওরা চা খেত, গল্পগুজব করত, মাঝে মাঝে রাত্তিরে দীর্ঘ আড্ডা হলে নেশার বস্তু অর্থাৎ রঙিন পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। তবে বিজয় কোনোদিন বেশী খেত না। মদ খেয়ে প্রায় মাতাল হয়ে যেত চন্দ্রকান্ত আর রতীশ। কতদিন ট্যাক্সি ডেকে বেহুঁশ চন্দ্রকান্তকে গাড়িতে তুলে বিজয় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

বিয়ের মাস দুই পর। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা চার-পাঁচজন লোক এসে হাজির। ঠিক ঘরোয়া মানুষ নয়। কেমন রুক্ষ চেহারা। শ্যেন দৃষ্টি। কথা বলার ঈষৎ কর্কশ ভঙ্গি। ফ্ল্যাটে মাত্র দুখানি ঘর। একটি শোবার, অন্যটি বসবার। রতীশ সেই ঘরে ওদের বসিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

হিয়ার প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল। লোকগুলিকে দেখে তার সুবিধের মনে হয় নি। তার স্বামীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী?

মিনিট তিন-চার পরেই রতীশ দরজা খুলে কের বেরিয়ে এলো। তার মুখের

দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'বিজয় আসেনি ?'

হিয়া মাথা নাড়াল। ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'ওরা কারা ?'

রতীশ মৃদু গলায় বলল,—'বাইরের লোক। কাজে এসেছে।'

ঠিক তখুনি বিজয় এসে ঘরে ঢুকল। রতীশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'টিকিট পেয়েছিস ?'

—'হ্যাঁ। রাস্তায় জ্যাম্, তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

রতীশ এবার তার দিকে ফিরে বলল,—'বিজয় একটা ভালো ছবির টিকিট কেটে এনেছে, তুমি যাও, সিনেমা দেখে এস।'

'তুমিও যাবে তো ?' হিয়া সরল মনে শুধোল।

—'উহুঁ।' রতীশ মাথা নাড়ল। বলল,—'আমি যাই কেমন করে ? এই লোকগুলোর সঙ্গে অন্তত ঘণ্টা দুই দরকারী কথাবার্তা বলতে হবে।'

ভারী অস্বস্তিকর দোটানা। সামনে বিজয় দাঁড়িয়ে। স্বামী নিজেই তাকে বন্ধুর সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে বলছে। অথচ সেটা কতখানি শোভন হবে হিয়া তাই ভেবে পাচ্ছে না। ওরই মধ্যে রতীশকে একটু আড়ালে পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল,—'তুমি সঙ্গে না গেলে কী সেটা ভালো দেখাবে ? তার চেয়ে বরং থাক। বিজয়বাবুকে টিকিট বিক্রি করে দিতে বল।'

রতীশ তাকে বোঝাল, 'কেন মিছিমিছি আপত্তি করছ ? বিজয় বলছিল, হিট পিকচার। তুমি সিনেমা দেখতে ভালোবাস, তাই টিকিট কেটে আনতে বলেছিলাম।'

'—কিন্তু আমি একা বিজয়বাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব ?'

'—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?' রতীশ তাকে উৎসাহ দিল। বলল,'—আমি নেহাৎ কাজে আটকা পড়ে গেছি তাই যেতে পারছি না।'

রাগ কিংবা অভিমান নয়। বরং স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছিল। না, মানুষটাকে তার প্রতি যতখানি উদাসীন ভাবে, আসলে তা নয়। এই তো হিয়া সিনেমা দেখতে ভালোবাসে বলে বিজয়কে টিকিট কেটে আনতে বলেছিল। হঠাৎ বাড়িতে লোক এসেছে। তাই সে যেতে পারছে না। তবু স্ত্রীকে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা হলে পাঠানোর মতো উদারতা ক'জন পুরুষের থাকে ?

সেই শুরু। তারপর থেকে ওই লোকগুলো যখন আসত, বিজয় তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেছে। কখনও সিনেমা, কখনও থিয়েটার। কোনোদিন ট্যাক্সি করে সোজা গঙ্গার ধারে। শীতকাল হলে দক্ষিণেশ্বর কিম্বা বেলুড়।

বিজয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরুতে প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগত। মনে হ'ত আড়াল থেকে অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তাকে লক্ষ্য করছে।

কিন্তু তারপর ব্যাপারটা হিয়ার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেল। প্রতিমাসে ওই লোকগুলো অন্তত দু'বার আসত। আর হিয়া জানত ওরা এলেই বিজয় আসবে। তার পকেটে সিনেমা কিংবা থিয়েটারের টিকিট। একটু পরেই রতীশ এসে বিজয়ের সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে বলবে। ক্রমে ঘটনা এমন সহজ হয়ে গেল যে ওই লোকগুলো আসবে জানলেই হিয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠত। আয়নার সামনে তাড়াতাড়ি সাজতে বসত। বিজয় এলেই জামাকাপড় পরে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ছকে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। অনেক সময় রতীশ তাকে যেতে বলার আগেই সে সাজগোজ করে তৈরি হয়ে থাকত। শুধু বেরোবার সময় রতীশের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হেসে চলে যেত। ফিরতে কখনও রাত্তির সাতটা—আটটা বাজত। কোনোদিন এসে দেখত রতীশ কাজকর্মে কোথাও বেরিয়ে গেছে। বাড়িতে কাজের ছেলেটা তার প্রতীক্ষায় বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে।

ওই লোকগুলো কারা, কোথা থেকে আসে এই প্রশ্নটা অনেকবার হিয়ার মনে হয়েছে। কিন্তু রতীশ তাকে স্পষ্ট উত্তর দেয়নি। বরং এড়িয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলত, ওদের সঙ্গে তার কাজকর্ম থাকে। কী কাজ, কেনই বা ওরা আসে,—এই প্রশ্নের জবাব রতীশের কাছ থেকে পায়নি। হয় তো সে দিতে চায় নি।

একদিন বিজয়কে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তার মুখের দিকে সে তাকাল। বলল,—'রতীশ আপনাকে কিছু বলে নি?'

—'না।' হিয়া ছোট্ট জবাব দিল।

বিজয় বলল,—'তাহলে বৌদি, আমার কাছ থেকে নাই বা শুনলেন।'

হিয়ার কৌতূহল বাড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার কী আপত্তি আছে?'

—'ঠিক আপত্তি নয়।' বিজয়কে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল। ইতস্তত করে বলল,—'আমার মনে হয় ব্যাপারটা রতীশ গোপন রাখতে চায়।'

হিয়ার রোখ চেপে গেল।

আশ্চর্য! লোকগুলো মাসে অন্তত দুবার তার স্বামীর কাছে আসে। আর ওরা এলেই রতীশ তাকে বিজয়ের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে পাঠিয়ে দেয়। এর ভিতরে যে একটা গোপন রহস্য আছে তা হিয়াও এতদিনে বুঝতে শিখেছে। ব্যাপারটা বিজয় জানে। আর শুধু বিজয় কেন, রতীশের

অন্ত বন্ধুরা যেমন চন্দ্রকান্ত এবং আরো অনেকের কাছে এটা অগোচর নয়। অথচ স্ত্রী হয়েও হিয়া তার বিন্দুবিসর্গ টের পায় নি। জিজ্ঞাসা করলেও রতীশ তাকে এড়িয়ে গেছে। সম্ভবত এই বিষয়ে তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করে নি।

নিজেকে ঈষৎ অপমানিত মনে হচ্ছিল। ঈষৎ গম্ভীর গলায় সে বলল, —'আপনার অসুবিধে থাকলে জোর করব না। তাছাড়া আমার স্বামী যখন ব্যাপারটা গোপন রাখতে চান, তখন অন্য কাউকে সে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করা কখনও উচিত নয়।'

—'আপনি রাগ করছেন বৌদি।' বিজয় দুঃখ করল। বলল,—'তবে আমি ভাবতাম রতীশ না জানালেও ব্যাপারটা হয়তো আপনি ধরে ফেলেছেন।'

—'না', হিয়া ঘাড় শক্ত করে তাকাল। বলল,—'আসলে আমি যে বাড়িতে মানুষ, সেখানে এমন ঘটনা কেউ চিন্তা করতে পারে না। স্বামী যে আবার স্ত্রীর কাছে এসব কথা গোপন রাখে, নিজেও তা কোনোদিন ভাবিনি।'

বিজয় হেসে বলল---'তবে একটা কথা আপনাকে জানাতে পারি। রতীশ বোধহয় এই কারবারটা বন্ধ করে দিচ্ছে। নানারকম ঝামেলা তো আছেই। তাছাড়া ইদানীং যেন কড়াকড়ি একটু বেড়েছে।'

কারবার? হিয়া ঠিক বুঝতে পারেনি। ওই লোকগুলোর সঙ্গে তার স্বামী কী কারবার করে?

পরে একদিন বিজয় তাকে সমস্ত কথা বলেছিল। একটুও গোপন করে নি। হিয়ার সঙ্গে তার মেলামেশা নিয়ে রতীশ যেদিন কুৎসিত ইঙ্গিত করল, সেদিন আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি। চোখমুখ লাল করে বিজয় তালতলার বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মানুষটার দিকে এক নজর তাকিয়ে হিয়ার অবশ্য ব্যাপারটা আঁচ করতে সময় লাগেনি। হাজার হোক মেয়েমানুষ, পুরুষের ছটফটানি দেখলে তার কারণ বুঝতে বিলম্ব হয় না।

বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'কী হ'ল? মনে হচ্ছে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করে এলেন।'

বিজয় অনেকক্ষণ কোনো জবাব দিল না। পরে বলল—'যুদ্ধ করিনি। তবে এখন মনে হচ্ছে ওটা করে এলেই ভাল হ'ত।'

—'ওমা! তাহলে কী রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এলেন?' হিয়া নিপাট ভালো মানুষের মতো প্রশ্ন করল।

খোঁচা দিতেই আহত ফণীর মতো বিজয় ফুঁসে উঠল। বলল,—'কেন পালিয়ে আসতে হ'ল জানেন?'

—'কেন?' হিয়া কৌতূহলী চোখে তাকাল।

বিজয় এক নিঃশ্বাসে বলল,—'শুধু কেলেঙ্কারীর ভয়ে।'

—'কেলেঙ্কারী ?'

—'হ্যাঁ। আপনি জানেন, এতদিন পরে রতীশ আমাকে সন্দেহ করছে ?'

ব্যাপারটা যে শেষপর্যন্ত এদিকেই গড়াবে হিয়া ঠিক তাই আঁচ করেছিল। মৃদু হেসে সে শুধু বলল, – 'সন্দেহ ?'

—'হ্যাঁ। আপনাকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার গিয়েছি, মজা লুটেছি,— আরো হয়তো কত কিছু ঘটেছে রতীশ তাই মনে করে।'

কিন্তু আশ্চর্য ! কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে হিয়া শুধু হেসে উঠল। বলল,—'শেষপর্যন্ত বন্ধু আপনাকে সন্দেহ করল ?'

—'হ্যাঁ। আমি জানতাম একদিন রতীশ এই কথা বলবে। তাই প্রথমেই ওকে সাফ জানিয়েছিলাম, বউকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার কিংবা অন্য কোথাও যেতে হয়,—তুই যা। মিছিমিছি আমাকে এর মধ্যে জড়াস নে। কিন্তু তাহলে তো বাবুর কারবার লাটে উঠবে। আর যাই বলুন 'স্মাগলিং'-এর বিজনেসে ঝুটঝামেলা আছে, কিন্তু লাভের অঙ্কটা তেমনি অন্য ব্যবসার তিনগুণ।'

হিয়া খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার বন্ধু 'স্মাগলিং'-এর ব্যবসা করছেন ?'

—'তাছাড়া কি ? ওই লোকগুলোর চেহারা-পোশাক দেখে আপনি বুঝতে পারেননি ? সব জাহাজী। এতকাল রতীশ আবুধাবিতে কাটিয়েছে। এ লাইনে ওর ভালো যোগাযোগ ছিল। এই একটা বছরে কম টাকা কামিয়েছে ভাবেন ?'

হিয়া চুপ করে কী চিন্তা করছিল।

বিজয় ফের বলল,—'স্মাগলিং'-এর কারবারের কথা ও আপনার কাছে গোপন রাখতে চাইল। প্রথম দিন আমাকে শুধু বলল, চৌরঙ্গী পাড়ার কোনো সিনেমা হল থেকে দুটো টিকিট কেটে আনতে। ভাবলাম হয়তো বউকে সঙ্গে নিয়ে ছবি দেখার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু শেষে যখন আমাকেই যেতে বলল তখন খুব আপত্তি করেছি। বললাম, ছি ছি ! তাই কখনও হয় ? লোকে দেখলে কী মনে করবে জানিস ?' এক মুহূর্ত থামল বিজয়। হিয়ার মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফের শুরু করল,—'কিন্তু চন্দ্রকান্তটা মহা শয়তান। সে মুচকি হেসে বলল, তোর এত সতীপনা কিসের ? রতীশ যখন স্বেচ্ছায় তার বউকে তোর সঙ্গে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে

এতদিন সে যা মনে করেছিল, সব মিথ্যে, ভুল। রতীশের সমস্ত আচরণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ওই জাহাজী মানুষগুলোর সঙ্গে নানারকম গোপন কথা, শলা পরামর্শ করার জন্য রতীশ তাকে বাইরে পাঠাত। এই আলোচনার সময় বাড়িতে তার উপস্থিতি সে পছন্দ করেনি।

অনেকক্ষণ পরে হিয়া বলল,—'আপনি এত রাগ করছেন কেন? সত্যি তো কোনো অন্যায় কাজ করেন নি। বন্ধুর প্রয়োজন ছিল বলেই খানিকটা সময় তার স্ত্রীকে বাইরে সিনেমা-থিয়েটার কিংবা এখানে-সেখানে নিয়ে গিয়েছেন।'

বিজয় তবু বলল,—'কিন্তু তাই বলে পাঁচজনের সামনে এমনি মিথ্যে অপবাদ দেবে?'

—'ওটা তার স্বভাব।' হিয়া জবাব দিল। বলল,—'চোদ্দ বছর মরুভূমির দেশে কাটিয়ে মানুষটার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। নইলে নিজের স্ত্রীর কুৎসা কেউ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে?'

—'কিন্তু রতীশ যা বলছে তা সব মিথ্যে। এক বর্ণও সত্যি নয়।'

—'মিথ্যে বলেই তো এমন জোর গলায় অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে।' হিয়া অপাঙ্গে একবার বিজয়কে নিরীক্ষণ করল। ঈষৎ কটাক্ষ করে বলল,—'আসলে ও জানত আপনি একটা ঠাণ্ডা পাথর,—তেতে ওঠার কোনো ক্ষমতা নেই।'

মন্তব্যের ভিতর একটা খোঁচা রয়েছে। তবু বিজয় তা নিঃশব্দে হজম করল।

বাঁকা হেসে হিয়া ফের বলল,—'আসলে তেমন পুরুষমানুষ হ'লে উচিত শিক্ষা দিতে পারত। হাতের মুঠোয় ওর বউকে পেয়ে এমনি ছেড়ে দিত না।'

তালতলার বাড়িতে বিজয় আর আসে নি। সম্ভবত রতীশ তাকে আসতে নিষেধ করেছিল। তখন আর বিজয়কে প্রয়োজন ছিল না। 'স্মাগলিং'-এর কারবার তুলে দিয়ে রতীশ ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা ধরল। চন্দ্রকান্তকে তার বিজনেসের সিকি অংশীদার করে নিল। বিজয়কে প্রয়োজন হ'ত সেই জাহাজী লোকগুলো ঘরে এলে। তখন স্ত্রীকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধুর সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে রতীশ নিশ্চিন্তে ওই মানুষগুলোকে নিয়ে গোপন ব্যবসার লাভ-লোকসানের হিসেব করত।

একদিন রতীশকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'আচ্ছা, বিজয়বাবুর খবর কী? তার কথা তো বহুকাল শুনিনি।'

রতীশ বিছানায় শুয়ে একটা মোটা খাতার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। মুখ না তুলেই বলল,—'কী ব্যাপার? বিজয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ল যে।'

—'এমনি, অনেকদিন তো এদিকে আসেন না তাই…।'

রতীশ এবার সেই খাতাটা বন্ধ করে বিছানার ওপর উঠে বসল। মুচকি হেসে বলল,—'আমি তো ভাবলাম বিজয়ের জন্য তোমার মনটা হঠাৎ টনটনিয়ে উঠল বুঝি।'

—'চুপ কর। নোংরা কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না।' হিয়া প্রায় ধমকে উঠেছিল।

রতীশ গলার স্বরটা পালটে বেশ গম্ভীর মুখ করে বলল,—'নোংরা কথা আমি বলতে যাব কেন? তবে বিজয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিয়ে চারদিকে একটা ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল। চন্দ্রকান্ত পর্যন্ত একদিন বলল,—বিজয় তোর বউকে ভালোবাসে, বুঝলি?'

হিয়া চোখ পাকিয়ে জবাব দিল,—'ছি, ছি! একটা ভালোমানুষের নামে এমনি অন্যায় কুৎসা রটাতে তোমাদের লজ্জা করে না? তাছাড়া সে কোনোদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার যেতে চায় নি। তুমি জোর করে তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছ। শুধু নিজের গোপন কারবারের কথা স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে রাখতে।'

রতীশ চুপ, বউয়ের অভিযোগের জবাব দিতে পারল না।

হিয়া ফের বলল,—'হ্যাঁ, মনে কর না কেন, তোমার বউকে নিয়ে সে ফুর্তি করেছে। যখন সেই সুযোগ তুমি নিজের হাতে তাকে দিয়েছিলে। তাই নিয়ে তোমার মাথা গরম করা সাজে না।' প্রায় জলন্ত একটা কটাক্ষ বর্ষণ করে হিয়া ফের বলল,—'তবে একটা কথা জেনে রাখ। আগুনের পাশে ঘি রাখলে তা গলবে। অন্য পুরুষ হ'লে তোমার বউকে এঁটো না করে ছাড়ত না। বিজয়বাবু সংযমী, ভালোমানুষ। তাই বন্ধুর স্ত্রীর দিকে কোনোদিন নির্লজ্জের মতো হাত বাড়ান নি।'

স্ত্রীর ওই বেপরোয়া চরম মনোভাব দেখে রতীশ ভয় পেল। তাড়াতাড়ি নরম হয়ে হিয়ার সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে চেষ্টা করল। নিজেই বলল, 'বিজয় এখন বজবজে থাকে। একটা জুট মিলে ভালো চাকরি পেয়েছে। কাজে-কর্মে ব্যস্ত, তাই বোধহয় এদিকে আসতে সময় পায় না। আচ্ছা, একদিন দেখা হ'লে বরং আসতে ব'লব।'

হিয়া কোনো কথা বলে নি। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ সে বিজয়ের কথা ভাবছিল। খানিকটা দূরে সেই ফিতের খাটে রতীশ ঘুমোচ্ছে। আড় চোখে হিয়া একবার স্বামীকে দেখল: মাঝে মাঝে একটা জান্তব প্রবৃত্তির তাগিদে মানুষটা তার শয্যায় চলে আসে। হিয়া বিরক্তিতে মুখ কোঁচকায়, বাধা দেয়। কোনোদিন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। প্রয়োজন ফুরোলেই সে আবার তার

বিছানায় ফিরে যায়। স্ত্রীর যে একটা মন বলে বস্তু আছে লোকটা কোনোদিন তার খোঁজ করল না। অথচ এই মানুষটা আবার বন্ধুর সঙ্গে নিজের বউয়ের নাম জড়িয়ে অপবাদ দিতে ছাড়ে না। বোকা স্বামী। ভেবেছে এমনি করেই তার মন থেকে বিজয়ের মতো একজন সহৃদয় পুরুষের স্মৃতি মুছে দিতে পারবে? ও জানে না, বিজয় কবে তার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলেছে। হিয়া এখন তার কথা ভাবে। এই অন্যায় কুৎসা কানে গেলে তার কষ্ট হয়।......

ভালোবাসা বোধহয় এমনি করে জন্মায়।



বেলা আড়াইটে বাজতেই হিয়া এসে ডাকাডাকি শুরু করল,—'উঠুন, ও মশায় আর কত ঘুমোবেন?'

বিছানায় পাশ ফিরতেই বিজয়ের চোখে কখন এক চটকা ঘুম এসে গিয়েছিল। হিয়া এসে না ডাকলে নিশ্চয় অবেলা পর্যন্ত অঘোরে ঘুমোত। আসলে কলকাতায় আসবে বলে সে আজ খুব ভোরে উঠেছে। তারপর চা খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে একেবারে স্নান করে বেরিয়েছে। ইষ্টিশন পর্যন্ত মাইলখানেক পথ। খানিকটা হেঁটে তবে একটা সাইকেল রিকশা পেল। শিয়ালদতে নেমে দু-একটা খুচরো কাজ সেরে তারপর ডালহৌসীতে অফিসে গিয়ে পৌঁছল। শেষে সেই ভদ্রলোকের দেখা না পেয়ে ট্রাম ধরে স্টেশনে ফিরে যাবে ভাবল। তখন মনে হচ্ছিল আজ সমস্ত দিনটাই মাটি। দুপুরবেলা জুট মিলের কোয়ার্টারে গিয়েও লাভ নেই। কারণ এই বুধবারটা তার অফ-ডে। ফিরে গেলে সন্ধ্যেবেলা হয়তো ক্লাবে গিয়ে তাসের আড্ডায় বসতে পারে। কিন্তু বিজয়ের কাছে সেটা এমন কিছু আকর্ষণ নয়। শেষে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কেনার কথা মনে হতে সে বৌবাজার পোস্ট অফিসের স্টপে নেমে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের কাছে হিয়ার সঙ্গে দেখা, আর তখনই সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়ানোর একটা অবলম্বন পেয়ে গেল।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হিয়া ফের ডাকল,—'কই মশায়, উঠুন। তিনটের সময় বেরুবো বলেছি না?'

বিজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে হেসে বলল,—'আরো এক ঘণ্টা পরে বেরুলেও ক্ষতি ছিল না।'

—'তাই নাকি?' হিয়া সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'এ কি আপনার বজবজের সিনেমা হল? শো আরম্ভ হবার আগে গিয়ে পৌঁছলেই টিকিট পেয়ে যাবেন?'

মাথার বালিশটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বিজয় আয়েসী ভঙ্গিতে জবাব দিল,—'অত সহজ ভাববেন না। তবে ওখানে স্রেফ হিন্দি চলে। আর ঝাড়-পিটের বই হ'লে তো কথা নেই। তিন-চার দিন আগেই হাউসফুল।'

হিয়া ফের তাড়া দিল,—'ও কি! অমন ঝাঁকিয়ে বসলেন যে? বিছানা থেকে নামুন। জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন।' মুচকি হেসে ফের বলল,—'আমার চেনাজানা ব্ল্যাকার আছে। গিয়ে দাঁড়ালেই ঠিক টিকিট জোগাড় হয়ে যাবে।'

বিছানা থেকে নেমে বিজয় খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'চেনাজানা ব্ল্যাকার মানে? আপনি কী ওদের রেগুলার কাস্টমার নাকি?'

—'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। হপ্তায় অন্তত তিনটে ছবি যখন দেখি। আচ্ছা বলুন, এত বই দেখলে কী আগে থেকে টিকিট কেনা সম্ভব?' ফের বিজয়কে লক্ষ্য করে মন্তব্য করল,—'আপনার এতে অবাক হওয়া সাজে না। ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে কত টিকিট তো আপনিও কিনেছেন।'

বিজয়ের এবার সেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, হিয়া তা বলতে পারে। তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুজনে কোন ছবি দেখবে তাই নিয়ে আলোচনা হ'ত। কয়েকদিন আগে জানতে পারলে বিজয় অবশ্য টিকিট কেটে রাখত। কিন্তু জাহাজী লোকগুলোর আসবার কোনো সময়-তারিখ ছিল না। রতীশের দোষ নেই। সে বেচারী হয়তো আগের দিন সন্ধ্যেবেলা খবর পেল ডকে জাহাজ এসে ভিড়েছে। অনেক রাত্তিরে বিজয়ের কাছে খবর পাঠাত দুপুরে তার বাড়িতে যেন নিশ্চয় আসে। এমনও হয়েছে খুব সকালে তার বরানগরের মেসে রতীশ নিজেই হন্তদন্ত হয়ে হাজির। না, ব্যাপার কিছু নয়। দুপুরবেলা ওরা আসবে। খবর পেয়েছে অনেক রাত্তিরে। তাই বিজয়ের কাছে লোক পাঠাতে পারেনি। অগত্যা সকালেই দৌড়ে এসেছে।

রতীশ এলেই বিজয় সব বুঝতে পারত। কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ছিল না। অন্য কোনো কারণে রতীশ এমন সাত সকালে তার মেসের দরজায় হাজির হবে না। বিজয় শুধু বলত,—'একটু মুস্কিলে ফেললি। সিনেমার টিকিট জোগাড় করা কঠিন, তোর বউ আবার পুরোন বই হ'লে দেখতে চায় না।'

—'সিনেমা-থিয়েটার না গেলি তো অন্য কোথাও ঘুরে আয়।' রতীশ যেন একটা উপায় বাতলে দিল। শেষে বলল,—'সন্ধ্যের পর ওকে বাড়ি পৌঁছে দিস তাহলেই হবে।'

বিজয় একদিন বলেছিল,—'এমনি রাস্তাঘাটে তোর বউকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। চেনাজানা কারো সঙ্গে দেখা হ'লে কী যেন ভাবে। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু আড়ালে নিশ্চয় হাসে।'

রতীশ এসব ইঙ্গিত গায়ে মাখত না। উল্টে জবাব দিত,—'যা ইচ্ছে হয় ভাবুক। তোর সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখে এলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।' ফের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিজেই বলত,—'তোকে ছাড়া উপায় নেই, বুঝলি ? অন্য কারো সঙ্গে বাইরে যেতে হিয়া বোধহয় রাজি হবে না।'

বিজয় তা জানত। দুর্বলতা না হোক, পছন্দ-অপছন্দের একটা ব্যাপার আছে। হিয়া তাকে পছন্দ করে, তার সঙ্গ ভালোবাসে। বোধহয় রতীশও স্ত্রীর এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

আর একদিন সে বলল,—'তোর ব্যবসার কথা বউকে জানালেই পারিস।'

—'বলিস কী ?' রতীশ যেন চমকে উঠল।

—'হ্যাঁ' বিজয় তার কথার জের টানল। 'নইলে ওর মনেও তো একটা সন্দেহ হতে পারে। ওই লোকগুলো কেন আসে সে কথা কোনোদিন তোকে জিজ্ঞাসা করে নি ?'

—'তা করেছে।' রতীশ উত্তর দিল।

—'তুই কী বললি ?'

—'পরিষ্কার করে কিছু জানাই নি। শুধু বলেছি ওদের সঙ্গে কাজকর্ম আছে, তাই আসে।'

—'তুই ব্যাপারটা খুলে বললেই পারিস। তাহলেই আর লুকোচুরি করতে হয় না।'

—'ক্ষেপেছিস্ ?' রতীশ চোখ তুলে এক পলক তাকাল। ফের বলল,—'ওরা কী নিয়ে আসে তুই সব জানিস। মেয়েমানুষের কাছে কখনও সোনার গল্প করতে আছে ? বোকার মতো কোথায় কার কাছে ফাঁস করে দেবে,—তাহলেই দফা রফা।'

—'কেন ?' বিজয় আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল। বলল,—'বউকে তুই বিশ্বাস করতে পারিস নে ?'

—'এতখানি বিশ্বাস করা ভালো ?' রতীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। ফের গম্ভীর

মুখে বলল,—'তা ছাড়া এ হ'ল গোপন কারবার। টের পেলে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে।'

বিজয় বাঁকা হেসে বলল,—'কিন্তু গিন্নিকে তো আর একজনের সঙ্গে দিব্যি ছেড়ে দিতে পারিস। মেয়েমানুষকে এত বিশ্বাস করতে নেই, কই সে কথা তখন মনে হয় না?'

ইঙ্গিতটা যতীশ বুঝতে পারল। বলল,—'তাহলে তো বউকে চাবিতালা দিয়ে রাখতে হয়। সেটা যখন সম্ভব নয়।' মুচকি হেসে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে ফের কটাক্ষ করল,—'বউকে বিশ্বাস না করলেও তোকে নিশ্চয় করি।'

—'তবু ভালো। অন্তত একজনের ওপর তোর আস্থা আছে।' বিজয় মন্তব্য করল। কী মনে হতে ফের বলল,—'তবে বন্ধুর চেয়ে বউকে বিশ্বাস করলেই বোধহয় ভালো ছিল।'

যতীশের চরিত্র বুঝতে বিজয়ের বেশী দেরি হয় নি। এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। বিশ্বাস দূরে থাক, বউকে সে কোনো দিন ভালবাসতে পারে নি। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গ্রন্থিটা ভালোবাসার আঠায় জোড়া লাগে। প্রথমে ভালোবাসা জন্মায় আর সেই ভালোবাসা থেকেই আস্থা কিম্বা বিশ্বাসের সৃষ্টি। যেখানে ভালোবাসা কম, সেখানে সন্দেহ বেশী। তাই বলে কী আর স্ত্রী-পুরুষ মিলে ঘর-সংসার করছে না? নিশ্চয় করে। বিয়ে-থা হলেই সিঁথিতে সিঁদুর পরে দিব্যি সংসারী হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী হ'ল পুরুষের কাছে ভোগের সামগ্রী। তেমনি মেয়েদেরও স্বামী অথবা পুরুষের প্রয়োজন আছে। বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন চাই বলে।

মিনিট পনের না যেতেই অন্য ঘর থেকে হিয়া বেরিয়ে এলো। এসেই তাড়া দিল,—'কই মশায়, হ'ল আপনার?'

বিজয় প্রায় তৈরি। হাওয়াই সার্টটা পরে বোতাম আঁটছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল,—'এই তো রেডি। তিনটে কী বেজে গেছে?'

মনিবন্ধে আঁটা রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে হিয়া জবাব দিল,—'তিনটে বেজে পাঁচ। তার মানে ফাইভ মিনিটস্ লেট, বুঝলেন?'

—'সে তো আপনার জন্যে।'

—'কী রকম?'

—'এতক্ষণ ধরে সাজগোজ করছিলেন, তাই।' বিজয় জবাব দিল। তারপর হঠাৎ হিয়ার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে হেসে বলল,—'সত্যি বৌদি। দারুন লাগছে, মার্ভেলাস।'

—'ফাজলামি হচ্ছে?' হিয়া কপট রাগ দেখাল। চোখ পাকিয়ে বলল,—

'কই এতক্ষণ তো এসব কথা মুখে আসেনি। একটু সাজগোজ করেছি, অমনি।'

বিজয় চিরুনীটা মাথার চুলে সযত্নে বুলিয়ে নিচ্ছিল। আড় চোখে হিয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই বলব ভাবছি। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না।'

—'বেশ তো। এখন সাহস করে বলে ফেলুন।' ফিক করে হেসে হিয়া যেন তাকে প্রশ্রয় দিল।

বিজয় এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের হিয়ার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল,—'এই ক'বছরে আপনি অনেক সুন্দর হয়েছেন বৌদি।'

—'সুন্দর না ছাই।' হিয়া চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল। বলল,—'বরং আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়ে গেছি, তাই না?'

—'মোটা কেন হতে যাবেন? আমি বলব স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে।' বিজয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঈষৎ হেসে বলল,—'আজ রাস্তায় আপনাকে দেখেই প্রথম সে কথা মনে হ'ল।'

—'তাহলে তখন কেন তা বলেন নি?' হিয়া প্রায় কটাক্ষ হানল।

বিজয়ের কেমন নেশা লাগছিল। চোখে ঘোর, ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে সে অকপটে স্বীকার করল,—'তখন ইচ্ছে হ'ল বলি। কিন্তু পরে ভাবলাম প্রায় দশ বছর পরে দেখা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ এসব কথা বললে আপনি যদি কিছু মনে করেন।'

হিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বলল,—'ধুর। আপনি দেখছি একেবারে কাঁচা। একটা কথা শিখে রাখুন। রূপের প্রশংসা শুনলে মেয়েরা কখনও রাগ করে না। বড় জোর রাগের ভান করে।'

হঠাৎ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিয়া যেন লাফিয়ে উঠল। বলল,—'ওমা, সওয়া তিনটে বেজে গেছে। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে হিয়া কাজের ছেলেটিকে ডাকল। রান্নার মেয়েটি সন্ধ্যে নাগাদ আসে। রাত্তিরে কী রান্না হবে তা বলার প্রয়োজন নেই। মেয়েটি অনেকদিন আছে, সব জানে। গতকাল এবং আজ সকালেও বাবু বাড়ি ফেরেনি, তা ওরা দেখেছে। কিন্তু রতীশ যে কলকাতা থেকে অনেক দূরে রয়েছে, আজ রাত্তিরেও বাড়ি ফিরতে পারবে না, সে কথা বোধহয় না বললেই ভালো। উল্টে তার একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যা পাড়া,—একটা ছোট্ট কথা শাঁখের ধ্বনির মতো চট করে ছড়িয়ে যায়। আর বাবু বাড়িতে নেই, অথচ অন্য একটা লোক দুপুরে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে গিন্নির সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেল মেয়েমহলে

তাই নিয়ে এখুনি জোর আলোচনা শুরু হবে। তারপর রাত্তিরেও কর্তা বাড়ি ফিরবে না শুনলে আর রক্ষে আছে? হিয়ার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে যে সব মন্তব্য হবে, তা উচ্চারণ করতেও বোধহয় তার জিভে আটকাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পা দিতেই পিতুর মায়ের সঙ্গে দেখা। বিজয় সঙ্গে, পিতুর মাকে দেখে সে ইচ্ছে করেই একটু এগিয়ে গেল। হিয়া বুঝতে পারল, এখনই তাকে দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। একগাল হেসে পিতুর মা জিজ্ঞাসা করল,—'বাব্বা! এত সাজগোজ করে কোথায় চললে গো হিয়াদি?'

কোথাও যাওয়ার আগে হিয়া রোজ সাজগোজ করে। হুটহাট অমন ঘর থেকে বেরোয় না। তার সাজের বহর দেখে এ পাড়ার লোকে পটের বিবি নাম দিয়েছে। পিতুর মা সে কথা জানে। আসলে হিয়া কোথায় যাচ্ছে তাই জানবার কৌতূহল। সাজের কথাটা অমনি জুড়ে দিয়েছে।

হিয়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল,—'একটু কাজ আছে পিতুর মা। তাই বেরুচ্ছি।'

পিতুর মা লোক ভালো। মনটা সরল। রেখে ঢেকে কথা বলতে শেখেনি। বোকার মতো হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'পরশু রাত্তিরে কী হয়েছিল হিয়াদি? দাদাবাবু নাকি কাল ভোর বেলা চলে গিয়েছে, এখনও ফেরে নি।'

হিয়া বুঝতে পারল, সেই রাত্তিরের ঘটনা পাড়াময় চাউর হয়ে গেছে। রতীশের যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকত। এখন পিতুর মায়ের সামনে অপ্রস্তুতের এক শেষ। কী জবাব দেবে?

—'তেমন কিছু নয়।' হিয়া ঢোক গিলে বলল,—'পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে পিতুর মা। এখন একটু তাড়া আছে, বুঝলে?'

বিজয় খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। মুখ ফিরিয়ে পিতুর মা মানুষটাকে লক্ষ্য করল। চাপা গলায় শুধোল,—'উনি কে হিয়াদি?'

—'তোমার দাদাবাবুর এক বন্ধু।' হিয়া ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। চট করে তার মাথায় একটা সুন্দর জবাব তৈরি হয়ে গেল। হেসে বলল,—'রাস্তায় ট্রাকের কী গণ্ডগোল হয়েছে। গতকাল সেই ঝামেলা মেটাতে গিয়ে তোমার দাদাবাবু আটকা পড়ে গেছেন। তাই খবরটা দিতে এই ভদ্রলোক এসেছিলেন। এখন আবার ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাবেন।'

এমন জুৎসই জবাব দিতে পেরে হিয়া রীতিমত একটা স্বস্তি বোধ করল। যাক, আপাতত এতেই সব দিক রক্ষা হবে। নইলে ভদ্রলোক কে? এখানে কেন এসেছিলেন ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে গিয়ে হিয়াকে বেকায়দায় পড়তে হ'ত। ভুবনপিসী জিভ কেটে বলত,—'ছি-ছি! লাজলজ্জার

মাথা খেয়ে বসে আছে।'

পিতুর মায়ের সঙ্গে তার যে কথা হ'ল বিজয় তা শুনতে পেল কিনা কে জানে? ইচ্ছে করেই হিয়া আর সে প্রসঙ্গ তুলল না। বড় রাস্তায় একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। হিয়া এগিয়ে গিয়ে তাতে উঠে বসল। বিজয় পিছনে, দ্বিরুক্তি না করে সেও গাড়িতে উঠল।

ভারী মিষ্টি একটা সেণ্টের সৌরভ।

পাশাপাশি হিয়ার খুব কাছে বসতেই গন্ধটা বিজয়ের নাকে এসে লাগল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে হিয়া বলল,—'কোন হলে যেতে চান?'

—'যেখানে আপনার ইচ্ছে।'

—'তাহলে মেট্রোতে যাই।' হিয়া প্রস্তাব করল। বলল,—'গত শুক্রবার একটা ভালো বই রিলিজ করেছে।'

—'হিন্দি ছবি? টিকিট পাবেন?' বিজয় সন্দেহ প্রকাশ করল।

—'আহা! চলুন না আমার সঙ্গে।' হিয়া সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করে বলল,—'হপ্তায় অন্তত তিনটে ছবি দেখি। হলের দরজা থেকে কিন্তু কোনোদিন ফিরে আসিনি।'

কথাটা যে মিথ্যে নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয় তা বুঝতে পারল। মেট্রোর কাছে যেতেই একটা ঢ্যাঙা কালো মতন ছোঁড়া নিঃশব্দে হিয়ার কাছে এলো। পরনে প্যাণ্ট, গায়ে নীল রঙের জামা। মুখে বসন্তের দাগ। এক নজর তাকিয়ে বিজয় বুঝতে পারল ছেলেটি ব্ল্যাকার। ওর ভাবভঙ্গি দেখে আরো ধারণা হ'ল হিয়াকে সে আগেও টিকিট বিক্রি করেছে। পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি ফিসফিস করে কী যেন কথাবার্তা বলল। তারপর সে ফুটপাত ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে হিয়া। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের মুখে এসে ছোকরা একটা বড় বাড়ির থামের আড়ালে দাঁড়াল। পকেট থেকে কী যেন বের করে হিয়াকে দিল, পরিবর্তে টাকা নিল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বিজয় সব লক্ষ্য করল। হিয়া ফিরে আসতেই সে মুচকি হেসে বলল,—'বৌদি, আপনি তো দেখছি এ লাইনে এক্সপার্ট।'

গর্বের সঙ্গে হিয়া জানাল,—'তখন বলেছিলাম না, টিকিট ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।'

ঘড়িতে চারটে বাজেনি। শো আরম্ভ হতে অন্তত দেড় ঘণ্টা বাকি। বিজয় বলল,—'কোথায় যেন চা খাবেন?'

—'হ্যাঁ, নিউ মার্কেটের কাছে সেই রেস্তোরাঁয়।' হিয়া হেসে উত্তর দিল। বলল,—'লাইট হাউসে কিংবা গ্লোবে ছবি দেখার আগে আমরা বরাবর ওখানেই

চা খেয়ে নিতাম।'

প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। রেস্তোরাঁটা ঠিক কোথায় বিজয়ের মনে পড়ল না। আসলে এই দশ বছরে কত জায়গায় চা খেয়েছে। তাই কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

হিয়া বলল,—'আমি দু-একবার ওখানে গেছি। এখন অবশ্য অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু ওই রেস্তোরাঁতে গেলেই আপনার কথা মনে পড়ত।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে নিউ মার্কেটের কাছে এলো। এই দশ বছরে বিজয় এদিকে তেমন আসেনি। বজবজে চাকরি, কাজেকর্মে কলকাতায় আসা। তাও মাসে এক-আধবার। আর একা-একা নিউ মার্কেটের দিকে আসতে ইচ্ছে করে না।

রেস্তোরাঁর কাছে এসে বিজয়ের সব মনে পড়ল। নিউ মার্কেটের মধ্যে ওটা দোতলায় ছোট ছোট কেবিন। তখন এখানেই বহুদিন চা খেয়েছে। এই দশ বছরে অবশ্য রেস্তোরাঁর ছিরিছাঁদ পাল্টে গেছে। দেয়ালে অলঙ্করণ, নতুন চেয়ার-টেবিল, মোটা রঙিন পর্দা, ঘষা কাচে ঢাকা নরম আলো।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই হিয়া চায়ের অর্ডার দিল। জিজ্ঞাসা করল,—'কী খাবেন? ফিস-ফ্রাই না কাটলেট?'

—'পাগল?' বিজয় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। বলল,—'এই তো একটার সময় খেয়ে উঠেছি।'

—'তাহলে চায়ের সঙ্গে শুধু পট্যাটো চিপস্ দিতে বলি?' বেয়ারার দিকে তাকিয়ে হিয়া তাই নির্দেশ দিল!

চায়ের স্বাদ ভালো। কাপে চুমুক দিয়ে হিয়া বলল,—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

—'অবশ্য। তবে একটা কেন, আপনার য'টা ইচ্ছে করুন।'

চোখ নামিয়ে হিয়া বলল,—'এই দশ বছরে আমার কথা কখনও মনে হয়নি?'

প্রশ্নটার অর্থ হয়তো বা অনেক গভীরে। কিম্বা ওটা এমনি সাদামাটা। তবু বিজয় কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। হেসে বলল,—'কেন মনে হবে না? কতবার হয়েছে।'

—'তবু ভালো। আমি ভেবেছি আপনি সব ভুলে গিয়েছেন।' এক মুহূর্ত থামল হিয়া। ফের স্বগতোক্তির মতো বলল,—'একবারও তো খোঁজ নিলেন না, তাই।'

বিজয় নীরবে চা পান করছিল। কোনো জবাব দিল না। হিয়া চোখ তুলে

তাকাল। জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, আমরা যে তালতলার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, এখন বেলেঘাটায় আছি—সে কথা আপনি জানতেন না ?'

—'সব জানি বৌদি।' বিজয় গড়গড় করে বলে গেল,—'রতীশ ট্রাক কিনে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করেছে। চন্দ্রকান্ত তার বিজনেস-পার্টনার। তালতলার ফ্ল্যাটের বাড়িওলার সঙ্গে আপনার কী সব গণ্ডগোল হয়েছিল। তাই ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রতীশ বেলেঘাটায় চলে আসে। এই ধরুন বছর তিন আগে।'

—'ও বাবা।' হিয়া চোখ দুটি প্রায় কপালে তুলে বলল,—'বজবজে থাকলে কী হবে ? আপনি তো দেখছি আমাদের হাঁড়ির খবর রাখেন।'

'শুধু তাই ?' বিজয় মৃদু হাসল। বলল,—'আপনার ছেলে নিলয়কে তো রাঁচীর কাছে একটা মিশনারী স্কুলে দিয়েছেন। ছুটিছাটা হ'লে সে বাড়িতে আসে।'

হিয়া এবার অবাক হয়ে বলল,—'সত্যি, এত খবর আপনি কোথায় পেলেন ?'

চায়ের কাপে ফের চুমুক দিল বিজয়। বলল,—'এ আর এমন কী শক্ত কাজ ? এই ক-বছরে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তো অনেকবার দেখা হয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে রতীশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'ল। আপনাকে সে কথা বলেনি ?'

—'না।' হিয়া খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'তাহলে আপনি একবার বেলেঘাটার বাড়িতে নিশ্চয় আসতে পারতেন।'

—'হয়তো পারতাম।' বিজয় জবাব দিল। মৃদুকণ্ঠে বলল,—'এখানে আসতে আমার ইচ্ছে করত বৌদি। কিন্তু আপনি তো সবই জানেন।'

বিজয় কী বলতে চায় হিয়া তা বুঝতে পারল। অনেক সময় এমন হয়। কোনো কথা শুনলে চট করে তার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। বরং সেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হয়। সম্ভবত হিয়া তেমনি চিন্তা করছিল।

বিজয় নিজেই বলল, —'আপনাকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে গেছি। তাই নিয়ে রতীশ অনেক কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেছে।'

হিয়া চোখ পাকিয়ে বলল,—'তার পরিবারকে তো আপনি ঘর থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে যান নি। চোরাচালানের কারবার করত। তাই ব্যাপারটা গোপন রাখতে বউকে বাড়ি থেকে দু-চার ঘণ্টা সরানোর প্রয়োজন ছিল। সেই কাজে আপনার সাহায্য নিয়েছে।'

বিজয় ধীরে ধীরে বলল,—'প্রথমে কিন্তু ওর কথায় আমি রাজি হইনি। অনেকবার বলেছি ব্যাপারটা খুব অশোভন। চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হলে

তারা অন্য রকম ভাববে। তখন কী বলল জানেন? সে নাকি আমাকে বিশ্বাস করে।'

—'তারপর স্মাগলিং'এর কারবার বন্ধ হতেই সেই বিশ্বাস কর্পূরের মতো উবে গেল, তাই না?' হিয়া বাঁকা হাসল। বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে শ্লেষের সঙ্গে বলল,—'আসলে সন্দেহ করা আপনার বন্ধুর স্বভাব। স্ত্রীকে যখন বিশ্বাস করতে পারল না, তখন তাকে সন্দেহ করবে। এই তো কদিন আগে আমার ওপর নজরদারি করতে একজন স্পাই রেখেছিল।'

—'স্পাই?'

—'হ্যাঁ। সে একটা বেকার ছেলে। তাকে চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে আমার পিছনে লাগিয়েছিল। আমি কোথায় যাই, কার সঙ্গে মেলামেশা করি, সেই খবর আপনার বন্ধুকে রিপোর্ট করত।'

—'তাই নাকি?' বিজয় মুচকি হাসল। বলল,—'ছেলেটা নিশ্চয় আপনার নামে সাতখানা করে লাগিয়েছে?'

—'না।' হিয়া মাথা নাড়ল। বলল,—'ধরা পড়তেই সে আমার কাছে সব স্বীকার করল। কোনোদিন কারো সঙ্গে আমাকে সে ঘুরতে দেখেনি। একা একা সিনেমা—থিয়েটার গেছি, তা দেখেছে। গড়িয়াহাটাতে জিনিসপত্র কিনেছি। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, আপনার বন্ধু নাকি তার রিপোর্টে আদৌ বিশ্বাস করেনি।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বিজয় মুখ তুলে তাকাল। বলল,—'জানেন বৌদি, একদিন চন্দ্রকান্ত আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল। রতীশ নাকি আমাদের সন্দেহ করে। তার ধারণা শুধু সিনেমা—থিয়েটার নয়, আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা অন্যদিকে গড়িয়েছে। আমি সেদিন কম অবাক হই নি। কিন্তু চন্দ্রকান্ত যে মিথ্যে বলেনি কয়েকদিন না যেতেই তার প্রমাণ হাতেনাতে পেলাম। কী একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে রতীশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতেই সে হঠাৎ কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে বলল,—'আমি নাকি আপনাকে'। বাকিটুকু বলা যায় না ভেবেই বিজয় নিজেকে কোনোমতে সংযত করল।

আশ্চর্য! হিয়া রাগল না। কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'যার যা স্বভাব সে তাই মনে করে। এক ধরনের লোক আছে মানুষকে বিশ্বাস করে তাদের সুখ হয় না। বরং সন্দেহ করলে আনন্দ পায়। আপনার বন্ধু সেই জাতের। কাজেই স্ত্রীকে সে সন্দেহ করে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে পাঁচজনের কাছে সে কথা বলে বেড়ায়। আর চন্দ্রকান্তবাবুর কথা ছেড়ে দিন। আমার তো মনে হয় উনি বেশ চালাক, ধূর্তও বলতে পারেন। যে কোনো উপায়েই হোক, আমার

স্বামীর ওপর ওর যথেষ্ট প্রভাব। বোধহয় তার গোপন কারবারের হলুক-সন্ধান চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে লুকোন নেই। তাই তার মুখ চাপা দিতে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসার সিকি অংশীদার করতে হয়েছে।'

বিজয় বলল,—'ওসব কথা থাক বৌদি। কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

—'এত ভণিতা কিসের?' হিয়া ফিক করে হাসল। ফের বলল,—'আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি তৈরি।'

বিজয় জিজ্ঞাসা করল,—'হঠাৎ এত সিনেমা দেখার বাতিক হ'ল কেন? হপ্তায় অন্তত তিনদিন ছবি দেখতে আসেন।'

—'কী করব?' হিয়া ম্লান হাসল। বলল,—'ছবি না দেখলে যে সময় কাটে না। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে মুখ বুজে বসে থাকতে কার ভালো লাগে?'

অকপট জবাব। বিজয় তাই চুপ করে রইল।

হিয়া ফের বলল,—'আমাদের পাড়াটা তো দেখলেন। ওখানে কার সঙ্গে মেলামেশা করি বলতে পারেন? মেয়েমহলে স্রেফ পরচর্চা। আর বেশীর ভাগ লোকই বড় গরীব। শুধু হীরালালবাবুর অনেক পয়সা,—দুখানা গাড়ি, মস্ত বাড়ি।'

বিজয় মন্তব্য করল,—'রতীশ বোধহয় সারাদিন ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা নিয়ে মেতে আছে?'

—'তার কথা বাদ দিন। তবে শুধু ব্যবসা নিয়ে বললে ভুল হবে, সে বোধহয় নিজেকে ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে শেখেনি। আর ব্যবসা তো অনেকেই করে। কিন্তু ঘর-সংসার কিম্বা স্ত্রীর জন্য তারাও খানিকটা সময় রাখে। আপনার বন্ধু এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ। আবুধাবি থেকে ফিরে এসে কেন যে তার বিয়ে করতে সাধ হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় নিজেই জানে না।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ। কয়েক সেকেণ্ড পরে হিয়া ফের বলল,—'সকালটা কোনোরকমে কেটে যায়। কিন্তু বেলা বাড়তে শুরু করলেই আমি যেন আর ঘরে টিকতে পারি না। আপনার বন্ধু কোনোদিন দুপুরে খেতে আসেন, কোনো-দিন কাজ ফেলে আসা হয় না। বাড়িতে এলেও ঘণ্টাখানেক পরেই আবার বেরিয়ে যান। আর তারপরেই সমস্ত ফ্ল্যাটটা আমার কাছে খুব নির্জন আর ফাঁকা হয়ে আসে। বেলা দুটো বাজলেই আমি রাস্তায় নেমে পড়ি। বাসে উঠে ধর্মতলায় চলে আসি। ইচ্ছা হলে ছবি দেখি। স্রেফ সময় কাটাতে এক-একটা বই তিনবার-চারবারও দেখেছি। যেদিন সিনেমা যেতে ভালো লাগে না, সেদিন এমনি হেঁটে বেড়াই, কিম্বা গড়িয়াহাটা চলে যাই। সেখানে

কেনাকাটি করি। রাত আটটার আগে প্রায় বাড়ি ফেরা হয় না।'

বিজয় প্রশ্ন করল,—'সিনেমা হলে বসে একা একা ছবি দেখতে আপনার ভালো লাগে বৌদি ?'—

'ভালো না লাগলেও উপায় নেই। তবু সময় কাটে। চোখের সামনে একটা ছবি থাকে,—নায়ক-নায়িকা কথা বলে, হাসে। কখনও গান গায়। সিনেমা হলে বসে তাই দেখি।'

বিজয় শুনছিল। সাগ্রহে, নিবিষ্ট মনে। হিয়ার জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। বেচারী। বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো একা।

কী মনে হতে হিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, আপনার তো বুধবার অফ-ডে। তাই না ?'

—'হ্যাঁ, ওই দিন আমার ছুটি।' বিজয় উত্তর দিল।

—'তাহলে বুধবার দিন আসুন না। দুপুর বেলা, এই ধরুন বেলা আড়াইটে নাগাদ মেট্রোর সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভালো ছবি দেখে আমি টিকিট কেটে রাখব। আর যদি সিনেমা দেখতে না চান তাহলে বেড়াব। গঙ্গার ধারে আউট-রাম ঘাটের কাছে কিম্বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে কোথাও গিয়ে বসব।' হিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন ভাবল। ফের বলল,—'সত্যি, আজকাল একা ঘুরে বেড়াতে আর ইচ্ছে করে না। কেবলি মনে হয়, যদি কারো সঙ্গে দেখা হ'ত। এই আপনার মতো কেউ,—আজ যেমন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

বিজয় কয়েক সেকেণ্ড নীরবে চিন্তা করল। হিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'বুধবার হয়তো আমি আসতে পারি। কিন্তু খবরটা যদি রতীশের কানে যায়, তাহলে কী হবে ?'

—'ছাই হবে।' হিয়ার ঠোঁটে উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বলল,—'খবরটা কানে গেলে তার যা ইচ্ছে হয় মনে করবে। আমি কারো তোয়াক্কা করি না।' ফের কেমন অদ্ভুত হেসে বিজয়কে লক্ষ্য করে বলল, —'তবে আপনি বোধহয় বন্ধুকে একটু ভয় পান।'

—'না-না।' বিজয় তাড়াতাড়ি কথাটা অস্বীকার করতে চাইল। মুখখানা ঈষৎ বিষন্ন করে বলল,—'ভয়টা ঠিক ওকে নয় বৌদি। আসলে ওই চন্দ্রকান্তটা হ'ল শয়তান। আমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে এমন কুৎসা রটিয়ে ছাড়বে যা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়।'

—'চন্দ্রকান্তবাবু এঁসব কথা বলতে সাহস পান কেন বলতে পারেন ?' হিয়া প্রশ্নটা ফের বিজয়ের দিকে ছুড়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে নিজেই বলল,—

'স্বামী যদি স্ত্রীকে সন্দেহ করে তাহলে আর পাঁচজনে তার সুযোগ নেয়। রঙ চড়িয়ে নানা অপবাদ দিতে মজা পায়।'

শো আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। রিস্টওয়াচের দিকে এক নজর তাকিয়ে হিয়া উঠে দাঁড়াল। তাড়া দিয়ে বলল,—'চলুন, গল্প করতে গিয়ে একেবারে খেয়াল ছিল না। বই এখুনি আরম্ভ হবে।'

তা ঠিক। হলে ঢোকার মুহূর্তেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে এলো। তাদের দেখে টর্চের আলো ফেলে একজন লোক নিকটে এসে দাঁড়াল। পথ-প্রদর্শকের মতো সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট আসনের কাছে পৌঁছে দিল।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হিয়া ফিস ফিস করল,—'আজ ছবি দেখতে আমার দারুণ ভালো লাগছে।'

—'কেন?' বিজয় ঈষৎ হাসল।

—'মনে হচ্ছে সেই আগের মতো দুজনে এসেছি।' পরক্ষণেই কপট বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,—উঃ! আপনার ওপর এমন রাগ হচ্ছে।'

—'রাগ? কেন?'

—'কেন আবার? এতদিন ডুব দিয়ে রইলেন বলে। জানেন, একা হলে বসে ছবি দেখলে নিজেকে কী রকম যেন অসহায় লাগে।'

পিছন থেকে কে বলল,—'দাদা আস্তে'। আর একজন রসালো মন্তব্য জুড়ে দিল,—'বাড়ি গিয়ে হবে, রাত্তিরে।'

দাঁতে দাঁত চিপে হিয়া বলল,—'কী অসভ্য দেখেছেন।'

বিজয় কোনো মন্তব্য করল না হিন্দি ছবির প্রগলভ দর্শক এমনি হয়। সুরুচিপূর্ণ ভালো ছবি এদের জন্যই প্রায় দেশছাড়া হতে চলেছে। সে নীরবে ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের কাছে এনে ইঙ্গিতে হিয়াকে কথা বলতে নিষেধ করল।

সিনেমা হল থেকে বেরোতেই এক অঘটন। কখন যে প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমেছে দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি। পথে বেশ জল জমেছে,—ধর্মতলাতে যখন এই অবস্থা তখন আমহার্স্ট স্ট্রীট শেয়ালদার কাছে নিচু অঞ্চলে নিশ্চয় এক, হাঁটুর বেশী জল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া,...বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ গুড়-গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল।

বিজয় বলল,—'রাত্তিরে আরো বৃষ্টি হবে, বুঝলেন?'

—'তাই?' হিয়ার কণ্ঠস্বর ঈষৎ নার্ভাস শোনাল। সে বলল,—'এখন তো বাড়ি যাওয়া মুস্কিল।'

জল পড়ছিল। তবে জোরে নয়, প্রায় টিপ টিপ করে। আকাশের দিকে

তাকিয়ে বিজয় ফের বলল,—'এখনও বেশ মেঘ। বোধহয় ঘণ্টা দুই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। নইলে রাস্তায় এমন জল জমত না।'

হিয়া বলল,—'দু-ঘণ্টা বেশী বলছেন। ক'লকাতার যা অবস্থা, তাতে ঘণ্টা-খানেক বৃষ্টি হ'লেই হাঁটু অব্দি জল জমে।'

বিজয় এক পলক ঘড়ির দিকে নজর করে বলল,—'এমনি দাঁড়িয়ে লাভ নেই। চলুন, যে ভাবেই হোক শেয়ালদা পর্যন্ত যাই। তারপর আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি ট্রেন ধরব।'

বাড়ি ফেরার জন্য হিয়াও ব্যস্ত হয়েছিল। সত্যি, আকাশের চেহারা ভালো নয়। বে-শরম মেয়ে মানুষের মতো আলু-থালু, বে-আব্রু ভাব। এখনই যদি হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে তাহলে কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি থাকবে না। ক'লকাতার জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার এখন অন্তর্জলি যাত্রা। তাই পথ যদি অকস্মাৎ নদী হয়ে ওঠে, তাহলেও আশ্চর্য নেই।

হিয়ার ব্যাগের মধ্যে ভাঁজ-করা ছোট ছাতা ছিল। বর্ষাকাল, তাই ওটা সঙ্গে থাকে। রাস্তায় নেমে ছাতা খুলতেই বিজয় পরিহাসের সুরে বলল,—'তাহলে মাথাটা আপাতত বাঁচল।'

—'আপনিও আসুন না। ভিজছেন কেন বাইরে?'

—'ওর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে কিন্তু দুজনেই ভিজব।'

বিজয় পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথার ওপর রাখল। বৃষ্টি জোরে নয় ঠিক, তবু টিপ টিপ করে যা পড়ছে তাতেই জামা-কাপড় ভিজে স্যাঁতসেতে।

বাস নেই। ধর্মতলা স্ট্রীটে দুজনে একটা মিনিবাসে ঠেলেঠুলে উঠল। ভিতরে চাপাচাপি অবস্থা। বৃষ্টি কমতেই লোকজন বাড়ি ফিরবে বলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় দু-ঘণ্টার মতো অনেকে আটকা পড়েছিল। ট্রাম নিশ্চয় বন্ধ। বৃষ্টির তোড় দেখে বেশ কিছু বাসও হয়তো রুট থেকে তুলে নিয়েছে।

শেয়ালদ'তে নেমেই সমস্যা বাড়ল। জোড়ামন্দিরে যাবার একটা বাসও স্ট্যাণ্ডে নেই। অনেকক্ষণ নাকি আসে নি। রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু জল। হিয়ার সায়া-শাড়ি সব ভিজে সপ সপ করছে। ইতিমধ্যে আবার বৃষ্টি নামল। বড় বড় ফোঁটা। এখন স্রেফ দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। আরো জোরে বৃষ্টি হ'লে কাকভেজা করে ছাড়বে।

হঠাৎ সামনেই একটা মাটাডর গাড়ি এসে থামল। পিছনের মাল নেবার জায়গায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। গাড়ির হেল্পার ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে ডাকছিল, —'বেলেঘাটা, বেলেঘাটা।'

হিয়া হঠাৎ বলে উঠল,—'আমি এই গাড়িতে চলে যাই।'

—'আপনি একা ? মানে এদের সঙ্গে ?' মুহূর্তের জন্য বিজয়কে বেশ চিন্তিত দেখাল। ভ্রূ কুঁচকে ফের নিজেই বলল,—'চলুন, আপনাকে বরং পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর ট্রেন ধরব।'

বসন্তবিলাস রোডের মুখে দুজনে যখন গাড়ি থেকে নামল, তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে দমকা হাওয়া, বিদ্যুতের চমকানি। তাদের পাড়াটা চুপচাপ, নিঃস্তব্ধ। দু-পাশের ঘর-বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। গাড়িতে দাঁড়িয়ে দুজনেই বেশ ভিজছে। রাস্তা পেরিয়ে হিয়া বলল,—'পা চালিয়ে আসুন। ভিজে জামা-কাপড়ে আর কিছুক্ষণ থাকলে নির্ঘাত নিমোনিয়া হবে।'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ছোঁড়া চাকরটার নাম ধরে সে ডাকাডাকি শুরু করল। রান্নার মেয়েটি নিশ্চয় নেই, বৃষ্টি-বাদলা দেখে তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে রওনা দিয়েছে। ছেলেটা মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চেঁচামেচি শুনে চোখ কচলাতে কচলাতে এসে কোলাপসিবল গেটের দরজা খুলে দিল।

হিয়া বাড়ির ভিতর পা দিতেই বিজয় বলল,—'আমি আর দেরি করব না বৌদি। আকাশের অবস্থা দেখছেন,—'এরপর হয়তো ট্রেনই যাবে না।'

মুখ ফিরিয়ে হিয়া বলল,—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাবেন ?'

—'না গিয়ে তো উপায় নেই।' স্পষ্ট করে না বলেও বিজয় কী যেন বোঝাতে চাইল।

—'কার উপায় নেই ? আপনার ?' সিক্ত বসনেও হিয়া কেমন রহস্যময়ী হয়ে উঠল। বিচিত্র হেসে বলল,—'বাড়িতে বুঝি ভাতের থালা সাজিয়ে বসে থাকবে ?'

—'না, তেমন কেউ নেই।' ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রতীশের আর পরিহাস করতে ইচ্ছে করল না। দু-এক সেকেণ্ড পরে বলল,—'থাকলে আপনি অনেক আগেই জানতে পারতেন।'

হিয়া তার পাশ কাটিয়ে দু-পা এগিয়ে গিয়ে কোলাপসিবল গেটের দরজাটা টেনে তালা ঝুলিয়ে দিল। ফের আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে বলল,—শুকনো জামা-কাপড় এনে দিচ্ছি। ভিজেগুলো ছেড়ে তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে ফেলুন। বাড়িতে যখন কেউ নেই, তখন অসুখ করলে কে দেখবে ?'

রতীশের কাপড়, গিলে-করা পাঞ্জাবি সব আলমারিতে থাকে। হিয়া তাড়াতাড়ি বের করে চাকরটাকে ডেকে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একটা কাচা তোয়ালে দিতেও ভুল করল না।

মিনিট পাঁচ পরে নিজেও জামা কাপড় পাল্টে সে বাথরুম থেকে বেরোল।

চুলটা ভিজে গিয়েছিল, তাই পিঠের ওপর এলো করে ছড়ানো। এখন পাখার হাওয়ায় যতটুকু শুকোয়।

অন্য ঘরে চেয়ারে বসে বিজয় যেন আকাশ পাতাল চিন্তা করছিল।

এক নজর মানুষটাকে দেখে হিয়া বলল,—'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছেন?'

—'না, মানে ভাবছিলাম।'

—'কী ভাবছিলেন? খবরটা যদি বন্ধুর কানে যায়?'

বিজয় একবার তাকাল। কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারল না।

হিয়া নিজেই বলল,—'এখন মনে হচ্ছে ঝড়-জলের মধ্যে আপনাকে বিদেয় করে দিলেই ভালো ছিল।' ফের যেন উত্তেজনার ঝোঁকে বলে উঠল, —'আচ্ছা, আপনার কী একবারও মনে হ'ল না যে এমন দুর্যোগের রাত্তিরে জলে ভিজে কাউকে যেতে দেওয়া খুব অন্যায় হ'ত? শুনেছি বিপদে পড়লে অজানা-অচেনা মানুষও গৃহস্থের কাছে আশ্রয় চায়। আর আপনি—'

বিজয় দুর্বল কণ্ঠে বলল,—'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু রতীশ কী ভাববে জানেন? ঝড-জল, দুর্যোগ, এসব মিথ্যে অজুহাত। আসলে সে বাড়ি নেই জেনেই একটা কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে আমি রাত্তিরে ফের এসেছিলাম।'

—'স্ত্রীকে যে সন্দেহ করে, সে নিশ্চয় তা ভাবতে পারে।' হিয়া মুখখানা বেশ গম্ভীর করে রইল। ফের দাঁতে দাঁত চিপে বলল,—'তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওকে একটা শিক্ষা দিই।'

বিজয় চোখ তুলে তাকাতেই হিয়া কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'যা মিথ্যে তাকেই যখন সত্যি বলে ভাবে, তখন সে রকম একটা কিছু ঘটলে নিশ্চয় দোষ নেই।'

বিজয় চুপ। বন্ধুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে আর কথা বাড়াতে সাহস করল না।

রিমঝিম সুরে একটানা বর্ষণ হচ্ছিল। জানালা খুলে একবার তাকিয়ে বিজয়ের মনে হ'ল সব সাদা। পথঘাট নিশ্চয় জলের তলায়। ভাগ্যিস সে গোঁয়ার্তুমী করে বেরিয়ে পড়েনি। তাহলে জলে ভিজে হয় তো সমস্ত রাত্তির ইস্টিশানে পড়ে থাকতে হ'ত।

খাওয়ার পর রতীশের ঘরে হিয়া তার শয্যা রচনা করল। খাটের ওপর নিভাঁজ সুন্দর একখানি চাদর বিছিয়ে ঝেড়েঝুড়ে মশারী টাঙাল। মুচকি হেসে বলল,—'আজ রাত্তিরটা বন্ধুর বিছানাতেই কাটিয়ে যান। এত যখন সন্দেহ তখন মিছিমিছি অন্য ব্যবস্থা করি কেন?'

বিজয় একটা ঢোক গিলল। হিয়া কী ইঙ্গিত করছে? সন্দেহপ্রবণ স্বামীর ওপর এমনি ভাবে শোধ নিতে চায়?

সিলিং ফ্যানটা ফুল ফোর্সে ঘুরছিল। রেগুলেটারের নব্ ঘুরিয়ে হিয়া সেটাকে কিঞ্চিৎ হ্রাস করল। কী মনে হতে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল,—'আমি পাশের ঘরে আছি। মাঝখানের দরজাটা এ ঘর থেকেই বন্ধ করতে হয়, বুঝলেন?' ফের যাওয়ার আগে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তাহলে শুয়ে পড়ুন। রাত্তিরে প্রয়োজন হ'লে ডাকবেন।'

—'না, মানে প্রয়োজন হবে না।' বিজয় উঠে দাঁড়াল। তারপর বিছানার গদীটা পরখ করে বলল, —'যা নরম, এক ঘুমে সকাল হয়ে যাবে।'

—'বাই দি ওয়ে।' দরজার কাছে গিয়ে হিয়া আবার ফিরে দাঁড়াল। ঠোঁট টিপে ঈষৎ হেসে বলল —'আপনার বন্ধুর কিন্তু প্রয়োজন হয়। রাত দুপুরে হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে,—'বাকিটুকু আর না ব্যক্ত করেই সে পিছন ফিরে চলে গেল।

ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে বিজয় এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ ভয়-ভয় অনুভূতি তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার চোখ মুখের ভাব এবং আকস্মিক পরিবর্তন নিশ্চয় হিয়ার নজর এড়ায় নি। এই ঘন ঘোর বর্ষার রাতে মন হঠাৎ বিপথগামী হ'লে বিজয়ের কিছু করবার ছিল না। আর হিয়া তো তাকে খোলাখুলি আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। ইচ্ছে করলে সে দরজা খুলে নিশ্চিতে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের ঢাকনা খুলে বিজয় ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেতেই শরীরটা ঈষৎ শীতল মনে হ'ল। পরক্ষণেই সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

পাশের ঘরে হিয়ার দুই চোখে জল নয়, ··· জ্বালা। বালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। একটু আগে বিজয়কে যা বলে এসেছে, হিয়া তাই ভাবছিল। কথাটা পুরো মিথ্যে নয়। কিছুদিন আগেও রাত দুপুরে রতীশ হঠাৎ দরজা ঠেলে এই ঘরে ঢুকত। কোনো প্রস্তুতির অপেক্ষা না করেই প্রায় জানোয়ারের মতো তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। একটা ধস্তাধস্তি, কখনও সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন সকালে মিস্ত্রী ডেকে দরজাটা এদিক থেকেও বন্ধ করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। এখন মাঝরাত্তিরে বাইরে দাঁড়িয়ে রতীশ শুধু অনুনয় করে। দরজা খুলে দিতে মিনতি জানায়। কিন্তু হিয়া শক্ত, মন টলে না। বরং বিছানায় শুয়ে স্বামীকে তার ভীষণ বোকা মনে হয়। যে পুরুষ ভালবাসতে জানে না, কোনো মেয়ে কী স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মদান করতে পারে?

খাট থেকে হিয়া নেমে দাঁড়াল। শ্লথ ভঙ্গি। দেহে শাড়ি-জামা-অন্তর্বাস কিছু নেই। শুধু একটা আলগা নাইটি পরনে। ধীরে ধীরে পা ফেলে সে এগিয়ে এলো। আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। রতীশ থাকলে সে নিশ্চয় দরজাটা এদিক থেকে বন্ধ করে দিত। আজ ইচ্ছে করেই তা করেনি। এই মুহূর্তে বিজয় যদি দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে? কিন্তু পাশের ঘরে তো সব চুপ, সাড়াশব্দ নেই। আলো নেভানো, বিজয় নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

তৃষিত চোখে হিয়া আর একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল।

না, রতীশ মানুষ চিনতে শেখেনি। নইলে এমন ভদ্র, সংযমী পুরুষকে কেউ কুৎসিৎ সন্দেহ করতে পারে?



খুব ভোরে বিজয় এসে দরজায় টোকা দিল। রাত্তিরে কখন বিষ্টি থেমে গেছে কেউ টের পায় নি। আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। দু-একটি কাক ডেকে উঠে ফের চুপ করে গেল।

অনেক রাত্তিরে কখন চোখ জড়িয়ে এলো হিয়ার তা মনে নেই। কস্মিন কালেও সে ভোরে ওঠে না। রোজই ছোঁড়া চাকরটা তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। হিয়া যখন বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যায়, তখন প্রায় ছটা বাজে।

দরজায় অন্তত মিনিট চার-পাঁচ ধরে টোকা মেরেও কোনো ফল হ'ল না। ভিতরে হিয়া তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উপায় না দেখে কপাটে একটু জোরে ধাক্কা দিতেই সেটা হাট করে খুলে গেল। বিছানার দিকে নজর পড়তেই বিজয় তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। ফোম রবারের নরম গদীর ওপর হিয়া টান-টান শুয়ে। বাঁ হাতটা পাশবালিশের গায়ে, ডান হাতটা বিছানায়। পাতলা গোলাপী রঙের একটা নাইট পরনে। ঘুমের ঘোরে সেটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে। অনাবৃত, সুডৌল পা দুটির দিকে একবার তাকিয়েই বিজয় পিছন ফিরল।

ঠিক সেই মুহূর্তে হিয়া চোখ খুলল। ঘরের মধ্যে সবুজ নাইট ল্যাম্পের আলো। বারান্দায়, ওপাশে গাছের ডালে এখনও আবছা অন্ধকার। বন্ধ

দূরে পূবের আকাশটা সামান্য একটু লাল হয়ে উঠেছে।

মানুষটাকে পিছন ফিরে অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হিয়া তাড়াতাড় উঠে বসল।

বিজয় মুখ না ফিরিয়ে কৈফিয়ত দেবার ঢঙে জানাল,—অনেকক্ষণ টোকা দিলাম, তা আপানার ঘুম ভাঙেনি। শেষে কপাটে একটু জোরে ধাক্কা দিতেই ওটা খুলে গেল।'

হিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটি ঈষৎ উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল।

বিজয় ফের বলল,—'কাল রাত্তিরে বোধহয় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছলেন।'

ভুল নয়, ওটা ছল। কথাটা সত্যি হলেও একজন পুরুষমানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তা বলা যায় না।

দরজাটা টেনে বন্ধ করে বিজয় ফের অন্য ঘরে চলে গেল। হিয়া সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখল। চিরুনী বুলিয়ে চুল-টুল ঠিক করল। ফের নাইটি ছেড়ে শাড়ি-জামা পরে আবার এ ঘরে এলো।

জামা গায়ে দিয়ে বিজয় আগেই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে। হিয়াকে দেখে বলল —'বৌদি, তাহলে আসি।'

—'ওমা! তাই কখনও হয়? দাঁড়ান, চা করতে বলি।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিজয় তাকে নিরস্ত করল। বলল,—'পাঁচটা প্রায় বাজে। জানেন তো, বজবজের ট্রেন ঠিক এক-দেড় ঘণ্টা পরে। সাড়ে পাঁচটার গাড়িটা মিস করলে আর ফার্স্ট শিফটে ডিউটি করা যাবে না। তার মানে পুরো দিনটা মাটি।'

হিয়া আর বাধা দিল না। 'তাহলে স্টেশনে গিয়ে চা খাবেন।' ঘর ছেড়ে বারান্দায় এক চক্কর ঘুরে এসে ফের বলল,—'এখানে তো জল-টল জমে নেই। দেখুন, শেয়ালদাতে গিয়ে আবার এক হাঁটু জল কিনা।'

জুতো পরার আগে বিজয় হঠাৎ বলল,—'রাত্তিরে এখানে ছিলাম, একথা আর রতীশকে বলবেন না। ও তার একটা অন্য অর্থ করবে।'

—'যদি তাই করে. তাতে আপনার কী আসে যায়?' হিয়া তাচ্ছিল্যেরসঙ্গে জবাব দিল। ফের বলল,—'যার নোংরা মন সে নিশ্চয় অন্যের গায়ে কাদা ছুড়বে।'

—'মিছিমিছি ওকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই।' জুতোয় পা গলিয়ে বিজয় হাসল।

মুহূর্তে হিয়ার ঠোঁটে কেমন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। দু-এক সেকেণ্ড বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'আমি ভাবছি ফিরে এলেই ওকে আপনার কথা বলব। সেই আগের মতো দুজনে ছবি দেখতে গেছি। তারপর ভীষণ জল-বৃষ্টি। তাই বাড়ি পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। আর অমন জল-ঝড়ে কী একটা মানুষকে ছেড়ে দেওয়া যায়? তাই রাত্তিরটা আপনি এখানেই ছিলেন।'

বিজয় ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'কিন্তু বৌদি, এর ফল তো সাঙ্ঘাতিক হতে পারে।'—

'হলেই বা?' হিয়ার যেন সতর্ক হবার কোনো গরজ নেই। মুচকি হেসে ফের বলল,—'বন্ধুকে কিন্তু আপনার বেশ ভয়, তাই না বিজয়বাবু?'

—'ভয় ওকে নয় বৌদি,' বিজয় তার মুখের দিকে তাকাল।

—'তবে?'

—'ভয় করি কলঙ্ককে, মিছিমিছি সেই কলঙ্ক তো আপনাকে স্পর্শ করবে।'

—'উপায় তো নেই,' হিয়া ম্লান হাসল। ফের দুঃখ করে বলল,—'স্বামী যাকে সন্দেহ করে সে তো আগেই কলঙ্কিনী সেজে বসে আছে।'

জুতোর স্ট্র্যাপ বেঁধে বিজয় সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। ছোঁড়া চাকরটা করিডোরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হিয়া ইচ্ছে করেই তাকে ডাকল না। নিজেই কোলাপসিবল গেটের চাবি খুলে বিজয়কে এগিয়ে দিল।

রাস্তা ফাঁকা। গত রাত্তিরে অমন ব্যাঙ ডাকা বিষ্টি। বাইরে বেশ ঠাণ্ডার আমেজ। লোকজন নেই দেখে হিয়া রীতিমত আশ্বস্ত বোধ করল। এই কাকডাকা ভোরে একজন উটকো লোককে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখলে পাড়ায় পাঁচ রকম কথা হয়। বিশেষ করে মেয়েমহলে এই নিয়ে কানাঘুষো, কখনও রসালো আলোচনা চলে। তাতে অবশ্য হিয়ার কিছু যায় আসে না। বসন্ত বিলাস রোডের কোনো মেয়ের সঙ্গে তার মাখামাখি নেই। মাঝে মধ্যে পিতু কিম্বা তার মা এসে বসে। দুটো গল্প করে চলে যায়। তার সম্বন্ধে কোথায় কী আলোচনা হ'ল হিয়া সেটা গ্রাহ্য করে না।

নিচে নেমে বিজয় বলল,—'আপনি আবার কেন রাস্তা পর্যন্ত এলেন?'

—'এমনি।' হিয়া মৃদু হাসল। বলল,—'এক কাপ চা পর্যন্ত খেলেন না। তাই খুব খারাপ লাগছে।'

—'তাহলে যে ট্রেন মিস করতাম।' বিজয় পরিহাসের সুরে কথা কইল।

হিয়া বলল,—'আমার সেই কথাটা মনে আছে?'

—'কোন কথা বলুন তো?'

—'বারে! বেশ মানুষ কিন্তু আপনি। গতকাল বলেছি না? সব ভুলে গিয়েছেন।' হিয়া যেন অভিমান করল।

—'বেশ তো, আর একবার না হয় বললেন।' বিজয় হাসল।

দৃষ্টিতে একটা নরম স্পর্শ এনে হিয়া বলল,—'বুধবার তো আপনার অফ-ডে, তাই না?'

—'হ্যাঁ, ওই দিনটা আমার ছুটি!' সে উত্তর দিল।

—'তাহলে বুধবার আসবেন। ওই মেট্রোর সামনে, বেলা দুটো কিম্বা আড়াইটে নাগাদ। টিকিটের জন্য চিন্তা নেই। ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে আমি ঠিক জোগাড় করে নেব। আর ভালো বই না থাকলে কোথাও বেড়াব,—যেখানে আপনার ইচ্ছে।'

এই সুন্দর ভোরবেলায় এমন একটি মিষ্টি অনুরোধ শুনলে মনটা লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো কোথায় ভেসে চলে যায়। কিন্তু তবু বিজয় যেন মহা চিন্তায় পড়ল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হিয়া বলল,—'কী ভাবছেন? ফের যদি কলঙ্ক রটে?'

—'আপনার জন্য খুব কষ্ট হয় বৌদি।' কথাটা বলেই বিজয় মুখ নিচু করে রইল।

হিয়া বলল,—'আপনার বন্ধু যাই মনে ভাবুক, কিন্তু সত্যি আমার কোনো সঙ্গী নেই। তাই মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। চৌরঙ্গীর মোড়ে ওই অগুনতি মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয়। আর তখন ভীষণ খারাপ লাগে।'

ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বিজয় ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল,—'চলি বৌদি আর দেরি করলে নির্ঘাত ট্রেন ফেল।'

—'হ্যাঁ আসুন। তবে আপনার সঙ্কোচ থাকলে জোর করব না। আর যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে আসবেন।—বুধবারে, কেমন?' হিয়ার নরম দৃষ্টি যেন অনুরোধ হয়ে পৌঁছল।

খানিকটা হেঁটে বিজয় আবার পিছন ফিরে তাকাল। হিয়া তখনও দাঁড়িয়ে, বিজয় ঈষৎ হাত নাড়ল। ফের সামনে তাকিয়ে দ্রুত পা ফেলে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

পিতুর মা কাজে যাচ্ছিল। সবে সকাল হয়েছে। ঘড়িতে কটা বাজল পিতুর মা অত খোঁজ রাখে না। শুধু রেডিও শুরু হলেই তাকে বেরিয়ে পড়তে

হয়। ফুলবাগানে যে বাড়িতে কাজ করে সেখানে পৌঁছতে মিনিট পনের লাগে। বাড়িটা সমরেন্দ্রনাথ দাস মশায়ের। আগে কী যেন একটা বড়ো অফিসে অনেক টাকা মাইনের কাজ করতেন। তারপর রিটায়ার করেছেন। সেও আজ দশ-বারো বছর হয়ে গেল। তিনতলা বাড়ি। নিচের তলায় দুটো দোকান, একটা ওষুধের আর একটা স্টেশনারী। দোতলায় চারখানা ঘর। একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পাঁচ-ছ বছর হ'ল বারো'শ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন। তিনতলায় এখন শুধু বুড়োবুড়ি থাকে। ছেলে-মেয়ে দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা থাকে আমেরিকায় আর ইতালিতে।

পিতুর মা হন হন করে হাঁটছিল। আজ বরং একটু দেরি হয়ে গেল। মোহনের বউটা কাল রাত্তির থেকে রাগ করে খায় নি। পিতু অনেক সাধাসাধি করেছিল। কিন্তু এ সব আজকালের মেয়ে,—ভাঙবে তবু মচকাবে না। অথচ গোঁসা করে না খাওয়ার মতো এমন কিছু ঘটে নি। আজ কমাস ধরেই তো মোহনের কাজকর্ম নেই। বিয়ে করবার আগে একটা ব্যাগের কারখানায় চাকরি পেয়েছিল। বছর খানেক বেশ রবরবা। বাড়িতে টাকাকড়ি দিত,—ভাই বোনেদের জামা প্যাণ্ট। একবার পিতুর মায়ের জন্য ভালো শাড়ি কিনে এনেছিল। তারপর সেই কোম্পানীতে কী সব গণ্ডগোল শুরু হ'ল। আর নাকি লাভ হয় নি। দিন দিন ক্ষতি সামলাতে না পেরে কোম্পানী একদিন লাটে উঠল। তা সেই থেকে ছেলেটা বেকার। বউ নিয়ে বাপের ঘাড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করছে। টানাটানির সংসারে জিভকে সব সময় সংযত রাখা কঠিন। আর অভাব বড়ো কুৎসিত ব্যাধি। একবার ধরলে সহজে যায় না। রাত্তিরে অমন ঝড় জল। ঘরের চালে টিন ফুটো। তাই দিয়ে জল পড়ছিল। সমস্ত ঘর-দোর ভেসে গিয়ে সে এক অথান্তর অবস্থা। সামলাতে না পেরে পিতুর মা এক সময় কপাল চাপড়ে বলেছিল—আমার ভাগ্যি। নইলে অমন জোয়ান ছেলে আর ধুমসো বউ ঘাড়ে বসে বসে দুবেলা খায়। মাস গেলে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা ঘরে আনলেও কত সুরাগ। তা সে চেষ্টা-চরিত্তির আছে বলে তো মনে হয় না।

তাইতেই বউয়ের রাগ। তা পিতুর মা তো কিছু অন্যায় বলে নি। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। আসলে ওটাই তো সত্যি। কিন্তু আশ্চর্যি! তাই নিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোকের কী রাগ। পিতু তো সামনে এসে মুখ নাড়া দিয়ে গেল। বলল,—'ও কি মুখের ভাষা হয়েছে তোমার? আর বউ যদি সংসারের ছত্রিশ কুড়ি কাজ দুহাতে না সামলাত, তাহলে কী হাল হ'ত একবার ভেবে দেখেছ? আর বসে কেউ খায় না। একজন বাইরে কাজ করে দুটো পয়সা

আনে আর একজন ঘরে বসে তাই দিয়ে সংসার সামলায়। তাছাড়া বউ তো রাগ করে ছু-মাস বাপের ঘরে ছিল। তখন ক'টা দিন তোমায় বাবুর বাড়িতে কামাই করতে হয়েছে, তা একবার মনে করে দেখো।'

পিতুর মা চুপ করে গিয়েছিল। কোনো জবাব দিতে পারে নি। ভাতের খোঁটা গলগ্রহকেও দিতে নেই। কথাটা সে ছোটবেলা থেকে শুনেছে। কিন্তু কী করবে? মাথার ওপর ফুটো চাল। তাই দিয়ে জল পড়ছে। ঘরের মেঝে ভেসে একাকার। খানিকটা মাটির,—তার চকোলা উঠে এমন কুৎসিৎ চেহারা হয়। পিতুর মা আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি। সমস্ত জীবন তো এই একভাবে কাটল। গ্রীষ্মে টিনের চাল তেতে ওঠে। বাড়িতে টেঁকা দায়, আর বর্ষাকালে এই দশা। ভারী বিষ্টি হ'লে ঘরদোর ভেসে যায়। অথচ দেশ তো কত বদলাল। কী সব রব উঠল। গরীবী আর থাকবে না। ধুর! তাই কখনও হয়? পিতুর মা এখন শুনলে হাসে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে কত কথা বলে। এবার কী হলে যেন গরীব মানুষের ছুঃখ ঘুচবে। কিন্তু ওসব কথার কথা। পিতুর মা তা বেশ বোঝে। তবে হ্যাঁ, এই বসন্তবিলাস রোড ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়লেই যেন আর এক পৃথিবী। সেখানকার মানুষের হাতে ব্যবসা, কণ্ট্রাক্টরি, বড়ো চাকরি। তারা এসেই ভিত কেটে ইট গেঁথে বাড়ি তুলল। আর ফুলবাগান যেতে সি. আই. টি. রোডের ছুপাশে তো অট্টালিকা। কাজে যাবার সময় পিতুর মা বার বার তাকিয়ে ছাখে।

পিতু ফের বলল,—'তা তুমি যদি অমন কথা আবার বল তাহলে বউকে আমি টুনি ল্যাম্পের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাই। সেখানে ফ্করনে কাজ পাবে। মাস গেলে ষাট-সত্তর টাকা তো হেসে খেলে ঘরে আনবে।'

পিতুর মা সে কথার উত্তর দেয় নি। ঘরের বউ কারখানায় কাজ করতে যাবে, এ আবার কেমন কথা? পিতু যখন প্রথম ফ্যাক্টরিতে যাওয়া শুরু করল, তখনই কানাঘুষো শুরু হয়েছিল। ভুবনপিসী তো একদিন বাড়ি এসে বলে গেল, —'তা তোমার মেয়ের বেশ জিদ আছে পিতুর মা। বরের মুখের ওপর কেমন নাথি মেরে কারখানার খাতায় নাম লেখাল।' তবে পিতুর স্বভাব ভালো, কোনো বেচাল নেই। তাই মেয়েমহলে এই নিয়ে আর আলোচনা জমেনি। কিন্তু বউ যদি আবার পিতুর সঙ্গে কাজে বেরোয় তাহলে তো কানপাতা দায় হবে। ওই ভুবনপিসী কিম্বা জগমাসী বলবে,—'ছি-ছি! কচি বউটাকে রোজগার করতে কারখানায় পাঠিয়েছে গা।' তারপর এই ঘরদোর কে সামলায়? সকাল হ'লেই পিতুর মা তো সেই ফুলবাগানে যাবে। তাহলে চা-জলখাবার, রাঁধাবাড়া, ছিষ্টির

কাজ কার ঘাড়ে চাপাবে ?

বড় রাস্তার কাছে যেতেই হীরালাল তার পথ আগলাল। আদুড় গা, পরনে একটা গামছা। প্রত্যুষে হীরালালের ওই সাজ। হাতে দাঁতন কাঠি নিয়ে সে বোধহয় গাড়ির ক্লিনারের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার নিজের গাড়ির ড্রাইভার বাড়িতেই থাকে। সকাল হলেই সে গাড়ি দুটো গ্যারেজ থেকে বের করে আনে। ক্লিনার এসে গাড়ি ধোয়, মোছে। ফুলকাবে আর চাকায় বালতি বালতি জল ঢালে। গাড়ির ফুলকাব কিম্বা হাফকাবটা হীরালাল প্রায় বদলায়। মেয়েমানুষের নতুন ডিজাইনের গয়নাপ্রীতির মতো চকচকে আর ঝকঝকে ফুলকাবের ওপর তার বেশী নজর। একটু পুরানো হলেই তাই ওগুলোকে বাতিল করে। গাড়ি নিয়ে মল্লিক বাজারে চলে যায় সেখান থেকে ফের পছন্দসই নতুন জিনিস কিনে আনে।

হীরালাল সামনে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে পিতুর মা শুধোল,—'কি গো হীরে-দাদা, কিছু বলবে ?'

চাপাগলায় হীরালাল তার মনোভাব ব্যক্ত করল,—'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম।'

—'কী কথা ?' পিতুর মা মুখ উঁচু করে তাকাল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে হীরালাল বলল,—'কাল রাত্তিরে তোমার হিয়াদিদির বাড়িতে একজন ভদ্রলোক ছিলেন ?'

—'ওমা! এ আবার কেমন ধারা কথা ? দাদাবাবু বাড়িতে নেই, তা ভদ্রলোক কেমন করে এসে থাকবে ?' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলেই পিতুর মায়ের যেন কিছু মনে পড়ল। ফিক করে হেসে বলল,—'হ্যাঁ, একজন লোক দাদাবাবুর খবর নিয়ে কাল এসেছিল। তা সে তো দুপুর বেলায় খেয়েদেয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরবে বলে হিয়াদির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

—'কেমন দেখতে তাকে ?' হীরালাল শুধোল।

পিতুর মা বলল,—'চমৎকার চেহারা। ফর্সা রঙ। কোঁকড়া চুল। গায়ে একটা সবুজ জামা আর হলুদ রঙের প্যাণ্ট। বয়সও বেশী মনে হয় না। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে।'

—'উনিই তো কাল রাত্তিরে তোমার হিয়াদির বাড়িতে ছিলেন।' হীরালাল ফিসফিস করল।

পিতুর মা গালে হাত রেখে অবাক হবার ঢঙ করল। 'বল কি গো হীরেদাদা ? তা তুমি এ খবর কেমন করে পেলে ?' সে প্রশ্ন করল।

—'আমি তো নিজের চক্ষে দেখলাম।' হীরালাল উত্তর দিল। ফের বলল,

—'আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। দু একটা কাক ডাকছে। জানালায় দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, বাবুটি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। খানিকটা গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল, হাত নাড়ল। আর তোমার হিয়াদি নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ না সে চোখের আড়াল হ'ল ততক্ষণ অমনি তাকিয়ে রইল।'

—'ছি-ছি। পাড়ায় ঘরে এ কি কাণ্ড।' পিতুর মা বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল। ফের চোখ টিপে বলল,—'দাঁড়াও না হীরেদাদা। কাজ সেরে ফিরে আসি। তারপর এই পংখী ছোঁড়াকে আড়ালে ডেকে সব কথা আমি ওর পেট থেকে টেনে বের করছি।'

পংখী ওই ছোঁড়া চাকরটার আটপৌরে নাম। পিতুর মা তাকে হিয়া চৌধুরীর বাড়িতে কাজে লাগিয়েছে। বাড়ির সব গোপন কথা তার মুখ থেকেই শোনা যায়। কর্তা-গিন্নির ঝগড়াঝাঁটি কখনও তুলকালাম কাণ্ড হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে রতীশ মদের বোতল নিয়ে বসে। রাত দুপুরে স্ত্রীর শয়নকক্ষের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কপাট খুলতে অনুনয় করে।

ভোর হতেই কর্তা লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়েন। শীত-গ্রীষ্মে এক অভ্যেস। শুধু পোশাকটা যা বদলায়। আর সময়ের কিঞ্চিৎ হেরফের হয়। শীতে গলাবন্ধ কোট, কান-ঢাকা টুপি, পায়ে জুতো মোজা। বেশী ঠাণ্ডা পড়লে একটা চাদর সঙ্গে নেন। হাতে সেই এক লাঠি। আর গ্রীষ্মে শুধু পাঞ্জাবি গায়ে। তখন সাড়ে পাঁচটা নয়, আরো ঘণ্টা খানেক আগেই দিবানাথ বেরিয়ে পড়েন।

বাড়ি ফিরতে ছটা, কখনও আরো দেরি হয়। দিবানাথ বেলেঘাটা লেকটা পুরো এক চক্কর দিয়ে আসেন। আগে লম্বা লম্বা পা ফেলে দিব্যি হাঁটতে পারতেন। এখন যত বয়স বাড়ছে, তত যেন দম কমে আসছে। দিবানাথ ঘড়ি ধরে দেখেছেন লেকটা এক চক্কর দিয়ে আসতে তার এখন আরো দশ বারো মিনিট বেশী লাগছে। এক একদিন আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না। দিবানাথ সেদিন খানিক দূর গিয়ে লেকের পাশে চুপ করে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকেন।

তিনতলায় উঠে দিবানাথ জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে চলে যান। বেশ অনেকক্ষণ ধরে ব্রাশ করে মুখ ধোওয়া তার চিরকালের অভ্যেস। রাত্তিরে শোবার আগেও একবার মুখ ধোবেন। নইলে তার কেমন স্বস্তি হয় না। গিন্নি অমিয়া বলে,—'ওটা তোমার বাতিক। নইলে নাম মাত্র আহার। তার জন্যে আবার দাঁত মাজতে হবে?'

দিবানাথ হেসে জবাব দেন,—'ওটা বাতিক নয় গো। বরং অভ্যেস বলতে

পার। ছেলেবেলায় আমার মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন। বাবা তখন গড়বেতায় সাব-রেজিস্ট্রার। রঘু মাস্টারমশায় রোজ পড়াতে আসতেন। এসেই আদেশ হ'ত, —দাঁত দেখি। তারপর নাক মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতাম! দুর্গন্ধ না পেলে ভারী খুশি। পিঠ চাপড়ে বলতেন,—'দুবার করে দাঁত মাজবে। একবার রাত্তিরে শোবার আগে আর একবার ঘুম থেকে উঠে। তাহলেই নিঃশ্বাসে কেউ কোনোদিন দুর্গন্ধ টের পাবে না।'

অমিয়া অবশ্য একবারই দাঁত মাজে। ঘুম থেকে উঠে। স্বামীর মতো রাত্তিরে ব্রাশ ঘষবার বাতিক তার নেই। তবে দাঁতের ব্যাধি না হোক, বাতেই অমিয়াবালা কাবু। দিবানাথ যখন মুখ-হাত ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন, অমিয়া তখনও বিছানায়। আসলে শয্যাত্যাগ করে একা চলা ফেরা করবার ক্ষমতা তার থাকে না। হাত-পা যেন অসাড় মনে হয়। এই সময়টা পিতুর মাকে বড়ো প্রয়োজন। ঘুমের ঘোরে শাড়ি-জামা আলগা হয়ে যায়। পিতুর মা তা ঠিকঠাক করে দেয়। তারপর দুজনে মিলে অমিয়াকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তার আগে হাত-পা টেনে দিতে হয়। মাংসপেশীতে একটু ম্যাসাজ করতে লাগে। শেষে গিন্নিকে অন্তত দশ মিনিট ঘরের মধ্যে, বারান্দায় হাঁটাতে হবে। তারপর অমিয়ার হাতে-পায়ে, শরীরে যেন একটু করে বল আসে। নিজের পায়ে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে এটা-ওটা কোনোরকমে ধরতে পারে।

অমিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পিতুর মা তখন বাথরুমে যায়। মুখ হাত ধোয়া, কিম্বা প্রকৃতির নিয়মে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি ফের উঠতে না পারে। তখন পিতুর মাকে সাহায্য করতে হয়। অত বড়ো মানুষটাকে কোনোরকমে জড়িয়ে ধরে সে দাঁড়াতে সাহায্য করে। একবার উঠে দাঁড়াতে পারলেই নিশ্চিন্তি। অমিয়া তারপর নিজেই দেয়ালে হাত রেখে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

সকালে এসেই পিতুর মা কেৎলিতে গরম জল বসিয়ে দেয়। উনুনের বালাই নেই, গ্যাসে রান্না। তাও একটা গ্যাস থাকতেই আর একটা গ্যাসের সিলিণ্ডার মজুত থাকে। হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে চিন্তা করতে হয় না। এর মুখটা খুলে অন্যটাতে জুড়ে দিলেই হ'ল। তাহলেই গ্যাস জ্বলবে।

তাদের বসন্তবিলাস রোডে হীরালাল আর হিয়াদির শুধু গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। অন্যদের তোলা উনুনে রান্না। তাও আজকাল কয়লার দাম যা আক্রা, —অনেকেই তোলা উনুন ধরায় না। যেমন পিতুর মায়ের বাড়িতে একটা কাঠের উনুন জ্বলে। খালধারে একটা চেরাই কল আছে। সেখানে কম পয়সায় টুকরো কাঠ বিক্রি হয়। মোহনের ছোট ভাইটা আরো পাঁচটা ছেলের সঙ্গে ঝুড়ি নিয়ে

যায়। কখনও পয়সা দিয়ে কেনে, কখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে অবশ্য চেরাই কলের দরোয়ান তাড়া দেয়। কখনও আবার চোখ টিপে বলে,—'আসিস পরে, এখন বাবু রয়েছে যে।'

গিন্নি বাথরুম থেকে বেরোলেই পিতুর মা ফের ঘরে ঢোকে। আলনার ওপরে রাখা কাচা কাপড় এনে দেয়। জামা ছাড়তে সাহায্য করে। তারপর ট্রে-তে চায়ের কাপ আর সেঁকা পাউরুটি সাজিয়ে কর্তা-গিন্নিকে দিয়ে আসে। ডাক্তারের বারণ। তাই রুটিতে মাখন লাগানো চলে না। পিতুর মা নিজেও বেশ ভালো করে দুধ চিনি মিশিয়ে এক কাপ চা খায়। সকালে দু টুকরো রুটি তার জন্যে বরাদ্দ। তবে বরাদ্দ ওই নামেই। সংসারের কে অত হিসেব-নিকেশ রাখছে? গিন্নির তো ওই দশা। আর কর্তা খবরের কাগজে মুখ দিয়ে সমস্ত সকালটা পড়ে থাকে। রান্নাঘরে পিতুর মা কী করে কে তার খোঁজ জানে? তাই বড়ো একটা পাউরুটি দু দিনে, কখনও একদিনেই শেষ। আসলে পিতুর মা প্রথম দিনেই দু-তিন পিস রুটি সরিয়ে রাখে। ছোট ছেলেটা এই রুটি খেতে বড্ড ভালোবাসে। তাদের বসন্তবিলাস রোডের মুখে এখন একটা রুটির দোকান হয়েছে। কিন্তু সে রুটির সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না। একবার গিন্নি বলেছিল,—'এই রুটি নাকি ময়দার সঙ্গে দুধ মিশিয়ে তৈরি করে।' তাই বুঝি অমন সোয়াদ হয়?

আধখানা পাউরুটি মাসে এক-আধবার পিতুর মা বাড়ি নিয়ে যায়। কর্তা-গিন্নি দুজনের শরীর খারাপ হ'লে রুটিটা নষ্ট হবে ভেবে তাকে নিয়ে যেতে বলে। পিতুর মা দু স্লিস রুটি একবার বনমালীকে খেতে দিয়েছিল। চায়ের সঙ্গে সেই রুটি চিবোবার সময় স্বামীর মুখে যে কী সুন্দর একটা ভাব হ'ল, এত বছরেও পিতুর মা তা দেখে নি।

বেলা বারোটা নাগাদ সে বাড়ি ফিরে আসে। তার আগে কর্তা-গিন্নি দুজনকে খাইয়ে বাসন-কোসন মেজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে রাখে। আর কতটুকু রাঁধা বাড়া? দুটো বুড়োবুড়ি বৈ তো নয়। একটু ভাজাভুজি, ডাল, কোনোদিন অল্প শাক, মাছের ঝোল আর ধবধবে পরিষ্কার চালের ভাত। কর্তা শেষ পাতে দই খেতে ভালবাসে। রোজ দোকান থেকে দই আসে। কর্তা খানিকটা খায়, বাকিটা পিতুর মা নিজের ভাত-তরকারির সঙ্গে বাড়ি নিয়ে চলে আসে।

তা নিজের খাবার বলে পিতুর মা যা ঘরে নিয়ে আসে তাতেই ছোট ছেলেটার সঙ্গে আর একজনের খাওয়া হয়ে যায়। পিতুর মা কোনোদিন ওই ভাত-তরকারি নিয়ে বসে না। পিতু বাড়িতে থাকলে সে খায়, কিম্বা মোহন।

আর বনমালী তো সেই ভোর সকালে উঠে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজে যায়। মেয়ে কিম্বা বউ আগের রাত্তিরে গড়া খান দশ-বারো রুটি তাকে কৌটোতে ভরে দেয়। তার সঙ্গে একটু গুড় বা চিনি। কদাচিৎ একটা সন্দেশ। বাসি তরকারি থাকলে তাও। দুপুরে এক ঘণ্টার ছুটি হয়। বনমালী একটা গাছের ছায়ায় বসে সেই রুটি চিবিয়ে খায়। কখনও শক্ত মনে হ'লে জলে ভিজিয়ে একটু নরম করে নেয়।

পিতুর মা ফের বেলা চারটে নাগাদ কাজে বেরোয়। গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে। বিকেল হ'লেই তার নিজেরও চায়ের তেষ্টা পায়। ওই একটা নেশা। এক কাপ গরম চা না পেটে গেলে যেন শরীরের জড়তা কাটে না। বিকেলের কাজ সামান্য। দশ-বারো খানা হাতে-গড়া রুটি আর একটু তরকারি বানাতে হয়। রাত্তিরে কর্তা-গিন্নি কেউ মাছ খাবে না। শুধু শেষ পাতে একটু মিষ্টি। সন্ধে সাতটা বাজলেই পিতুর মা দুজনকে খাইয়ে দেয়। রাত্তিরে আর থালা-বাটি বের করে না। প্লেটে আর ছোট ডিসে খাওয়া হয়। রান্নাঘর ধুয়ে মুছে পিতুর মা সেগুলি পরিষ্কার করে। শেষে কাপ দুই-তিন গরম জল একটা থার্মোফ্লাস্কে ভরে দিয়ে যায়। শোবার আগে কর্তা-গিন্নি দুজনেই এক কাপ করে হরলিকস্‌ খাবে। রাত্তিরবেলা দিবানাথ নিজেই সেটা তৈরি করে, স্ত্রীকে দেয়।

মাস ছয় হ'ল পিতুর মা এই কাজটা পেয়েছে। আগে যে করত সে বীরভূমে তার দেশে চলে গেছে। লোক না থাকলে এদের অবশ্য একটি দিনও চলে না। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন অনেক আছে। তবে যাতায়াত কিম্বা মাখামাখি তেমন নেই। আর বুড়োবুড়ির কাছে কার আসতে ইচ্ছে করবে? তবু মাঝে-মধ্যে ছুটিছাটার দিনে দু-একজন আসে, খোঁজখবর নেয়। কর্তার এক পিসতুতো বোনের মেয়ে থাকে বৌবাজারে। তার স্বামীর চুনবালির কারবার। গঙ্গার ধারে স্ট্যাণ্ড রোডে দোকান আর গুদামঘর। কাটনী থেকে চুন আসে, মগরার বালি। স্বামী কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে মেয়েটা বাঁজা, ছেলেপুলে হয় নি। সংসারের কাজকর্ম করেও হাতে বেশ অবসর থাকে। হপ্তায় অন্তত দুদিন সে মামা-মামীর খোঁজ নিতে ফুলবাগানে ছুটে আসে। পিতুর মা কামাই করলে কর্তা তাকে টেলিফোন করে। তা মেয়েটা ভালো। কোনোদিন মামার কথার অমান্য করে না। টেলিফোন পেলেই সংসারের কাজ ফেলে দৌড়ে আসে। রান্নাবান্না সেরে মামা মামীকে খাইয়ে সন্ধ্যের পর ফিরে যায়।

মেয়েটার ভালো নাম অতসী। কিন্তু কর্তা ওকে রিনি বলে ডাকে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, বাঁজা মেয়ের যেমন আঁটোসাটো গড়ন হয়,

ঠিক তেমনি। পিতুর মায়ের সঙ্গে ওই ভাগ্নীর অনেকবার দেখা হয়েছে। মেয়েটা যাকে বলে দেখনহাসি। তাকালেই হাসবে। পিতুর মা জিজ্ঞাসা করে,— 'দিদিমণির খবর ভালো ?'

—ইয়াগো পিতুর মা। এই এসেছিলাম মামা মামীর খোঁজ নিতে।' সে জবাব দেয়।

—'আসবে বৈকি।' পিতুর মা তার প্রশংসা করে। 'গিন্নি-মাকে আমি তাই বলি। রিনিদিদির তোমাদের ওপর বড়ো টান। হপ্তায় অন্তত দুবার ঠিক খবর নিতে আসবে।'

মেয়েদের মুখোমুখি হলেই কথা। আর সে কথা যেন শেষ হতে চায় না। হয়তো বেবোবার পথে দেখা, কাজের তাড়া আছে। তবু একবার কথা শুরু হ'লেই চলল। কখন তাতে ছেদ পডবে দুজনেব কেউ তা বলতে পারে না।

পিতুর মা কখনও ঘর-গেরস্থালীর প্রসঙ্গ তোলে। মেয়েটার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করে। ছেলেপুলে নেই, তাই বাঁজা মেয়েমানুষের সঙ্গে একটু সমঝে কথা কইতে হয়। যদি বেফাঁস কিছু ব'লে মেয়েটার মনে কষ্ট দিয়ে বসে।

পিতুর মা কাজে না এলে এই সংসারটা অচল। রিনি তাই দেখা হ'লেই সাবধান করে,

—দেখো বাপু। হুট করে আবার যেন ডুব দিয়ে ব'স না। তাহলেই মামা টেলিফোন করবে। তখন না এসেও আমার উপায় নেই। বুড়োবুড়ি সমস্ত দিন উপোস কবে আছে ভাবলে হাত পা গুটিয়ে কেউ বসে থাকতে পারে ?'

কর্তা ও তাকে কামাই করতে নিষেধ করে। হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রসঙ্গ উঠলে নিজেই বলে,—'তেমন প্রয়োজন মনে হ'লে তুমি বরং আগে জানিও। রিনিকে তখন খবর দিলে পরের দিন আসতে তার অসুবিধে হয় না।'

সে কাজে না এলে এদের যে কী সমস্যা হয় পিতুর মা সেটা বেশ বোঝে। মাঝে মাঝে বুড়োবুড়ির জন্য তারও খারাপ লাগে। এই বয়সে এমনি একা একা পড়ে থাকা। পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট যে কত রকমের আছে। এই যেমন পিতুর মায়ের এক ধরনের কষ্ট। বাড়িতে অভাব-অনটন, সংসারে অতগুলি প্রাণী। দু-বেলা সম্পূর্ণ আহার জোটে না। ভালো জামা-কাপড কত দিন পরেনি। শীতে ছেলে-মেয়ে দুটো গরম বস্ত্রের অভাবে হি হি করে কাঁপে। ছোট মেয়েটার ঠোঁট ফেটে ঘা হয়। ছেলেটার গায়ে খড়ি ফোটে। ঘরে একটি মাত্র লেপ আছে। সেটা পিতু আর ছোট ছেলে-মেয়েকে দিয়ে সে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে রাত কাটায়। তারপর ধার-কর্জে জেরবার হয়ে পড়ে। সেজন্য দুটো কথা, কখনও গালমন্দও শুনতে হয়। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য লাগে তখন নিজের

ভাগ্যকে দোষ দেয়। ঈশ্বরকে গালিগালাজ করতে ছাড়ে না।

এই বসন্ত বিলাস রোডে আবার হিয়াদির আর এক ধরনের দুঃখ। ছেলে আছে, কিন্তু হিয়াদি তাকে কাছে রাখে নি। নেহাৎ অল্প বয়সে রাঁচীর পাশে একটা মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। ছুটিছাটায় কিছু দিনের জন্য এসে থাকে। আবার ছুটি না ফুরোতেই হিয়াদি তাকে নিজে কিম্বা লোক দিয়ে হস্টেলে পৌঁছে দেয়। এই নিয়ে হিয়াদির কোনো অনুযোগ নেই। বরং ছেলেটা কাছে থাকলেই তার মনে একটা অস্বস্তির কাঁটা সর্বদাই খচখচ করে। অন্য কিছু নয়। রাত দুপুরে বাড়িতে যা কাণ্ড হয়, ওই ছেলেটা যদি ঘুম থেকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে তাই তাকিয়ে দেখত, তাহলে দিনের আলোয় হিয়াদি ওর সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারত না। পিতুর মা জানে হিয়াদির দুঃখ-কষ্ট আরো অনেক গভীরে। অথচ স্বচ্ছল অবস্থা। খরচের কোনো হিসেব নেই। যা প্রয়োজন, তাই আসে। ইচ্ছে মতো হিয়াদি শাড়ি কেনে, গয়না গড়ায়। দিব্যি রঙবাহার দামী কাপড় পরে সেজেগুজে রাস্তা দিয়ে যায়। লোকে ঠাট্টা করে পটের বিবি বলে। কিন্তু ওটা তো বহিরঙ্গ। হিয়াদির মনের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। পিতুর মা সব বোঝে। স্বামীকে নিয়েই হিয়াদির জ্বালা। সংসারে দুজনে পাশাপাশি বাস করে, এই পর্যন্ত। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা হয় নি। মনের কষ্টে হিয়াদি তাই সোয়ামীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না। রাত দুপুরে স্বামী মাতলামি করলে মনের জ্বালা মেটাতে এক বালতি ঠাণ্ডা জল এনে হুড়হুড় করে তার গায়ে ঢেলে দেয়। ঘরের বাতাসে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই নিঃশ্বাস নিতে হিয়াদি বেরিয়ে পড়ে। পথে পথে ঘোরে। সিনেমা-থিয়েটার, গানের জলসা যেখানে ইচ্ছে করে সেখানে যায়। স্বামীকে পায়নি বলেই মনের অতৃপ্তি মেটাতে পরপুরুষের সঙ্গ খোঁজে।

আবার এই বুড়োবুড়ির আর এক ধরনের কষ্ট। টাকা-পয়সার অভাব নেই। ফুলবাগানে রাস্তার ধারে এত বড় বাড়ি। দোতলা আর একতলা থেকে ভাড়া পায়। ব্যাঙ্কে জমানো অর্থের সুদ আসে। মাঝে মাঝে বিদেশ থেকেও টাকা এসে পৌঁছয়। দুজনের খাওয়া পরার জন্য আর কত খরচ হয়? গিন্নি তো বলে ফি মাসেই কত টাকা নাকি ফের ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। তবে দুঃখটা কিসের? ওটা মনের। অনেকটা হিয়াদির মতো। এই বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রী এমনি নির্বান্ধব পড়ে আছে। ছেলে-মেয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকে। তিন বছর আগে নাকি একবার এসেছিল। আবার কবে বুড়ো বাপ-মাকে দেখতে আসবে তা কেউ জানে না। হঠাৎ চোখ বুজলে আর কারো সঙ্গে দেখা হবে?

পিতুর মা তো এই বাড়িতে মোটে ছ-মাস কাজ করছে। কিন্তু তাহলে কী হবে? গিন্নির ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী সকলকে সে চেনে। এমন কী প্রত্যেকের নামও জানে। ছবির অ্যালবাম খুলে গিন্নি তাকে সব দেখায়। ছেলে থাকে আমেরিকায়,—নিউ জার্সিতে। আর মেয়ে রয়েছে ইতালিতে,—মিলানে। ছেলে কী সব যন্ত্রপাতির বড়ো ইঞ্জিনিয়র। জামাইও নাকি তাই,—তবে সে মোটর গাড়ি তৈরির কারখানায় রয়েছে।

ছেলের সম্বন্ধে দিবানাথকে কোনোদিন ভাবতে হয় নি। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাতে স্ট্যাণ্ড করেছিল হিরণ। খবরটা কাগজে বেরোবার পর অফিসে কত লোক তার ঘরে এসে সুখ্যাতি করে গেছে। প্রথমে তো ওর জেনারেল লাইনেই ঝোঁক ছিল। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি পড়বে। তারপর এম. এস. সি. পাশ করে ডক্টরেট। কিন্তু মাথায় কী খেয়াল চাপল। পরীক্ষায় বসতেই যাদবপুরে চান্স পেল। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। চার বছর পরে পাশ করে বেরোল। শুধু ফার্স্ট ক্লাস নয়, অনার্স পেয়েছে। চাকরি হাতের মুঠোয়। রেজাল্ট না বেরোতেই তিন-চার জায়গা থেকে কল এসে গেল। তারপর বছরখানেক বাদে একটা বড়ো কোম্পানীতে সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনের পোস্টে জয়েন করল।

চিন্তা ছিল মেয়েটাকে নিয়ে। হিরণের চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট। দাদার মতো লেখাপড়ায় চৌখশ নয়। তবে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হ'ল। ফুলবাগানে এত বড়ো বাড়িটা তৈরি করতে গিয়ে দিবানাথ তখন ফতুর। টাকাকড়ি সব বেরিয়ে গেছে। গিন্নি সেটা জানত। এ বাড়িতে আসার পর প্রায় বলত,—'হ্যাগো, টাকাকড়ি সব বাড়ির পিছনে ঢাললে। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে একবার সে কথা ভেবেছ?'

তখন দিবানাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন,—'হবে, হবে। অত ভাবনা কিসের?' স্ত্রীকে এর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নি। আসলে সব স্ত্রীর ওই এক বুলি। যতদিন না দুহিতাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করতে পারছে, ততদিন কানের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাবে। বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে প্রায় সব কিছু খুইয়ে বসলেও দিবানাথ অত দমে যান নি। তখনও স্ত্রীর পঞ্চাশ ভরি সোনা মজুত। তারপর রিটায়ার করলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুয়িটির খানিকটা টাকা হাতে আসবে। তাছাড়া ছেলে তৈরি হয়ে গেছে। মোটা টাকা মাইনের চাকরিতে জয়েন করবে। সুতরাং তার ভাবনা কিসের?

অনেক ভেবেচিন্তে দিবানাথ বাড়ির প্ল্যানটা তৈরি করেছেন। অবশ্য

জায়গাটা যখন কেনা হয়েছিল তখন এই অঞ্চলের কী চেহারা! জনবসতি কম। ওই জোড়ামন্দিরের কাছে নস্করদের যা অট্টালিকা। সন্ধ্যের মুখে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন ভয়-ভয় করত। ফুলবাগানের পিছন দিকটায়, যার নাম এখন সুরেশ সরকার রোড, ওই পথ ধরে খানিকটা গেলেই একটা কালীবাড়ি। জনশ্রুতি, ওখানে কয়েক বছর আগেও ডাকাতরা নরবলি দিয়েছে। দিন দুপুরে গুণ্ডা-বদমাশ লোকেদের আড্ডা, দিশি মদ কিংবা তাড়ির রমরমা ব্যবসা। দিবানাথ সেদিন কল্পনাও করতে পারেন নি যে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই গোটা অঞ্চলটা যেন রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হবে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এদিককার উন্নয়নের ভার নিয়েছিল। দিবানাথ তখন এক বন্ধুর পরামর্শে এই জায়গাটা কিনেছেন। তাও পুরো টাকা এক সঙ্গে লাগেনি, কিস্তিতে শোধ করেছেন। তবে সেই বন্ধুর যেন দিব্যদৃষ্টি ছিল। জমিটা কেনার আগে বলেছে,—'নিয়ে রাখ। কয়েক বছর পরে এসে দেখবি তুই নিজেই চিনতে পারবি না।' তা বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। এখন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে দিবানাথের মনে হয় যেন আলাদীনের সেই দৈত্য কোন মায়ামন্ত্রে রাতারাতি এক নতুন জনপদ সৃষ্টি করেছে।

একতলায় দোকানঘর আর দোতলাটা ভাড়া দেবেন। এখন তিনতলার চারখানা ঘরেই কুলিয়ে যাবে। তাদের স্বামী স্ত্রীর একটা বেড রুম, ছেলে আর মেয়ের দুটো আলাদা ঘর। আর একটা ড্রইং-রুম হতে পারে। দিবানাথ অনেকটা এরকম ভেবেছিলেন। বিয়ে-থা হলেও মেয়ে মাঝে-মধ্যে মা বাবার কাছে এসে থাকবে। তার জন্য একখানা ঘর চাই বৈকি। কিছুদিন ওই ঘর দুটো ওরা দুজনে ব্যবহার করে গেছে। হিরণ থাকত কোণের দিকে ওই ঘরটায়। প্রথমে একাই ছিল। বিছানায় বই পত্র ছড়িয়ে ঘুমোত। কখনও অনেক রাত্তিরে টেপ-রেকর্ডার বাজিয়ে গান শুনত। নিজের জামা-প্যাণ্ট এখানে সেখানে ফেলে রাখত। ঘরের কোণে দলা পাকানো কাগজ ছুড়ে দিত। গিন্নির তখন বাতব্যাধি হয়নি। দিব্যি শক্ত সমর্থ ছিল। ছেলের ঘরদোর পরিষ্কার করতে গিয়ে বলত,—'এবার বউ না আনলে চলবে না। নিজের ঘরটা কেমন নরককুণ্ড করে রাখে দেখেছ?'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই হ'ল। কাকলির আগেই দিবানাথ ছেলের বিয়ে দিলেন। কন্যাপক্ষ সাদার্ন অ্যাভেনিউতে থাকে। মেয়ের বাপের বড় ব্যবসা, হাওড়াতে কী কারখানা আছে। হিরণকে ওদের ভারী পছন্দ। আগে মেয়ের বিয়ে দেবেন, এতকাল দিবানাথ তাই ভেবেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা।

—কাকুতি-মিনতিতে দিবানাথকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হ'ল। ফুলবাগানের এই বাড়িতে সেদিন প্রথম উৎসবের রোশনাই। কত লোকজন, আত্মীয়-কুটুম্ব। ডেকরেটারের লোকেরা ছাদের ওপর ম্যারাপ বাঁধল। সামনেটা সুন্দর করে সাজাল। চারপাশে আলোর ফিনিক, বিয়ের সানাই বাজছে। দিবানাথ নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ণ করছেন। ভাবলে মনে হয়, এই তো সেদিন। সব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

হিরণ আমেরিকায় আছে। বিয়ের মাস তিনেক পরেই তার হঠাৎ স্টেটসে যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল। দিবানাথ আপত্তি করবার মত কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। কোম্পানী থেকেই চাকরি ঠিক করে দিয়েছে। ওই সঙ্গে পড়াশুনো চলবে। তখন বৌমা কিছুদিন একাই ওই ঘরটায় বাস করে গেছে। হিরণ যাবার মাস ছয় পরে বৌমাও চলে গেল। তবু তখনও কাকলি ঘরে। এত বড় বাড়িটা এমন নির্বান্ধব পুরী হয়ে ওঠে নি। স্বামী-স্ত্রী দুজনের একটা অবলম্বন ছিল। কিন্তু দিবানাথের বরাতজোর বলতেই হবে। বছর না ঘুরতেই প্রায় আচমকা কাকলির এক সম্বন্ধ এসে হাজির। হবু জামাইও কৃতী ছেলে। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। ইতালির মিলানে থাকে। তিন মাস ছুটি নিয়ে ইণ্ডিয়াতে এসেছে। ইচ্ছে, বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরে যাবে। কাকলির সঙ্গে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে হঠাৎ পরিচয়। পরের সপ্তাহেই দিবানাথের কাছে সম্বন্ধ এসে হাজির। দাবি-দাওয়া নেই, কিছু দিতে হবে না। শুধু ছেলেটিকে যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে এই মাসেই বিয়ের দিন স্থির হতে পারে।

দিবানাথের আপত্তি ছিল। কাকলিকেও বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন? কিন্তু ছেলের চাকরি আর বিত্তেবুদ্ধির কথা শুনে গিন্নি এক পায়ে রাজী। অমন সোনার চাঁদ ছেলে সেধে মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। আর তারা কিনা ওজর-আপত্তি করছে? ইতালিতে গিয়ে থাকবে তো কী হয়েছে? আজকাল অমন আকছার যায়। এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া করলে লোকে বোকা বলবে।

অগত্যা দিবানাথ রাজী হলেন। ফুলবাগানের এই বাড়িতে ফের সানাই বাজল। আলোর রোশনাই, প্যাণ্ডেল, অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ণ। সব ঠিক-ঠিক হয়ে গেল। তারপর মাসখানেক বাদে স্বামী-স্ত্রী একদিন এয়ার-পোর্টে গেলেন। যাবার আগে কাকলি ঝরঝর করে কাঁদল। প্লেন আকাশে উড়লে দুজনে ফের শূন্যগৃহে ফিরে এলেন।

এ সমস্ত ঘটনা পিতুর মা জানে। গিন্নির মুখ থেকে কতবার শুনেছে। তা সেই মেয়ের বিয়ের পরও অনেকদিন কেটে গেল। এই আট-ন বছরে হিরণ আর কাকলি মোটে দুবার এসেছে। প্রতিবার মাস দুই ছুটি। এখন হিরণের

এক মেয়ে আর ছেলে। কাকলিরও তাই। তবে তার ছেলে বড়, মেয়ে ছোট। নাতি-নাতনীদের নিয়ে কর্তা-গিন্নি ওই কটা দিন বড়ো আনন্দে কাটিয়েছে। হিরণ একটা দামী ক্যামেরা আর অনেক রঙিন ফিল্ম সঙ্গে এনেছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে অজস্র ছবি তুলল। কোনোটা কর্তার একার, কোনোটা গিন্নির। আবার কোনোটা দুজনের। তারপর নাতি-নাতনীদের কোলে কিম্বা সঙ্গে নিয়ে কত ছবি। প্রথমবার হিরণ আর কাকলি প্রায় একই সঙ্গে এসেছিল। বোধহয় নিজেদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি করে ওই ব্যবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

হিরণ আর বৌমা এলো নভেম্বরে। জামাইকে সঙ্গে নিয়ে কাকলি এসে পৌঁছল আট-দশ মাস বাদে। তবু একটা হৈ-চৈ। ফুলবাগানের বাড়িতে সেই কটা দিন এক প্রবর্ধমান জীবনের উচ্ছলতা।

অমিয়া সেবার ছেলেকে বলেছিল,—'আর কতদিন বিদেশে পড়ে থাকবি? তার চেয়ে বরং সকলকে নিয়ে দেশে ফিরে আয়।'

হিরণ হেসে জবাব দিল,—'এখানে তেমন চাকরি কোথায় মা? আর এত টাকা মাইনে কে দেবে?'

অমিয়া তবু অবুঝের মতো বলল,—'যেমন হোক, চাকরি নিশ্চয় হবে। তবু তো আমাদের কাছে থাকবি।'

হিরণ আর কোনো জবাব দেয় নি।

ছেলের বৌ প্রস্তাব করল,—'তার চেয়ে আপনারা ওখানে চলুন। আমাদের কাছে থাকবেন।'

এবার অমিয়ার চুপ করে থাকার পালা। আচ্ছা, এই বুড়োবয়সে ওই ঠাণ্ডার দেশে গিয়ে কখনও তারা টিকতে পারে? বৌমা যে কী ভাবে।

নিউ জার্সিতে হিরণ বাড়ি কিনেছে। পিতুর মা সে কথাও জানে। সে বাড়ির ছবি গিন্নি তাকে দেখিয়েছে। শুধু বাড়ি নয়, দুটো গাড়ি আছে ওদের। একটা লোমওলা বিরাট কুকুর। নাতি-নাতনীদের জন্মদিনে অনুষ্ঠান হ'লে তার ছবি মা-বাবাকে পাঠিয়ে দেয়। বিকেলবেলা পিতুর মা কাজে গেলে গিন্নি তাকে ডাকে। নাতির ছবি দেখায়। বলে,—'দাদুভাইয়ের আমার সাত বছর পূর্ণ হ'ল যে।'

অমিয়া বারবার ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। নিজের মনে বলে, —'জন্মদিনে নাতিসাহেবকে আমার কিছু দেওয়া হ'ল না।' ফের কর্তাকে উদ্দেশ্য করে জানায়,—'ওগো, একটা কিছু ওর নামে পাঠিয়ে দিলে হ'ত না?

নইলে এখানে দাদু-দিদিমা বেঁচে আছে, তাই বা ওরা কেমন করে মনে রাখবে ?'

শুনে পিতুর মায়ের মনে বড কষ্ট হয়। কোনোদিন বলে,—'আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পডছে। ছেলেকে এবার চিঠি লিখে দিন। চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে আস্থক।'

গিন্নি চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ কথা কয় না। পরে বলে,—'কাল রাত্তিরে উনি দুঃখ করছিলেন। কলকাতায় বাড়ি হ'ল। ছেলে মানুষ করলাম, মেয়ের বিয়ে দিলাম। কিন্তু কী লাভ হ'ল বলতে পার ? হঠাৎ চোখ বুজলে মুখে একটু আগুন পর্যন্ত পাব না।'

পিতুর মা মুখ নিচু করে শোনে। কোনো জবাব দেয় না।

গিন্নি নিজের মনেই বলে,—'ওরা কেন আসবে ? অমন বাড়ি, দুখানা গাড়ি। বৌমাও একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। অত আরাম ছেড়ে কেউ আবার এদেশে ফিরে আসে ?'



মানিকতলার মোড়ে হীরালাল ওকে দেখতে পেল।

গাড়িটা আস্তে যাচ্ছিল। এখন অফিস-টাইম। দশটা-এগারোটার সময় বেশ ভিড। লোক যেন গিজগিজ করে। আর শুধু অফিস-টাইম মিছে বলা। সেই সকাল আটটা থেকে রাত্তির দশটা অব্দি মানিকতলার মোড়ে প্রচুর লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। জায়গাটা এখন জংশন স্টেশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। চারদিকে লোক ছুটছে। পশ্চিমে উল্টোডাঙা, সল্টলেক, কাঁকুড়গাছি,—একটু বাঁদিকে গেলে বাগুইহাটি, বিরাটি পৌঁছে যাবে। উত্তরে শ্যামবাজার,—বি.টি. রোড ধরে সোজা ব্যারাকপুর। আর দক্ষিণে শেয়ালদা, কিম্বা গড়িয়াহাটা,—যাদবপুরে যেতেও অসুবিধে নেই। পূবে গেলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, পোস্তা ছাড়িয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌছবে।

হীরালাল ফিরছিল আলুর খোঁজ নিয়ে। তার এক ট্রাক মাল হরিয়ানা থেকে রওনা হয়েছে। গতকাল রাত আটটা পর্যন্ত গুদামে ডেলিভারি হয় নি। অথচ

হিসেব মতো আগের দিন ভোরেই আলুর ট্রাকের কলকাতায় পৌঁছবার কথা। পথে কোনো গণ্ডগোল হয়ে থাকলেই বিপত্তি। আর সেই গণ্ডগোল নানা ধরনের হতে পারে। হয়তো কোনো ঝামেলায় গাড়ি ফেঁসে গেছে। গরু-বাছুর কিম্বা জলজ্যান্ত একটা মানুষকে চাপা দিয়ে থাকলেও বিশ্বাস নেই। যে রকম যমদূতের মতো গাড়ি ছোটে। তাহলে মালসুদ্ধ ট্রাক থানায় নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা তার চেয়েও সাংঘাতিক হতে পারে। তেমন খতেরনাক জায়গা হ'লে মাল নিয়ে গাড়িকে আর বেরোতেই দেবে না। খানিকটা পেট্রল ছিটিয়ে একটা জলন্ত দেশলাই ছুড়ে দিলেই মালসমেত গাড়ি ছাই হয়ে শুধু কঙ্কালটা পড়ে থাকবে। আবার অন্য এক ধরনের বিপদের চিন্তাও মাথায় আসে। গাড়ি যদি হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায়, তাহলে পথের ধারে আরশুলার মতো চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে। ড্রাইভার কিম্বা হেল্পারের প্রাণহানি হলেও আশ্চর্যের নয়।

অবশ্য এসব কিছু ঘটে নি। গাড়ি দিব্যি বহাল তবিয়তে ছিল। তবু পুরো একটি দিন এক পাঞ্জাবির চটিতে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হ'ল। কারণ অন্য কিছু নয়, ড্রাইভারের অসুখ। বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ জ্বর এসে গিয়েছে। ওই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে আসতে আর সাহস করেনি। একটা দিন রেস্ট নিয়ে ওষুধপত্র খেতেই ফের শরীর চাঙা হ'ল। তারপর একটু ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে গাড়ি চালিয়ে আজ সকালবেলা গো-ডাউনে এসে মাল খালাস করেছে।

হীরালালের তাই মেজাজ খুশ, মনমর্জি ভালো। তার আলুর গুদামটা স্ট্র্যাণ্ড রোডে। বেলা দশটা বাজলেই পোস্তার কাছে লরির মেলা বসে যায়। তখন এই রাস্তায় গাড়ি চালানো দায়। মানিকতলা পৌঁছতে কখনও এক ঘণ্টা কিম্বা তার বেশী লাগে। কিন্তু আজ কোনো কারণে গাড়ি কম, রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। হীরালাল মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে পোস্তা থেকে মানিকতলার মোড়ে চলে এলো।

শ্যামাপদকে তার পই-পই করে বলা আছে। ভিড়ভাড় দেখলে যেন স্পীড কমিয়ে দেয়। গাড়ি আছে বলেই সাঁ-সাঁ করে ছুটতে হবে, এমন মাথার দিব্যি তো সে দেয় নি। আর এই ক'লকাতা শহরে এমনি অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে পিঁপড়ের মতো লোক গিজগিজ করে। গা বাঁচিয়ে চলা দায়, তা গাড়ি। তবে শ্যামাপদ কথা শোনে। পুরানো ড্রাইভার, বয়স হয়েছে। গাড়ি নিয়ে কোনোদিন কারো সঙ্গে রেস দেয় না। সে অভ্যাস বরং নিখিলের আছে। ছোকরা ড্রাইভার। গাড়ির স্টীয়ারিং'এ হাত রেখে ঝড়ের বেগে ছোটে। নিখিল যখন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়, তখন হীরালালের ভয় করে। রাস্তা পেরোতে গিয়ে কেউ যদি তার গাড়ির চাকার তলায় পড়ে, তাহলে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে

আর বাড়ি ফিরতে পারবে ?

মানিকতলার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে। অন্য-দিন হ'লে গাড়ি হয়তো হুস করে বেরিয়ে যেত। কিন্তু হীরালালের এখন দিলখুশ, মন চিন্তামুক্ত। গুদামে মাল খালাস হয়েছে। গত চার পাঁচ দিনে আলুর দর হঠাৎ চড়চড়িয়ে বেড়ে গেছে। এক লাফে কুইন্টল পিছু প্রায় পনের কুড়ি টাকা। হীরালালের কাছে খবর আছে, কাল-পরশুর মধ্যে দর হয়তো আরো একটু বাড়বে। এই সুযোগে অন্তত দু তিন ট্রাক মাল যদি বাজারে কাটানো যায়, তাহলে একটা মোটা অঙ্কের মুনাফা ঘরে আসে।

হীরালাল এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল। হঠাৎ মাণিকতলার মোড়ে বাঁ দিকে নজর পড়তেই সে অরণ্যকে দেখতে পেল। হ্যাঁ অরণ্য,—ওর নাম অরণ্য মজুমদার। সেই একই রকম ঢঙ দাড়ানোর। পরনে পাজামা, আর গায়ে একটা পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। বড়ো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। কিন্তু আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে অরণ্য। ওর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে সেই শীর্ণতা আর ক্লান্তি—দুই ফুটে উঠেছে।

ইঙ্গিত করতেই শ্যামাপদ গাড়িটা তার কাছাকাছি এনে রাখল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হীরালাল ডাকল,—'অরণ্য, এই অরণ্য।'

কে তার নাম ধরে ডাকছে সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারপর গাড়ির দিকে চোখ পড়তেই মৃদু হেসে বলল,—'হীরালালদা'।

—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?'

—'গতকাল সকালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।' অরণ্য জবাব দিল।

—'বাড়ি যাওনি?'

—'না, মানে আমরা চারজন একসঙ্গে ছাড়া পেলাম। সবাই মিলে কাল মোহিতের বাড়িতে কাটিয়ে এখন ফিরছি।'

—'তুমি তো জোড়ামন্দিরে যাবে? তাহলে গাড়িতে এস।' হীরালাল আহ্বান করল।

অরণ্য মাথা নাড়ল। বলল,—'আপনার গাড়িতে যেতে পারি না। আর সে কথা তো আপনি জানেন। তার কারণ আপনারা শ্রেণীশত্রু। ওই গাড়িতে একসঙ্গে যাওয়া মানেই একটা আপোষ বলতে পারেন। তা কখনও হয় না।'

হীরালাল ঢোক গিলল। ছেলেটা এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সব কথা বলে। সে আর জোর করতে সাহস পেল না। মুখটা ফের গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে শুধু বলল,—'মনে হ'ল তুমি খুব ক্লান্ত, তাই—'

'ক্লান্ত নিশ্চয়।' অরণ্য স্বীকার করল। ফের একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার

মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'আচ্ছা, এখন যদি আপনার গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরি, তাহলে ওই এলাকায় যারা আমাদের চেনে,—তারা অন্তত আমার চরিত্র সম্বন্ধে কী ধারণা করবে বলুন ?'

কথাটা ভাবতেই হীরালালের মনে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ল। অরণ্য কী ইঙ্গিত করছে ? একদা হীরালালকে তারা শ্রেণীশত্রু মনে করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার কথা চিন্তা করত। এখন সেই হীরালালের সঙ্গে তার গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরলে এখানকার বাসিন্দারা কী মনে করবে ?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই শ্যামাপদ ফের গাড়িতে স্টার্ট দিল। খানিকটা গিয়ে বলল,—'ফালতু ওকে ডাকলেন। মুখের ওপর তো জবাব দিয়ে গেল।'

হীরালাল কোনো মন্তব্য করল না। সে ওই অরণ্যের কথা ভাবছিল। বসন্তবিলাস রোডে তার বাড়ি যখন তৈরি হয়নি, তখন থেকেই সে অরণ্যকে চিনত। জোড়ামন্দিরের কাছে বাড়ি। অরণ্যের বাবা একটা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। অরণ্য স্কুলে যেত। তখন হীরালালের গাড়ি ছিল না। ট্রামে-বাসে যাতায়াত করত। বাসস্টপে গাড়ির অপেক্ষায় দুজনেই কতদিন দাঁড়িয়ে। তারপর একদিন বসন্তবিলাস রোডে তার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হ'ল। সে বছরই অরণ্য হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করল। খবরের কাগজে ছবি বেরোল। সেদিন বাজারে ওর বাবার সঙ্গে দেখা। হীরালাল একটা বড় সাইজের ইলিশ মাছ কিনে অরণ্যের বাবাকে দিয়ে বলল,—'ছেলে স্ট্যাণ্ড করেছে। তাই এটা ওকে খেতে দিলাম।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন,—'এ তো উল্টো হ'ল মশায়।'

—'কেন ?' হীরালাল পাল্টা প্রশ্ন করল।

—'ছেলে স্ট্যাণ্ড করেছে, তাই লোকে আমায় খাওয়াতে বলছে। আর আপনি একটা মস্ত ইলিশ কিনা আমাকেই খেতে দিচ্ছেন ?'

তারপর দুজনেই হেসে উঠল।

পাশ করে অরণ্য প্রেসিডেন্সিতে ঢুকল। হীরালাল একদিন জিজ্ঞাসা করতে বলল,—'ইতিহাসে অনার্স নিয়েছে।' কলেজে পড়ার সময় অরণ্য মাঝে মাঝে এই বসন্তবিলাস রোডে আসত। হীরালাল লক্ষ্য করল ছেলেটার চালচলন, কথাবার্তার ভঙ্গি সব যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একদিন তার সদ্য সমাপ্ত নতুন বাড়িটার সামনে অরণ্য দাঁড়িয়ে। হীরালাল এমনি জিজ্ঞাসা করেছিল,—'কী, কেমন হয়েছে বল ?'

—'বিউটিফুল।'

অরণ্য আরো কয়েক সেকেণ্ড বাড়িটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে ফের

বলল,—'হীরালালদা আপনি এবার জাতে উঠে গেলেন।'

—'তার মানে?' হীরালাল ওর মন্তব্যের গূঢ় অর্থ না বুঝতে পেরে প্রশ্ন করল,—'আমি কী এতকাল বেজাত ছিলাম?'

অরণ্য মৃদু হাসল, বলল,—'জাত বলতে আপনারা যা বোঝেন, সেটা আমরা স্বীকার করি না। আসলে এই পৃথিবীতে দুটো জাত,—হ্যাভস্ অ্যাণ্ড হ্যাভ নটস্। দুটো শ্রেণী,—একটা শোষণ করছে আর একটা প্রতিদিন নির্বিচারে শোষিত হচ্ছে।'

হীরালাল শুনছিল। তার মনে হ'ল ছেলেটা সত্যি অনেক কিছু জানে, শিখেছে। অথচ কতই বা বয়স? এই তো ক'বছর আগে হাফ-প্যান্ট আর সার্ট পরে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকত। আর এখন দিব্যি ফড়ফড় করে কত কী বলে যাচ্ছে।

অরণ্য তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল,—'এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে একটা শ্রেণীর সবই আছে। আর একটা শ্রেণী নিঃস্ব,—যাদের শৃংখল ছাড়া অন্য কিছু হারাবার ভয় নেই।'

হীরালাল চুপ করে ছিল। এত তত্ত্বকথা তার বোধগম্য হয় না। সে তবু বলল,—'বাড়িটা তাহলে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

—'বিরাট বাড়ি করেছেন। এর জন্য আপনি গর্ববোধ করবেন বৈকি। এই সমাজ ব্যবস্থায় সকলে তাই করে।' প্রশংসার শেষে ছোট্ট একটি মন্তব্যে অরণ্য যেন তার গায়ে হুল ফোটাল। ফের হেসে বলল,—'বাবা কিন্তু বরাবর আপনাকে একজন সাকসেসফুল ম্যান বলে ভাবেন। শুনেছি আপনি কোলে মার্কেটে এক আলুর ব্যবসাদারের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টায় নানা রকম কৌশলে বেশ টাকা পয়সা কামিয়ে এখন দিব্যি জাতে উঠে গেছেন।'

অরণ্যের কথা বলার ধরনটা প্রায় এরকম হয়ে গেছল। মাঝে মাঝে অবশ্য তাকে ঠাট্টা পরিহাসও করত। একদিন বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফিরছে। তার সঙ্গে দেখা হতেই বলল,—'হীরালালদা, আপনি র‍্যালের নাম শুনেছেন?'

র‍্যালে? হীরালাল ভ্রূ কুঞ্চিত করল। র‍্যালে সাইকেলের কথা তো সকলেই জানে। অরণ্য কী তার কাছে ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করছে?

হীরালাল সে কথা বলতেই তার অজ্ঞতায় অরণ্য হো-হো করে হেসে উঠল। বলল,—'আমি যার কথা জিজ্ঞাসা করছি তার নাম ওয়াল্টার র‍্যালে।'

—'সে কে?' হীরালাল জিজ্ঞাসু হ'ল।

অরণ্য হেসে জবাব দিল,—'আমেরিকায় ভার্জিনিয়া থেকে আলু এনে

তিনি ইংল্যাণ্ড এবং আয়র্ল্যাণ্ডে এর নিয়মিত চাষ শুরু করেন। তবে তার অনেক আগেই জন হকিন্স এবং পরে ফ্রান্সিস ড্রেক ইংল্যাণ্ডে আলু নিয়ে আসেন। অবশ্য আলু য়ুরোপে প্রথম আসে স্পেনীয়দের সঙ্গে এবং ক্রমে আলুর চাষ মহাদেশের সর্বত্র হতে থাকে। এদেশে আলু কবে এবং প্রথম কার সঙ্গে এসেছিল তা সঠিক বলা খুব শক্ত।'

হীরালাল এত সব বৃত্তান্ত কোনোদিন শোনে নি। কজন আলুর ব্যবসায়ী ওয়াটার র‍্যালে সাহেবের নাম শুনেছে? অথচ ওই আলুর দৌলতেই তার বাড়ি-গাড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব হয়েছে, এ কথা তো মিথ্যে নয়।

মাঝে মাঝে অরণ্য দুম করে তার দিকে এমনি অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দিত। কৈশোর ছেড়ে সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছে। তরতাজা তরুণ। সম্ভবত এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা তখন তার মস্তিষ্কে সর্বদাই গিজগিজ করত। শেষ যেবার অরণ্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই সকালবেলার কথা হীরালাল আজও ভোলেনি।

খুব ভোরে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে দাঁতনকাঠি ঘষছে। অরণ্য কোথাও যাচ্ছিল। তাকে দেখে কাছে এলো। হঠাৎ কী মনে হতে বলল, - 'হীরালালদা ফরাসী বিপ্লবের কথা শুনেছেন?'—

'ফরাসী বিপ্লব?' হীরালাল সবিনয়ে তার অজ্ঞতা স্বীকার করল।

অরণ্য নিজেই বলল,—'ফরাসী বিপ্লব ঘটে ১৭৮৯ সালে। সে বছরই চৌদ্দই জুলাই ব্যাস্টিলের দুর্গ ভেঙে অসংখ্য নিরপরাধ বন্দীকে জনগণ মুক্ত করে দেয়। এই বিপ্লবের ঠিক আগে ফ্রান্সের অবস্থা কী ছিল জানেন? ১৭৭৭ সালে এগারো লক্ষ ভিখারীতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। নিদারুণ খাদ্যাভাব, তার জন্য শুরু হ'ল হাঙ্গামা, লুঠতরাজ। ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু, অসহায় জনগণকে উদ্দেশ্য করে দুঁজোর গভর্ণর বললেন,—মাঠে অনেক ঘাস হয়েছে। পেটের জ্বালা থাকলে তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। তখন রাজকোষ শূন্য। তবু ষোড়শ লুই এবং মেরী আঁতোনিয়েতের টাকার খাঁই দিন দিন বেড়ে চলল। আড়ালে প্রজারা রানীর নাম দিল,—মাদাম ডেফিসিট।' এক মুহূর্ত থামল অরণ্য। ফের চাপাগলায় বলল,—'তারপর রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালে আর মাও-সে-তুং তাঁর লং মার্চের ডাক দিলেন ১৯৪৪-৪৫ এ।'

হীরালাল শুধু শুনত। কোনো জবাব দিত না। তার পেটে কতটুকু বিদ্যে? প্রাইমারী স্কুলের দু-তিন ক্লাস অব্দি পড়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে বেড়া ডিঙোতে পারে নি। নেহাৎ ব্যবসাপাতি করে চলনসই দুটো কথা বলতে শিখেছে। এত সব নানান দেশের ইতিহাস কেমন করে জানবে?

অরণ্য বলল, – 'এই পুঁজিবাদী কাঠামোকে আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে। আর তার জন্য চাই বিপ্লব। ফরাসী দেশের মতো সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে আমরা এক নতুন সমাজ গড়ব। বন্দুকের নলই হবে শক্তির উৎস। এই পচা, ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল পালটে ফেলতে চাই হীরালালদা। দেখবেন, খুব শীগগীর এই ক'লকাতায় এবং সমস্ত রাজ্যে একটা নতুন হাওয়া বইবে।'

হীরালাল মাড়ির ওপর দাঁতন কাঠি ঘষছিল। কোনো কথা বলে নি।

'চলি।' অরণ্য ঈষৎ হাসল,—'যাবার আগে অনেক কথা বলে গেলাম, তাই না?'

পিছন ফিরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটতে লাগল।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করল, --'এই ভোরবেলা তুমি চললে কোথায়?'

অরণ্যের পরনে প জামা, গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা ঝোলা। ঘাড় ফিরিয়ে সে উত্তর দিল,--'অনেক দূরে।'

হীরালাল কী বুঝল সেই জানে।

খানিকটা এগিয়ে অরণ্য আবার ফিরে তাকাল। কেমন অদ্ভুত হেসে বলল, —'অন এ লং মার্চ।'

পরদিন সকালে হীরালাল খবর পেল। অরণ্য নাকি আর বাড়ি ফেরে নি। রাত্তিরে পুলিশ তার খোঁজে এসেছিল। অরণ্যকে না পেয়ে ফিরে গেছে। পুলিশের খবর, অরণ্য এক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হয়েছে।

কিন্তু অরণ্য যা বলেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তবে হাওয়া নয়, যেন একটা ঝড় এলো। দিন পনের না যেতেই তাদের পাড়ায় কারা যেন দেয়ালে লিখে গেল,—সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। খুব দ্রুত কী যেন এক অজানা ঢেউ এই কলকাতা এবং রাজ্যের বহু অংশে সাড়া জাগিয়ে তুলল। কয়েকদিন না কাটতেই পাড়ার কাছে খালের ধারে প্রথম ঘটনা। পোশাক-পরা এক পুলিশ কনস্টেবলকে কারা যেন ছুরি মেরে হত্যা করে পালিয়ে গেল।

শুধু একটা নয়, পরপর এমন বহু অ্যাকশন। এই ক'লকাতায় এবং রাজ্যের অন্য জেলায়। নির্বিচারে ধরপাকড় এবং পুলিশী দমন শুরু হতে বিলম্ব হ'ল না। গুলিতে প্রাণ হারাল উগ্রপন্থী নামে চিহ্নিত কত তরতাজা যুবক। এই বসন্তবিলাস রোডে তখন কী থমথমে আবহাওয়া। সন্ধ্যে না হতেই মানুষজন ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। রাত সাতটা না বাজতেই অমন প্রশস্ত সি. আই. টি রোড সুনসান, নির্জন। ফুলবাগানের কাছে দোকানপাট বিকেল না ফুরোতেই

ঝাঁপ টেনে বন্ধ করে দেয়। সন্ধ্যের অন্ধকার নামলেই বাসের সংখ্যা নামমাত্র, কখনও আর দেখা মেলে না। একটু বেশী রাত্তিরে পুলিশের গাড়িও এ তল্লাটে টহল দিতে সাহস করেনি। যারা অবস্থাপন্ন, বিত্তবান,—তারা অনেকে ঘরদোরে তালচাবি দিয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল। কেউ বিদেশে ভিন্ন রাজ্যে, কেউ বা এই ক'লকাতায় অন্য প্রান্তে। যেখানে তখনও গণ্ডগোল কম, আবহাওয়া এমন উত্তপ্ত হয় নি।

প্রথম দিকে হীরালাল অতটা গ্রাহ্য করে নি। অনেকদিন ধরেই থানার বাবুদের সঙ্গে ভাবসাব। বড় দারোগা নিজেই তাকে আশ্বাস দিল,—'অত ভয় পাবার মতো কোনো কারণ নেই। কটা দিন সাবধানে থাকুন। পুলিশ একটু শক্ত হলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কিন্তু বেশীদিন হীরালাল ওই কথায় ভরসা রাখতে পারেনি। ঘটনা ঠিক লেলিহান অগ্নিশিখার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে হীরালাল একটা চিঠি পেল। কাগজের কোণে একটা কবন্ধের ছবি। গলাটা কেউ কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। শুধু মুণ্ডহীন ধড়টা সামনে দাঁড়িয়ে। নিচে লাল কালিতে পরিষ্কার অক্ষরে দশ হাজার টাকার দাবী। সন্ধ্যের মুখে এক গোপন স্থানে ওটা নিজে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। নচেৎ তার ভাগ্যে যা আছে, সে কথা অমন নির্মমভাবে ছবিতে না দেখালেও হীরালালের বুঝে নিতে অসুবিধে হ'ত না।

ওই চিঠিটা কারা তাকে লিখেছিল হীরালাল আজও তা জানে না। তবে এই অঞ্চলে সে মোটামুটি বিত্তবান, টাকা-পয়সা করেছে—এ খবর প্রায় সকলে রাখে। এমনও অসম্ভব নয় সমাজবিরোধী কিছু দুষ্ট লোকে এই সুযোগে তাকে ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায় করবে ভেবেছে। কিন্তু প্রাণ গেলেও অতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে হীরালাল ভর সন্ধ্যেবেলা কখনও অমন একটা নির্জন জায়গায় যেতে পারবে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে তখন তার এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। অথচ কারো কাছে মুখ খুলবার উপায় নেই। খুব গোপনে হীরালাল শুধু একবার থানায় গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তখন নিজেকে বাঁচাতেই বেসামাল। তাকে সাহায্য করবে এমন সামর্থ্য কোথায়? হীরালাল যখন থানা থেকে বেরিয়ে এলো তখন মনে হ'ল রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন যুবক অলস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই রাত্তিরে হীরালালের বাড়ির দরজার সামনে পোস্টার পড়ল— ইনফর্মারদের গলাকাটা হবে।

ওইটুকু যথেষ্ট। হীরালাল আর একটি বেলাও বাড়িতে থাকতে সাহস করে নি। একটা ছোট সুটকেসে সামান্য কিছু জামা-কাপড় নিয়ে সে সোজা এসে

পৌঁছল হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে পুরী। এক-দেড়মাস সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাল। তারপর আবার ক'লকাতায় ফিরে এলো। কিন্তু তাই বলে বসন্তবিলাস রোডে যেতে সাহস করে নি। শেয়ালদ'র কোলে-মার্কেটে তার আলুর গদীতে প্রায় ছ-মাস কাটিয়ে হীরালাল বাড়ি ফিরল। ততদিনে ঝড় শান্ত, গণ্ডগোল অনেক থেমে গেছে। দেয়ালের গায়ে যে সব নতুন শ্লোগান লেখা হয়েছিল তা অস্পষ্ট না হলেও জৌলুস হারিয়ে বসে আছে।

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির একটি গভীর বেদনার স্মৃতি আজও হীরালালের মনে গেঁথে আছে। শুধু হীরালাল কেন, এ তল্লাটের অনেকে সেই দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী। তখন কলকাতায় এবং রাজ্যের সর্বত্র পুলিশের ঠিক ক্ষ্যাপা কুকুরের দশা। উগ্রপন্থীদের খোঁজে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভরদুপুরে হঠাৎ একদিন কাছেই দীনেন সরকার রোডে পুলিশের গাড়ি এসে নামল। বোধহয় গোপন খবর ছিল। আচমকা হানা দিলে কয়েকজন উগ্রপন্থীকে এখানেই পাওয়া যাবে। দুখানা গাড়িতে প্রায় চল্লিশ জন পুলিশ এসে নামল। পায়ে ভারী বুট, হাতে রাইফেল। সঙ্গে দুলাল দারোগা। ভরদুপুরে পুলিশের গাড়ির শব্দ পেয়েই জোয়ান ছেলেরা সব এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। পাড়ায় শুধু মেয়ে, শিশু আর বুড়ো। কাউকে না ধরতে পেরে পুলিশের আক্রোশ বাড়ল। সতেরো-আঠারো বছরের একটা বোবা ছেলেকে তার মা বাড়ির খাটা পায়খানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ চলে গেলে যেন বেরিয়ে আসে। পাড়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পুলিশের ভারী বুট তখন চষে বেড়াচ্ছে। পায়খানার ভিতর একটা টিকটিকি কিম্বা মাকড়সা গোছের কিছু গায়ে পড়তেই বোবা ছেলেটার মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত ভয়ার্ত আওয়াজ বেরোল। সেই সঙ্গে খাটা পায়খানার দরজাও নড়ে উঠল। শব্দটা দুলাল দারোগার কানে ঠিক পৌঁছল। কিছু একটা সন্দেহ করে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ সেদিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে পায়খানার দরজা খুলে বোবা ছেলেটা বেরিয়ে এসেই সামনে আচমকা অত পুলিশ দেখে এক দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেল। প্রাণঘাতী একটি বুলেট সাঁ করে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে মূক ছেলেটা মুখ গুঁজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দেহটা নিঃস্পন্দ হবার আগে তার মুখ দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত গোঙানী বেরোল।

চোখের সামনে ছেলের ওই মর্মস্পর্শী মৃত্যুর পর তার মায়ের বুকফাটা কান্নার কথা এ অঞ্চলের অনেকেই ভুলতে পারেনি।

গাড়িতে বসে হীরালাল পাঁচ-ছ বছর আগের সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণা

করছিল। তার হঠাৎ মনে হ'ল অরণ্য তো আবার ফিরে এসেছে। তাহলে কী ফের সেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করবে? মানুষের মনে শঙ্কা, চোখে ভয়ের ছায়া নামবে? সন্ধ্যে না হতেই যে যার ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নেবে? হাবসী খোজার মতো ভাবলেশহীন কালো কালো মুখের সি. আর পি রাইফেল উঁচিয়ে ভারী বুটের শব্দ তুলে টহল দিয়ে বেড়াবে?

কিন্তু না, হীরালালের অন্তরে বসে কে যেন জবাব দিল, সেদিন আর ফিরবে না। হাওয়া ঘুরে গেছে। একদা দেয়ালের গায়ে লেখা নতুন স্লোগান তরতাজা তরুণদের যেভাবে কাছে টানত, আজ বোধহয় তেমন ভাবে সম্মোহিত করে না। এখন এ তল্লাটে কোংনা ঘোষের দলবলের একচ্ছত্র রাজত্ব। সব অঞ্চলেই এমন এক-আধজন কোংনা ঘোষ তৈরি হয়ে গেছে। তারাই পাড়া কিম্বা এলাকাটা শাসনে রাখে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে বড়ো একটা ঝামেলা করে না। তবে বড়লোক, ব্যবসাদার কিংবা কল-কারখানার মালিকের রেহাই নেই। নানা অজুহাতে তাদের অর্থদণ্ড লেগেই আছে। টাকা রোজগারের আরো অনেক ফন্দি-ফিকির ওরা জানে। প্রায় সকলের পিছনেই রাজনৈতিক দাদাদের মদত থাকে। প্রয়োজনে সেই পার্টির হয়ে তারা জান লড়িয়ে দেয়। এরই মধ্যে অনেক টু পাইস কামিয়ে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কেউ বা মিনিবাস কিংবা গোটা একটা বাসের রুট পারমিট বের করে দিব্যি বহাল-তবিয়তে দিন কাটাচ্ছে। তাই বলে কী অশান্তি নেই? কিংবা গণ্ডগোল? নিশ্চয় আছে, হরবখত লেগে থাকে। ভরদুপুরে বিকট বোমার শব্দে সমস্ত অঞ্চলটা হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে। প্রায়ই দু-পার্টির মস্তানে দ্বৈরথ সমর বাধে। কিংবা ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ। পাইপ গানের গুলিতে হঠাৎ কেউ খুন হয়ে যায়, বোমার ঘায়ে প্রাণ হারায়। পুলিশ আসে,—একটা তদন্ত গোছের কিছু করে। শেষে স্বপক্ষের লোকেরা নিহত মস্তানকে শহীদের মালা পরিয়ে সগৌরবে টেম্পো কিংবা ট্রাকে করে শ্মশানঘাটে নিয়ে যায়।

অরণ্য তাকে শ্রেণীশত্রু কিংবা যাই বলুক, এদের কাছে হীরালাল কিন্তু আদৌ অচ্ছুৎ নয়। বরং হাতে রাখতে পারলে অনেক লাভ। কাজেকর্মে সুবিধে। ছোটখাটো কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তার জন্য অন্য কিছু নয়,—গোপনে একটা বন্দোবস্ত করে নিলেই চলে। সময় মতো সেটা পৌঁছে দিতে পারলে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর ঝুট-ঝামেলা করে না।



চামেলী বাড়ি ফিরল সন্ধ্যের পর।

সকাল ছটায় ডিউটিতে গিয়েছিল। তখন বসন্তবিলাস রোডের অনেকে ঘুমিয়ে। হীরালালের গাড়ি দুটো গ্যারেজে। ধোয়া মোছার জন্য বের করে আনে নি। সাতটা থেকে ডিউটি হলেও বেলা তিনটেয় ছুটি হওয়ার কথা। কিন্তু চামেলী ফিরল আরো তিন-চার ঘণ্টা পরে। ইদানীং বাড়ি ফিরতে চামেলীর প্রায় এমন বিলম্ব হচ্ছে।

ঘরে পা দিয়ে চামেলী লক্ষ্য করল নগেন মুখ গোমড়া করে বিছানায় শুয়ে। বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় নি, সে রেগে আছে। নিশ্চয় এত দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য চামেলীর কাছে কৈফিয়ত চাইবে। মেয়ে দুটো বই নিয়ে পড়তে বসেছিল। মাকে দেখে উঠে এলো। ছোট মেয়েটার বয়স মোটে চার। সারাদিন মাকে না দেখলে সে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। তাই দু-হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

চামেলী এক পা পিছিয়ে মেয়েকে কোনোমতে এড়াল। বলল,--'দাঁড়া, জামা কাপড় ছেড়ে আগে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে আসি।'

বাড়ি ফিরে চামেলী সবাগ্রে তাই করে। তোয়ালে হাতে নিয়ে সোজা বাথরুমে যায়। জামা-কাপড় খুলে একটা বালতিতে ডুবিয়ে রাখে। প্যাকেট থেকে কাপড় কাচা পাউডার ঢেলে সেগুলি কেচে নেয়। তারপর হুড়হুড় করে গায়ে জল ঢালে, সাবান মাখে। সকাল-বিকেলকিংবা রাত্তির যখনই হোক, বাড়ি ফিরে চামেলী বাথরুমে ঢোকে। জামা কাপড় কেচে সাবান মেখে ভালো করে গা ধুয়ে বেরিয়ে আসে।

রোগীর বিছানা ঘাঁটাঘাঁটি করে এলে আগে সাবান মেখে গা ধুতে হয়। জামা-কাপড় বদলাতে হবে। এটা চামেলী ওই নার্সিং হোম থেকেই শিখেছে। যে সব নার্স-দিদিমণিরা কোয়ার্টারে থাকে, তারাও তাই করে। একজন তাকে বলেছিল,—'রুগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। তাই বাড়ি ফিরে ভালো করে সাবান মেখে স্নান করি। নইলে কোনদিন ওই রোগ হয়তো আমার শরীরে বাসা বাঁধবে।'

অবশ্য যে জামা কাপড় পরে চামেলী কাজে যায়, ডিউটির সময় সেটা তার গায়ে থাকে না। প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমের একটা নিয়ম আছে। নার্স কিংবা

আয়া যেই হোক, ডিউটিতে তাকে ধোপাবাড়ি থেকে কাচানো ড্রেস পরে থাকতে হবে। আয়াদের ড্রেস মানে ফিতে পাড় সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। এর জন্যে নার্সিং হোম থেকে একটা অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা আছে। আর সেই ড্রেস কাচাবার জন্যে কোনো খরচপত্র লাগে না। নার্সিং হোমের মাইনে করা ধোপা আছে। বাতিল কাপড় জামা ওয়াশিং সেকশানে ফেলে দিলেই চব্বিশ ঘণ্টা পরে ধোপদুরস্ত ফেরৎ পাওয়া যাবে।

শুরুতে চামেলী যখন আয়ার ট্রেনিং নিত, তখন তার জন্যে অত বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারপর যেদিন সে কাজ পেল, সেদিন থেকেই তাকে ওই ড্রেস পরে ডিউটিতে যেতে হয়েছে। প্রথমে চামেলী বাড়ি থেকেই ফিতে পাড় সাদা শাড়ি আর জামা পরে বেরুত। কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলো পিছন থেকে চা-মে--ই-লি মেমসাব বলে সিটি মারত। পরে জানতে পারল নার্সিং হোমে গিয়ে পোশাকটা বদলে নিলেও চলে। তখন থেকে চামেলী আয়ার সাজ পরে কাজে যেত না। আর পাঁচজনের মতো রঙিন শাড়ি ও ম্যাচ করা জামা গায়ে বাড়ি থেকে বেরুত। প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমে মেয়েদের জামা-কাপড় বদলে নেবার জন্য দু-তিনখানা আলাদা ঘর আছে। তাতে চেয়ার-টেবিল, লাগোয়া বাথরুম, দেয়ালে প্রমাণ সাইজ আয়না বসানো। ওরই একটাতে ঢুকে চামেলী আয়ার ড্রেসটা পরে নিত। ফের ডিউটি শেষ হ'লে কাপড় জামা ওয়াশিং সেকশনে জমা করে বাড়ি থেকে যা পরে এসেছিল, সেই পোশাকে ফিরে যেত।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চামেলী কেৎলীতে জল বসিয়ে এলো। ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে সে এক কাপ চা খায়। ওটা তাকে নিজে তৈরি করে নিতে হয় না। যে মেয়েটি সব কাজকর্ম করে, সে বোধহয় দোকানে কিছু কিনতে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে। ততক্ষণে উনুনে জল গরম হবে। মেয়েটা বাড়ি এসে তাকে চা বানিয়ে দিতে বিলম্ব করবে না।

ঘরে ঢুকে চামেলী এবার ছোট মেয়েকে কোলে তুলে নিল। সমস্ত দিন তাকে পায় নি। মা বাড়ি ফিরতেই কোলে ওঠার জন্য মেয়েটা ছটফট করছিল। খানিকক্ষণ ওকে আদর করে চামেলী ভাবল একবার নগেনের কাছে যায়। স্বামীর ভাবগতিক আজ সুবিধের নয়। মনে হয় বেশ রেগে আছে। নইলে চামেলী এতক্ষণ বাড়ি ফিরল, আর নগেন একটি কথাও বলেনি। অন্যদিন চামেলীর দেরি হ'লে, সে খানিকটা চেঁচামেচি করে। কখনও বিলম্বের জন্য কৈফিয়ত চায়। রাগের মাথায় ঝাঁঝালো কটু কথা বলে। মেজাজ ঠিক না থাকলে চামেলীও জবাব দিতে ছাড়ে না। ফিরতে কেন দেরি হল, তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কল্পিত কাহিনী সবিস্তারে শোনায়। আর তাই শুনে নগেন শান্ত হয়,

সম্ভবত গল্পটা বিশ্বাস করে।

কিন্তু নগেন আজ চুপচাপ। চামেলী বাড়ি ফিরে এলো, তবু সেটা যেন তার চোখে পড়েনি। এতক্ষণ মেয়ে দুটোর সঙ্গে কথা কইল, বাথরুমে গা ধুয়ে বেরুলো,—নগেন যেন সেটা লক্ষ্য করে নি। রান্নাঘরে ঢুকে কেৎলীতে জল বসাল, অথচ নগেন একটি কথা বলল না। চামেলী একবার ভাবল, নিজেই মানুষটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পরে তার জিদ চাপল, মিছিমিছি কেন যেচে কথা কইতে যাবে? সংসারের জন্য এখন সে কিছু কম করে না। আজ প্রায় এক বছরের ওপর হ'ল নগেনের কাণাকড়ি রোজগার নেই। অসুস্থ হবার পর থেকে বাড়িতে বসে আছে। সংসারের সমস্ত ঝক্কিঝামেলা, খরচপত্রের চিন্তা চামেলীকে করতে হয়। তা এখন আয়ার কাজে তার মাসে চার-পাঁচ'শ টাকা রোজগার। ভাগ্যিস প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমে ডাক্তার বসাক এই যোগাযোগটা করে দিয়েছিলেন। নইলে দুটো অপোগণ্ড মেয়ে আর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে চামেলীকে না খেয়ে মরতে হ'ত। তারপর ওই মানুষটার রোগের পিছনে এক ডাঁই খরচ। অথচ এই সামান্য চার-পাঁচ'শ টাকা মাসে আয়। তার থেকে সংসার খরচ চালিয়ে আবার রোগের পিছনে এক কাড়ি টাকা ঢালার মুরোদ চামেলীর কোনোদিন হ'ত না। এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রঘুনন্দন তাকে মুক্তি দিয়েছে। ডাক্তার সেনগুপ্তের পরিচয়ের সুবাদে টি. বি. রোগের স্পেশ্যালিস্টের সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ করে এলো। তারপর নার্সিং হোমের গাড়িতে করে নগেনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে নিখরচায় পরীক্ষা করাল। ডাক্তারবাবু দেখে শুনে ওষুধ আর পথ্যের এক লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। চামেলীর ক্ষমতা হ'ত না দিনরাত্তির অত ওষুধ আর ওই এক গুচ্ছের ইনজেকশন নেবার বন্দোবস্ত করতে পারে। সেও রঘুনন্দন ব্যবস্থা করে দিল। নার্সিং হোমের ডাক্তারদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কোম্পানীর ঘর থেকে ওষুধের ফ্রি স্যাম্পল জোগাড় করে আনল। প্রতিভাময়ী নার্সিং হোমে যে কোম্পানী ওষুধপত্র সাপ্লাই করে, তাদের ধরে ইনজেকশনগুলো নামমাত্র মূল্যে পাবার একটা উপায় হ'ল।

এত করেও রঘুনন্দন কিন্তু তার স্বামীর কাছে সমাদর পায় নি। এই তো গত মাসে নার্সিং হোমের গাড়িতে করে নগেনকে ফের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেল। তারপর অন্য আর এক জায়গায় তার বুকের একটা ছবি তোলানো হ'ল। শেষে চামেলী আর তার স্বামীকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে রঘুনন্দন গাড়ি নিয়ে ফিরল। কিন্তু নগেনের যদি কৃতজ্ঞতার এতটুকু বালাই থাকে। মানুষটাকে একবারও বাড়ির ভিতরে যেতে বলল না। অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যেতেও লোকে অনুরোধ করে। তাছাড়া রঘুনন্দন যখন এমন উপকারী বন্ধু। সে ত্রাণ।

চেষ্টা করলে নগেনের এই শক্ত ব্যামোর কী চিকিৎসা হ'ত? চামেলীর সাধ্য কী যে ওই নাম-করা স্পেশ্যালিষ্ট ডাক্তারের কাছে নগেনকে নিয়ে যায়। তাছাড়া ডাকলেও রঘুনন্দন হয়তো বাড়িতে ঢুকত না। তার এখন অনেক কাজ। সেনগুপ্ত সাহেবকে রাত আটটা বাজলেই সাদার্ন অ্যাভেনিউতে নিয়ে যেতে হবে। তারপর যদি নার্সিং হোমে কোনো খারাপ কেস থাকে তাহলে বড় ডাক্তারকে কল দিয়ে কখনও বাড়ি থেকে তুলে আনতে হয়।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই চামেলী তার মনের জ্বালা উগরে দিল। বলল,—'কী রকম মানুষ তুমি? যে লোকটা গাড়িতে করে নিয়ে গেল, নিখরচায় ডাক্তার দেখিয়ে বুকের ছবি তুলে আনল তাকে এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলতে পারলে না?'

নগেন প্রথমে কোনো জবাব দেয় নি। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,—'আমার সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক নেই। তোর খাতিরেই গাড়িতে করে নিয়ে যায়, বড়ো ডাক্তারকে দেখিয়ে আনে। ইচ্ছে হ'লে তুই না হয় ওকে ঘরে নেমন্তন্ন করে চা খাইয়ে দিলে পারিস।'

কথাটা সোজা নয়, তির্যক। তার একটা অন্য অর্থ আছে। বুঝতে পারলেও চামেলী সেটা গায়ে মাখল না। বরং ঝাঁঝের সঙ্গে বলল,—'রোগটা কিন্তু তোমার, চিকিৎসা করলে তুমি ভাল হবে। আমি দিব্যি সুস্থ আছি।'

—'জানি। আর আমার রোগ হয়েছে বলেই তোর পোয়াবারো। এই ক'মাসে যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস। বাইরের একটা লোককে ঘরে ডেকে চা খেতে বলিনি, তাই বাড়ি ফিরে রোগা স্বামীকে খোঁটা দিতে তোর লজ্জা করে না?'

নগেন হাঁপাচ্ছিল। একটু উত্তেজনা হ'লেই আজকাল সে কেমন ছটফট করে। দেহটা থরথর করে কাঁপে। চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হয়। কে জানে আর বেশী চেঁচামেচি করলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

চামেলী তাই দাঁত চিপে নিজেকে সংযত করল। বছর খানেক ধরে নিয়মিত চিকিৎসায় হাতেনাতে ফল পাওয়া গেছে। নগেন এখন অনেক ভালো। দুর্বলতা কম, রাত্তিরে ঘাম হয় না। ঘঙঘঙে সেই কাশিটা প্রায় নেই। স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার নিজে বলেছেন, আর কয়েকমাস এমনি ধাঁধাধরা নিয়মে থাকলে রোগ নিশ্চয় সেরে যাবে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চামেলী মৃদু হেসে বলল,—'রঘুনন্দন তো তোমার ক্ষতি করে নি। বরং তুমি যাতে ভালো হয়ে ওঠো, সেজন্ত তার চেষ্টার জন্টি

নেই। এমন মানুষের সঙ্গে যদি দুটো মিষ্টি কথা না ব'ল তাহলে সেই বা কী মনে করবে? নার্সিং হোমে দেখা হ'লেই তোমার কথা আগে জিজ্ঞাসা করে। শরীর কেমন আছে জানতে চায়। তখন আমার খারাপ লাগে। একদিনও তো তুমি ওকে বাড়িতে ডেকে ভালো করে কথা বল নি।'

নগেন চুপ করে শুনল। মাঝে মাঝে চামেলীর গলার স্বর যেন বদলে যায়। বিশেষ করে ওই ড্রাইভারটার কথা যখন বলে। কেমন মিষ্টি সুরে তার বক্তব্য রাখে। নগেন লক্ষ্য করেছে ওই লোকটার কথা বলার সময় চামেলীর চোখ-মুখের যেন অন্য রকম চেহারা হয়।

ব্যাপারটা চামেলীও জানে। রঘুনন্দনকে তার স্বামী এতটুকু সহ্য করতে পারে না। আসলে এটা পুরুষের ঈর্ষা। নগেনের ধারণা রঘুনন্দন তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। দুজনের গোপন ভাব-ভালবাসা আছে। শুধু বাইরে পাঁচজনের সামনে অন্য পরিচয়ের আড়াল রাখে। হয় তো স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন বিরূপ ধারণা তার মনে এত দ্রুত স্থায়ী ছাপ ফেলত না। কিন্তু পাড়ায় লোকে এই নিয়ে পাঁচ কথা বলে বেড়ায়। বিশেষ করে ওই ভুবনপিসী। বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে, চামেলী তার কাছ থেকেই সব শুনতে পায়। দিনের বেলা সে যখন ডিউটিতে থাকে তখন ভুবনপিসী তাদের বাড়িতে আসে। প্রথমে নগেনের রোগ-ব্যাধির খোঁজ-খবর নেয়। শরীরের জন্য উৎকণ্ঠা জানায়। শেষে ফিসফিস করে কী যেন বলে। শুনে তার স্বামীর মুখটা কেমন শক্ত হয়ে ওঠে, দৃষ্টিতে জ্বালা ছড়ায়।

রঘুনন্দনের সম্বন্ধে তার স্বামীর যাই ধারণা হোক, মুখে কিন্তু তাকে কিছু বলতে পারে নি। আসলে রোগ-ব্যাধির বড়ো কষ্ট। এমন একটা শক্ত অসুখে পড়ে নগেনের তো প্রথমে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কথায় আছে রাজরোগ। তাদের মতো সাধারণ গরীব পরিবারে কী আর এসব ব্যাধির চিকিৎসা হয়? তাছাড়া বাড়িতে সেই একমাত্র রোজগেরে লোক। চামেলী যে নার্সিং হোমে গিয়ে মাসে চার-পাঁচ'শ টাকা উপায় করবে, নগেন কোনোদিন মনেও ভাবে নি। আর ওই কটা টাকায় কী সুরোদ? শুধু একটা ভরসা। বাড়িতে তারা স্বামী-স্ত্রী, দুটো মেয়ে উপোস করে শুকিয়ে মরবে না। খেয়ে পরে বাঁচবে। কিন্তু চিকিৎসা? ওই টাকায় ফের ওষুধ-পথ্যির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। তাই রঘুনন্দন যখন নিজেই সব ব্যবস্থা করল, তখন কৃতজ্ঞতায় নগেনের অন্তর ভরে উঠেছিল। কিন্তু তারপর সব কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। এই নিয়ে পাড়ায় নানা রকম আলোচনা হ'ল। নগেনের কানে সে সব কথা গিয়ে পৌঁছল। হঠাৎ তার একদিন মনে হ'ল চামেলীর সাজগোজের বহর যেন ইদানিং বেড়েছে। তারপর রঘুনন্দনের হাসিখুশি মুখখানার দিকে তাকাতেই সন্দেহটা যেন আরো দানা বাঁধল।

ফি মাসে একবার করে রঘুনন্দন গাড়ি নিয়ে আসে। নগেনকে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে যায়। চামেলীও গাড়িতে ওঠে। শুধু মেয়ে দুটো কাজের লোকটির কাছে বাড়িতে থাকে। রঘুনন্দন আগেই দেখা করে ডেট নিয়ে আসে। তারপর চেম্বারে গিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দেয়। পর পর ডাক হতে থাকে। তবু রঘুনন্দনকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। ডাক্তারবাবু দু পাঁচজন রুগী দেখে রঘুনন্দনকে পেশেণ্ট নিয়ে আসতে বলে। নগেনকে জামা খুলে ছোট বেডটায় শুয়ে পডতে হয়। তারপর কানে স্টেথো লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে। গত এক মাসে কী ওষুধ ছিল চট করে চোখ বুলিয়ে নেয়। নতুন এক্স-রে প্লেট নিয়ে এলে সেটা চৌকো একটা ফ্রেমে বসিয়ে তাতে আলো জেলে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। শেষে প্যাডের কাগজ নিয়ে খসখস করে নতুন প্রেসক্রিপশন লেখে।

গাড়িতে ফেরার সময় রঘুনন্দন নিজেই বলে,—'ঠিক সময়ে কেসটা এনেছিলাম। আরো দেরি করে এলে গোটা লাংসটা ঝাঁঝরা করে দিত।'

নগেন চুপ করে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না। বরং তার হয়ে চামেলী বলে,—'আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে তাই, নইলে এত তাডাতাডি ডাক হ'ত না। আমাদের কী ক্ষমতা এমন বড ডাক্তারকে ফি-মাসে একবার দেখাতে পারি ?'

রঘুনন্দন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানায়,—'ডাগদার সাহেব বলছিলেন, খাওয়া দাওয়া একটু ভালো করতে হবে। তারপর ওষুধ আর ইনজেকশন ঠিকমতো চললে ছ-মাসের মধ্যে কম্প্লিট সেরে যাবে।'

আরোগ্যের কথা শুনে নগেন সোজা হয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল,—'বুকের আর একটা ছবি তোলার কথা যেন বলছিলেন।'

—'হাঁ। আউর একঠো এক্স-রে প্লেট চাই। সামনের মাসে এখানে আসবার আগে ওটা তুলিয়ে নিলেই হবে', রঘুনন্দন এক মুহূর্ত থামল। ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'তার জন্ম কুছু ভাবতে হবে না। সেনগুপ্ত সাহেবকে বলে আমি এক জায়গায় টেলিফোন করিয়ে নেব। ব্যস্ ওতেই কাজ হবে।' মুচকি হেসে সে ফের বলে,—'ওই ক্লিনিকের মেশিনটা খুব ভালো। নয়া ইম্পোর্টেড জিনিস। সেনগুপ্ত সাহেব বলেন,—ফাস্ট কেলাস ছবি ওঠে।'

বাড়ির সামনে শুভ্রকায় মোটর যান থামিয়ে রঘুনন্দন নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দেয়। প্রথমে চামেলী নামে, পরে নগেন। রঘুনন্দন প্রেসক্রিপশনের কাগজ, দু-একটা ওষুধপত্র থাকলে চামেলীর দিকে এগিয়ে দেয়। গাড়ির পিছনের সীটের সামান্য ওপরে এক্স-রে প্লেটের বড় খামটা পড়ে থাকে। নামার সময় সেটা নেবার

কথা চামেলীকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করে না। তারপর অল্প পরিসরের মধ্যে গাড়িটা সুকৌশলে এক চক্কর মেরে ঘুরিয়ে নেয়। আড়চোখে চামেলীর দিকে একবার তাকায়, হাত নাড়ে। শেষে হুস করে প্রায় রকেটের গতিতে বড় রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে নগেন একদিন বলল,—'তোর ওই নার্সিং হোমের গাড়িতে ডাক্তারের কাছে যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

—'কেন, গাড়ি কী দোষ করল?' চামেলী ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

—'গাড়ির দোষ নয়, তবে পাঁচজনে নানারকম কথা বলে।'

—'কী কথা?' চামেলী স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে।

নগেন মুখ নামিয়ে নেয়। ঠিক কী উত্তর দেবে বোধহয় ভেবে পায় না। অনেকক্ষণ পরে বলে, —'কী কথা তুই জানিস না?'

—'জানি।' চামেলী সদম্ভে জবাব দেয়। 'তবু নিজের সোয়ামীর মুখ থেকে সেটা শুনতে ইচ্ছে করে।'

নগেন চুপ করে থাকে।

চামেলী নিজেই বলে,—'ছি-ছি। পাঁচজনের ওই নোংরা কথা তোমার বিশ্বাস হয়? লোকটা কত ভালো একবার ভেবে দেখলে না? ওর কী স্বার্থ তোমাকে চিকিৎসা করে ভালো করবার? নার্সিং হোমে খোদ সেনগুপ্ত সাহেবের ড্রাইভার। নার্স, কেরানীবাবুরা পর্যন্ত ওকে কত খাতির করে। নেহাৎ আমার দুঃখ-কষ্ট দেখে মায়া হয়েছে, তাই হাসপাতালের গাড়ি নিয়ে এখানে আসে। বড় স্পেশ্যাল ডাক্তারের কাছে তোমাকে নিয়ে যায়। এমন কী সেনগুপ্ত সাহেবকে ব'লে বিনি পয়সায় এক্স-রে ছবি তোলার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছে।'

নগেন বলল,—'পাঁচজনে তো তাই নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার রোগ অসুখে ওই ডেরাইভারটার অত মাথাব্যথা কিসের? সেটা ওরা জানতে চায়।'

—'ওদের মুখে আগুন।' চামেলী চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'পাড়ার যত কুচুক্কুরে মেয়ে-পুরুষ। একটু কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলেই অমনি আড়ালে কু কাটবে।'

নগেন গম্ভীর মুখে বলে,—'তোকে নাকি ওই ডেরাইভারটার সঙ্গে গাড়িতে করে ইদিক-সিদিক যেতে দেখেছে। তাহলে আর ওদের কেমন করে দোষ দিই বল?'

চামেলী চুপ করে যায়। এই অপবাদটা তো মিথ্যে নয়। তাই মুখ তুলে সে তাকাতে পারে না।

নগেন বলে,—'ভুবনপিসী কতদিন বাড়ি বয়ে শুনিয়ে যায়। তোর রোগ-

অসুখই কাল হ'ল বুঝলি ? ওই ছুতো করেই তো মুখপোড়া ডেরাইভারটা তোর বউয়ের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়েছে। ওর মন কাড়বার জন্তেই গাড়ি করে তোকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনে। বিনি পয়সায় ওযুধ জোগাড় করে দেয়।'

চামেলী প্রতিবাদ করে। বলে,—'সব মিথ্যে কথা। ওই হতচ্ছাড়ি ভুবনপিসী হ'ল গিযে যমের অরুচি। নইলে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, এখনও পরকালের কথা মনে পড়ল না ?'

নগেন এবার স্পষ্ট অনুযোগ করে,—'কিন্তু রঘুনন্দন যে তোকে গাড়িতে তুলে ইদিক-সিদিক গিযেছে সে কথা তো মিথ্যে নয় ?'

চামেলী সেটাও অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেয়। বলে,—'আহা। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তাই দেখা হ'তে আমাকে উঠতে বলল। তারপর খানিকটা বেড়িয়ে ওই বড় রাস্তায় নামিয়ে দিযে গাড়ি নিযে চলে গেল। তাই দেখেও পাড়ার লোকের চোখ টাটায়, কী বল ?'

যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, সাদামাটা। চামেলী এমনি ঢঙ করে। হঠাৎ দেখা হ'তে রঘুনন্দন তাকে গাড়িতে তুলে এক চক্কর ঘুরিয়ে এনেছে, এই পর্যন্ত। এতে দোষের কী হ'ল, চামেলীর সেটা বোধগম্য হয না।

কিন্তু সম্পর্কটা কী শুধু তাই ? রঘুনন্দন কেন তার স্বামীকে সারিয়ে তুলবার জন্য এত চেষ্টা করছে ? চামেলীর অনেকবার সে কথা মনে হয়েছে। শুধু নিছক পরোপকার ? কিম্বা চামেলীকে খুশি করবে বলেই তার এই আপাত-নিঃস্বার্থ তৎপরতা। কোনটা যে ঠিক, তা চামেলী নিজেও জানে না। তবে একটা কথা মিথ্যে নয়। প্রথম দিন রঘুনন্দনকে দেখেই চামেলীর বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। কী সুন্দর দেখতে। এমন একটা জোয়ান পুরুষ, এসেই কিনা তার নাম ধরে ডাকল ? মুখ তুলে একপলক তাকিয়ে চামেলী ভারী লজ্জা পেয়েছিল। অথচ মানুষটাকে তার বেশ ভালো লাগল। সামনে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ কথা বলল। তার স্বামীর রোগ-অসুখের খোঁজখবর নিল। একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার অবিলম্বে দেখানো দরকার, নিজেই সেই কথা জানিয়ে দিল।

তারপর রঘুনন্দনের সঙ্গে চামেলীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। দেখা হ'লে কখনও ঠাট্টা-পরিহাস, গাড়িতে কোথাও যাওয়ার সময় এই নার্সিং হোমের অনেক গল্প রঘুনন্দন তাকে শোনায়। কিন্তু ব্যাপারটা তার বেশী গড়ায়নি। রঘুনন্দন তেমন লোক নয়। অন্যের স্ত্রীর প্রতি তার নিজের দুর্বলতার কথা কোনোদিন হাবে-ভাবেও প্রকাশ করে নি। অথচ পাড়ার লোকে তাই নিয়ে রসালো আলোচনা করে। এমন কী রঘুনন্দনের সঙ্গে চামেলীর একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার স্বামী নগেনও বোধহয় সে কথা সত্যি ভেবে বসে আছে।

তবে পাড়ার কেউ নিশ্চয় রঘুনন্দনের সঙ্গে গাড়িতে তাকে যেতে দেখেছে। কিন্তু চামেলী কোনোদিন নগেনের কাছে এসব কথা বলেনি। আর এটা তো মিথ্যে নয়, রঘুনন্দন তাকে গাড়িতে তুলে অনেক দূর দূর জায়গা ঘুরে এসেছে। যেমন দমদম ছাড়িয়ে দুজনে সেদিন বারাসত পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর বি. টি. রোড ধরে সোজা ব্যারাকপুর। ওদিকে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর। আর একবার শীতকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনন্দন সোজা ডায়মণ্ডহারবার চলে গেল। আসলে লোকটা পাগল। গাড়িতে উঠলেই ওকে যেন একটা নেশায় পায়। স্টিয়ারিং ধরে সাঁ-সাঁ ছুটে চলে। চামেলী ভয় পেয়ে কতদিন বলেছে,—'এতো জোরে চালাবেন না। শেষে একটা একসিডেণ্ট হবে।'

রঘুনন্দন মুচকি হাসে। গাড়ির স্পীড্ কমিয়ে চাপাগলায় বলে,—'ডর লাগে ?'

এই নার্সিং হোমের মালিক প্রতিভাময়ী মিত্রের সঙ্গে ডাক্তার সেনগুপ্তের যে একটা গোপন সম্পর্ক আছে সে কথা রঘুনন্দনের কাছে চামেলী প্রথম শুনল। খুব অবাক হয়ে সে বলেছিল,—'উনি তো বিধবা। স্বামী নাকি অনেকদিন মারা গিয়েছেন ?'

—'হাঁ। দশ-বারো সাল আগে।'

—'ছেলেপুলে নেই ?'

—'নেহি। লেকিন বহত রইস আদমী। বড়া মকান, দো-তিন গাড়ি। এহি নার্সিং হোম উনি কা রুপেয়া সে বানা হুয়া।'

চামেলী শুধোল,—'সেনগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে অনেকদিন পরিচয় ?'

—'হাঁ। উন কি হাজব্যাণ্ড সে জান-পহচান থি। আব তো মিসেস মিত্র সে ভি জাদা দোস্তি হো গয়া।'

—'দোস্তি মানে কী ?' চামেলী ব্যাপারটা না বোঝার ভান করে।

রঘুনন্দন ঠোঁট টিপে হাসে। আড়চোখে চামেলীর দিকে তাকিয়ে বলে,— 'মুহব্বত।'

—'ধ্যেৎ! তাই কখনও হয় ?' চামেলী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কয়েক মুহূর্ত পরে মৃদুস্বরে বলে,—'আপনি কেমন করে জানলেন ?'

রঘুনন্দন জবাব দিতে আদৌ সঙ্কোচ বোধ করে না। মিষ্টি হেসে বলে,— হামি সব জানি। আউর উও বাত সেনগুপ্ত সাহেবের ভি মালুম আছে। রাত এগারো-বারো বাজে তক্ সেনগুপ্ত সাহেব তো ওহি মকানে থাকবেন। ছুটিমে কভি ডায়মণ্ডহারবার, শান্তিনিকেতন, নেহি তো দীঘা,—গাড়ি লে কর হামি কিতনা দফে গিয়া।'

রঘুনন্দন কখনও বিস্তারিতভাবে সে কাহিনী বলে। তবে দুজনের সম্পর্কটা নাকি ইদানীং তত মধুর নয়। কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। মাঝে তো একদিন পথে প্রচণ্ড বাদানুবাদ। বাড়ির দরজার কাছে গাড়ি থেকে নেমে মিসেস মিত্র সোজা উপরে চলে গেলেন। অন্যদিন সেনগুপ্ত সাহেবও নামেন। কোনোদিন দুজনে একসঙ্গে ওপরে যান, বেশী রাত্তির হ'লে কখনও নিচে দাঁড়িয়েই বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ফের গাড়িতে উঠে বসেন। সেদিন কী হয়েছিল কে জানে? কিন্তু মিসেস মিত্র আর ফিরে তাকানো প্রয়োজন মনে করেন নি। সেনগুপ্ত সাহেবও গাড়িতে বসে রইলেন। শুধু ইঙ্গিত বুঝে রঘুনন্দন ফের স্টার্ট দিয়ে সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

চামেলী আজ রঘুনন্দনের সঙ্গে সাদার্ন অ্যাভেনিউ গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন নাছোড়বান্দা। এতটা রাস্তা একলা গাড়ি চালিয়ে যেতে ভালো লাগে? আর মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার। মেহাৎ টেলিফোন লাইন খারাপ। তাই সেনগুপ্ত সাহেবের একটা জরুরী চিঠি সেখানে পৌঁছে দিতে হবে।

কিন্তু এক ঘণ্টার কাজ সেরে ফিরে আসতে আড়াই ঘণ্টা কাবার হ'ল রাস্তায় জ্যাম। তারপর মিসেস মিত্রের বাড়িতে অনেক লোক ছিল। চিঠির একটা উত্তর দিতে আধঘণ্টা লাগল। রঘুনন্দন গাড়িটা বাইরে রাস্তার একধারে পার্ক করে রেখেছিল। চামেলী চুপচাপ ব'সে। রঘুনন্দনের ওপর তার এমন রাগ হচ্ছিল।

কাজের মেয়েটা আটটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়। আগেই বাচ্চা দুটো খেয়ে নেয়। নটা না বাজতেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। চামেলী বাড়ি থাকলে নগেনকে সেই খেতে দেয়। নিজেও ভাতের থালা সাজিয়ে নিয়ে বসে। রাত্তিরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে চামেলী শোবার ঘরে এলো। পাশাপাশি দুখানা কামরা। ওই অসুখের পর থেকে চামেলী মেয়ে দুটোকে নিয়ে একঘরে শোয়, নগেন পাশের ঘরে থাকে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্বামীকে এতে রাজি করতে হয়েছে। অন্তত মেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে নগেনকে আপাতত এই ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে। আর ওই বিশ্রী সংক্রামক ব্যাধি। এক বিছানায় সবাই ঘুমোলে আর রক্ষে আছে? বাড়িসুদ্ধ সকলকে রোগে ধরবে।

নাইট-ডিউটি থাকলে চামেলী বেঁচে যায়। নইলে এক-একদিন রাত্তিরে ওই মানুষটা এমন অবুঝ হয়ে ওঠে। এই নার্সিং হোমে চাকরি না পেলে চামেলী নিজেও হয়তো ওকে এমনভাবে এড়িয়ে যেতে পারত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু

আর নার্স দিদিমণিরা হাবেভাবে এবং ইঙ্গিতে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। টি. বি. রোগীর থুতুতে বীজাণু থাকে। আর এইভাবে অতি সহজেই এক দেহ থেকে অন্য দেহে তা সংক্রামিত হতে পারে। নিরুপায় চামেলী তখন অশান্ত মানুষটাকে অনেক অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি করে। তবে নগেন সহজ হয়, সেই রাতটার মতো চামেলী রেহাই পায়।

নগেন আজ নিঃশব্দে খেয়ে দেয়ে উঠে গেল। চামেলী দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু হুঁ-হাঁ ছাড়া তার মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বেরোয় নি। মানুষটার কী হয়েছে চামেলী অনেকক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু মন থেকে কোনো সদুত্তর পেল না।

শোবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চামেলী চুলের ক্লিপ খুলল। কৌটো ঢেলে মুঠো মুঠো পাউডার গায়ে ছড়াল। গালে আলতো করে ক্রীম ঘষল। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ঢঙ করে মুচকি হাসল। তারপর নগেনের কী হয়েছে জানবার জন্য গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

নগেন ঘুমোয়নি, শুয়ে ছিল। তাকে দেখে উঠে বসল। বলল,—'আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

চামেলী বুঝতে পারল নগেন কিছু বলবে। সমস্ত কাজকর্ম শেষ হবার পর সেটা জানাবে, তাই এতক্ষণ দম ধরে বসেছিল। একটি কথাও বলেনি। কিন্তু ব্যাপারটা কী? এই রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়া চুকলে নগেন একটা গুরুতর আলোচনা করবে বলেই যেন প্রস্তুত হয়ে আছে।

চামেলী কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঢঙ করে হাই তুলে বলল,—'রাত্তির হয়েছে। যা বলবে তাড়াতাড়ি শেষ কর।'

নগেন তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। শেষে ওপরওয়ালার মতো ধীরে ধীরে আদেশ করল,—'তোর আর নার্সিং হোমে আয়ার কাজ করবার দরকার নেই। কাল থেকে আর সেখানে যাবি না।'

—'তার মানে?' চামেলী যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিরক্তির সঙ্গে মুখ কুঁচকে বলল,—'তারপর? সংসার চলবে কেমন করে?'

—'আগে যেমন করে চলত।' নগেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাবটা যেন ছুড়ে মারল।

চামেলীর মুখে চট করে কোনো উত্তর জোগাল না। মানুষটার আজ হয়েছে কী? রাত্তিরবেলা কী আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল? আগের মতো নগেন তো আর রোজগারপাতি করে না। বছর ঘুরে গেল প্রেসের সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেকার বসে আছে। তাহলে?

কিন্তু নগেন তাকে রীতিমত চমকে দিল। গম্ভীরমুখে বলল,—'কাল থেকে আমি আবার কাছে বেরুচ্ছি।'

—'কাজে বেরুবে? তুমি?'

—'হ্যাঁ। আজ মালিকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। একজন ভালো মেসিনম্যান তাদের খুব দরকার। আমাকে বললে, যদি ইচ্ছে হয় তাহলে কাল থেকে কাজে লেগে যাও। তা আমি রাজি হয়ে এসেছি।'

চামেলী গালে হাত রেখে বলল,—'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি কাজে বেরুবে?'

—'আমার আর কোনো অসুখ নেই। এখন দিব্যি সুস্থ আছি। আজ মালিক দেখে সে কথা বলল, শরীর নাকি বেশ সেরে উঠেছে।'

—'না, এখনও সারে নি।' চামেলী যেন কথাটা অস্বীকার করল। বলল,— 'অন্তত আরো ছ'মাস চিকিৎসা হ'লে রোগ সারবে।'

—'আমার রোগ-অসুখ থাকলে তোর ভারি সুবিধে, তাই না রে চামেলী?' নগেন বাঁকা হাসল। বলল,—'যখন খুশি ডিউটিতে যাবি। ইচ্ছে মতো ঘুরবি, বেড়াবি। নাইট-ডিউটির নাম করে সারারাত নার্সিং হোমে কাটাবি।'

চামেলী বুঝতে পারল নগেন তাকে খোঁচা দিচ্ছে। জবাব দিতে গেলেই বাকবিতণ্ডা। তাই কথার উত্তর না দিয়ে সে বলল,—'তোমার কাজে বেরুনো এখন চলবে না। আগে ভালো করে সেরে ওঠো। তারপর যেখানে খুশি চাকরিতে যেও, বুঝলে?'

শুনে নগেন যেন জ্বলে উঠল। বলল,—'আমার অসুখ কবে সেরে গেছে। এখন যেটা আছে বলে রটাস সেটা মিথ্যে, তোর আর ওই ডেরাইভারটার চালাকি। দুজনে মিলে একটা বছর আমাকে হাঁড়ির কই-মাগুরের মতো জিইয়ে রেখেছিস। আমার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা বিছানা।' চোখ টিপে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে নগেন বলল,—'এই বয়সে তুই যোগিনী, তাই আমি বিশ্বাস করি ভেবেছিস? আসলে ওই ডেরাইভারটা তোর রূপ-যৌবন ভোগ করছে।'

চামেলী কানে হাত রেখে পিছন ফিরল। বলল,—'ছি-ছি! তুমি একটা মানুষ নাকি? রঘুনন্দনের মতো একজন উপকারী বন্ধুর সম্বন্ধে এমন কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতে জিভে আটকাল না?'

—'না।' নগেন সদম্ভে জবাব দিল। 'আর বন্ধু যদি বলিস, তাহলে সেটা তোর। তবে ফের যদি ডেরাইভারটাকে এখানে ঘুরঘুর করতে দেখি, তাহলে ঠেঙিয়ে ওর বিষ ঝাড়ব।'

কথাটা বলেই নগেন উঠে দাঁড়াল। বউয়ের দিকে এক পা এগিয়ে খপ করে

তার ডানহাতটা চেপে ধরল। চামেলী ভয় পেয়ে বলল,—'কী করছ ?'

—'এখন তো ভালো হয়ে গেছি।' নগেন কেমন মদির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল,—'আজ থেকে আর আলাদা নয়। আমার বিছানাতে শুবি।'

—'না।' চামেলী হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

এক ঝটকায় স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে আনল নগেন। চামেলী বাধা দিতেই একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। উন্মত্ত নগেন তাকে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর লালাসিক্ত ঠোঁট দিয়ে তার দুটি নরম ওষ্ঠ চেপে ধরতে গেল।

চামেলী প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মুক্তি পেতে। কিন্তু অসুস্থ মানুষটার শরীরে যেন অসুরের বল। আক্রান্ত হয়ে সে ভাবছিল লোকটা তার স্বামী নয়। একটা কামার্ত পশু—এক পাত্র কাকচক্ষু নির্মল বারি জিভ দিয়ে চেটে খেতে শুরু করেছে। পরমুহূর্তেই চামেলী একটা কাণ্ড করল। দেহের সমস্ত শক্তির সাহায্যে সজোরে ধাক্কা দিতেই নগেন হঠাৎ উল্টে পড়ল। আর সেই ফাঁকে চামেলী উঠে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—'খবর্দার! যদি আর এক পা এগিয়ে আস, তাহলে চিৎকার করে পাড়াসুদ্ধ লোককে ডাকব।'

এতেই কাজ হ'ল। নগেন থমকে দাঁড়াল। স্বামীর দিকে ঘৃণার জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে চামেলী পাশের ঘরে ঢুকল। দরজায় শক্ত করে খিল এঁটে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। কাজের মেয়েটি কখন এসে বাসনকোসন মেজে রেখেছে। অন্য দিনের মতো চামেলী টুথ-ব্রাশ বের করে পেষ্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল সকালে স্নান সেরে নগেন যেন কোথাও বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। চামেলী বুঝতে পারল সে কাজে যাবে। এখন আর বাধা দিয়ে লাভ নেই। শরীরে অমন শক্ত ব্যামো লুকিয়ে আছে জেনেও যদি কেউ গোঁয়ার্তুমি করে চাকরি নেয়, তাহলে দুদিন বাদেই তার ফলভোগ করবে।

দরজা ঠেলে ভুবনপিসী এসে ঘরে ঢুকল। বলল,—'ও নগেন, শুনেছিস ?'

সাত সকালে ভুবনপিসী কেন এসেছে, চামেলী তা চোখ বুজে বলে দিতে পারে। নিশ্চয় পাড়ায় কারো ঘরে কেচ্ছা হয়েছে। এখন বাড়ি-বাড়ি ঢুকে বেশ রসিয়ে সেই গল্প সাতখানা করে লাগিয়ে বেড়াবে।

ঘরের ভিতর থেকে নগেন বেরিয়ে এলো। শুধোল,—'কী হয়েছে পিসী ?'

—'আবার কী হবে ?' ভুবন পিসি চোখ ঘুরিয়ে কথা কইল। 'ওই যে পটের বিবি, তার কথা বলছিলাম। ঝগড়াঝাঁটি করে সোয়ামী তো বাড়ি থেকে ক'দিন চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ওই বিটি বাদলার বাড়িরে একটা জোয়ান

মন্দকে ধরে এনে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে রইল।

'ছি—ছি!' নগেন ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল। ফের জিজ্ঞাসা করল, —'এ খবর কোথায় পেলে?'

—'খবর কি রে? এ তো হীরালাল স্বচক্ষে দেখেছে। ভোরবেলা সেই লোকটা বাড়ি থেকে চলে গেল। আর ওই পটের বিবি নিচে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে নেড়ে কত ঢঙ করল।'

নগেন চিন্তিত মুখে বলল,—'এ তো পাড়ায় ঘরে কেলেঙ্কারী। এখন কার মুখ চাপা দেবে?'

আগের কথার জের টেনে ভুবনপিসি বলল,—'বাড়ির ছোঁড়া চাকরটা সব ফাঁস করে দিয়েছে। দুপুরবেলা ওই লোকটা নাকি গিন্নির সঙ্গে এসেছিল। খেয়ে দেয়ে দিব্যি এক ঘুম পিটিয়ে দুজনে কোথায় সিনেমা-থিয়েটার দেখতে গেল। তারপর ওই ঝড-বিষ্টি, এদিকে ঘরে সোয়ামী নেই। তাই লোকটাকে সঙ্গে করে ফিরল। রাত্তির-বেলা আলমারি খুলে কর্তার ইস্ত্রি করা জামা-কাপড় বের করে তাকে পরতে দিল।'

চামেলীর আর শুনতে প্রবৃত্তি হ'ল না। সে একটা তোয়ালে গায়ে ফেলে স্নান করবার অছিলায় বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিল।

আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে ভুবন পিসী বলল,—'মেয়েমানুষকে ঘরের বাইরে যাবার রাস্তা দেখাতে নেই, বুঝলি? তাহলেই একটা লটখট বাধিয়ে বসবে।'

নগেন জামাটা গায়ে গলিয়ে উঠোনে নেমে দাঁড়াল। ভুবনপিসী শুধোল,— এখন যাবি কোথায়?'

—'কাজে যাচ্ছি।' নগেন মুখ উজ্জ্বল করে হাসল। নিজেই ফের বলল, —'কাল প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম যে। তা আমাকে আজ থেকেই জয়েন করতে বলল।'

—'তাই নাকি? নিশ্চয় কাজে যাবি। এখন তো দিব্যি সেরে উঠেছিস।' ভুবনপিসী একগাল হাসল। বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে ফের বলল,—'পুরুষমানুষকে বসে থাকতে নেই। কেন জানিস?'

—'কেন পিসী?'

—'লোহা ফেলে রাখলে জং ধরে। পুরুষমানুষও তাই। বসে থাকলেই বুড়িয়ে যায়। তখন ঘরের বউ মাথায় চড়ে বসে। আর নামতে চায় না।'

—'হুম্, মাথায় উঠে বসলেই হ'ল?' নগেন প্রায় একটা হুংকার ছাড়ল। স্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলল,—'ওকে আমি পস্ট বলে দিয়েছি পিসী। আর ওই নার্সিং

হোমে আয়ার কাজে যেতে হবে না। এখন থেকে ঘরের-বউয়ের মতো থাকবে।'

—'আর সে যদি তোর কথা না শোনে?', ভুবনপিসী মুচকি হাসল।

—'শুনলেই ভালো। নইলে জানো তো পিসী মাথায় রাগ চড়ে গেলে আমি শালা কারো নই।' নগেন বীরত্ব প্রকাশ করে জানাল,—'তখন স্রেফ বাপের কুপুত্তুর।'



সদলবলে কোৎনা ঘোষ এসে হাজির হ'ল প্রাণবল্লভ বরাটের দরজায়।

বড়ো রাস্তার ধারে দোতলা বাড়ি। এতকাল একতলা ছিল, প্রাণবল্লভ সেখানে বাস করত। মাসখানেক হ'ল দোতলা কমপ্লিট হয়েছে। তাও ইলেকট্রিক ওয়্যারিং, ভিতরের প্লাস্টারের কাজ সামান্য বাকি। ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ করল। দোতলাটা এখন বাসের উপযোগী। আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণবল্লভ সপরিবারে ওপরতলায় উঠে যাবে, একতলাটা তার ভাড়া দেবার ইচ্ছে।

প্রাণবল্লভের ছিটকাপড়ের দোকান আছে মানিকতলায়। হাড়কেপ্পন লোক, আঙুলের ফাঁকে নাকি জল গলে না। কিন্তু তা হ'লে কী হবে? বাড়িখানা করেছে চমৎকার। ভালো মেটিরিয়্যালস্, বড়ো সাইজের গ্রীলের জানালা, একপাল্লার দরজা। একতলায় শুধু দুখানা ঘর, কিন্তু দোতলা পুরো মোজেইক। লোকে অবশ্য জানে বাড়ির প্ল্যানটা প্রাণবল্লভের নয়। তার বড়ো ছেলে চাকরি করে রাঁচীতে। বাড়ির নকশা সেখানের কোন ভালো ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি। ক'লকাতায় এসে তদ্বির-তদারক করে বড়ো ছেলে নিজেই সেটা কর্পোরেশন থেকে পাশ করাল। গৃহনির্মাণের সময় দেখাশুনো করবে বলে দু-মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে রইল। একতলা বাড়িটা প্রাণবল্লভ নিজের টাকায় করেছে। দোতলার পুরো খরচ তার দুই ছেলের।

বেলা প্রায় একটা হবে। বাড়ির দরজার কাছে একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে কী দেখছিল। কোৎনা ঘোষের সঙ্গে তার দুই প্রধান সাকরেদ,—লালটু পরাণ আর কানকাটা কানাই। এ ছাড়া ট্যারা হারু আর বেঁটে বলাই পিছনে আছে।

বৃদ্ধ লোকটিকে লক্ষ্য করে হারু জিজ্ঞাসা করল,—'প্রাণবল্লভবাবু আছেন?'

লোকটা কোনো জবাব দেবার আগেই লালটু পরান চেঁচিয়ে বলল,—'আবে,

আওয়াজ দে। আওয়াজ দে।'

সঙ্গে সঙ্গে হারু আর বলাই হাঁক ছাড়ল,—'প্রাণবল্লভবাবু আছেন? ও মোশায়—'

বাজখাঁই গলার ডাক। শুনলে ছোট ছেলে পর্যন্ত ভয় পেয়ে কেঁদে উঠবে। দুর্বল মানুষের পিলে চমকে ওঠা অসম্ভব নয়। একটু আগে প্রাণবল্লভ দোকান ছেড়ে খেতে এসেছে। হাত-পা ধুতে বাথরুমে ঢুকবে। তার নাম ধরে অমন বিকট চিৎকার শুনে ফিরতে হ'ল। দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই প্রাণবল্লভের মুখে প্রথমে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল। এই ভরদুপুরে, কোৎনা ঘোষ তার দলবল নিয়ে বাড়িতে চড়াও হ'ল কেন? কই, সে তেমন কিছু করেছে বলে মনে হয় না। বরং এই তো বিশ্বকর্মা পুজোয় ফিস্টি করবে বলে কোৎনা ঘোষ তার নামে এক'শ টাকা চাঁদা ধরেছিল। তা অনেক বলে কয়ে প্রাণবল্লভ পঞ্চাশটি টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে রেহাই পেয়েছে। তাহলে ওরা আবার কেন তার দরজায় এসে ডাকাডাকি শুরু করল?

প্রাণবল্লভ সামনে এসে দাঁড়াতেই কোৎনা একগাল হেসে বলল,—'আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল দাদা।'

অনুরোধ? প্রাণবল্লভ একটা ঢোক গিলল। কোৎনা ঘোষ বাড়ি বয়ে এসে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছে? কান মানুষকে প্রবঞ্চনা করে নাকি?

তার হতবাক অবস্থা দেখে কানকাটা কানাই পিছন থেকে জুড়ে দিল,—'ইয়ে মানে গুরু আপনাকে একটা কথা বলবে মোশায়।'

লালটু পরাণ মন্তব্য করল,—'শুনে আপনি একবার হাঁ বলে দিন দাদা। ব্যস্ আমরা চলে যাচ্ছি।'

কী ব্যাপার? প্রাণবল্লভ আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগল। এমন কী ঘটল যে কোৎনা ঘোষ এসে তার দ্বারস্থ হয়েছে? কোনো কাজের জন্য নরম গলায় তাকে অনুরোধ করছে।

অগত্যা প্রাণবল্লভকে বলতে হ'ল,—'কী ব্যাপার কোৎনাবাবু? আমার মতো সামান্য মানুষের কাছে আবার কী দরকার পড়ল?'

—'দরকার যে কখন কাকে হয়, তা কে বলতে পারে দাদা?' নাকটা ঈষৎ কুঁচকে কোৎনা সামান্য হাসল। বলল,—'আমার এক ফ্রেণ্ড আছে, তার জন্যে আপনার কাছে আসতে হ'ল।'

—'আপনার ফ্রেণ্ড মানে বন্ধুর জন্যে?' প্রাণবল্লভ একই কথার অহেতুক পুনরাবৃত্তি করল। জিভটা সচল করে নিয়ে বলল,—'তা বেশ তো, আমাকে কী করতে হবে?'

ট্যারা হারু ঠিক কোনদিকে নজর রাখে বোঝা কঠিন। মারপিটের সময় ওটা তার বাড়তি সুবিধে। দুম করে এমন একটা অস্তর ঝাড়ে যে প্রতিপক্ষ ধরতে পারে না। সে তেমনি দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—'খুব সামান্য ব্যাপার, বুঝলেন ? গুরু এখুনি সব খুলে বলবে।'

কোৎনা ঘোষ আর ঢঙ করল না। পরিষ্কার গলায় বলল,—'আপনার এই একতলাটা আমার এক ফ্রেণ্ড মানে বন্ধুকে ভাড়া দিতে হবে। ওর খুব দরকার।'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা প্রাণবল্লভের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। কোৎনা ঘোষের কোনো লোককে তার বাড়ির একতলার অংশটা ভাড়া দিতে হবে। প্রাণবল্লভ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখল, এই অনুরোধ এড়িয়ে যাবার মতো ক্ষমতা তার নেই। কোৎনাকে জবাব দিয়ে যদি অন্য কোনো লোককে ভাড়াটে বসায়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে ? তবু সে বলল,—'ইয়ে মানে আপনার বন্ধু একতলাটা ভাড়া নিতে চান ? কিন্তু—'

কোৎনা ঘোষ তির্যক দৃষ্টিতে প্রাণবল্লভের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে কী যেন লক্ষ্য করল। হেসে বলল,—'ও কিন্তু নিয়ে আপনি ভাববেন না দাদা। আমার বন্ধু পয়সাওলা লোক, ন্যায্য ভাড়া দিতে সবসময় রাজি।'

বেঁটে বলাই এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বলল,—'মানে কিছু অ্যাডভান্স কিংবা সেলামী যদি নিতে চান—'

—'আই, অ্যাই। তুই চুপ কর।' কানকাটা কানাই তাকে একটা ধমক দিল।

কোৎনা নিজেই বলল,—'মিছিমিছি অ্যাডভান্স নিয়ে কী করবেন ? মাস গেলে আবার ভাড়া থেকে সেটা কাটা যাবে। তার চেয়ে বরং কিছু সেলামী নিন দাদা। বাড়ি করতে কত টাকা বেরিয়ে গেছে। অল্প একটু উশুল হবে।'

চমৎকার প্রস্তাব। না, কোৎনা অন্যায় কিছু বলেনি। বরং বাড়ির মালিকের স্বার্থ ষোল আনা দেখছে। এমনিতে আপত্তি করবার মতো কোনো কারণ নেই। শুধু মানুষটা কেমন, পরিবারে কজন লোক একবার সেটা জানতে হবে। তবে বাড়িঅলা এবং ভাড়াটের মধ্যে কোৎনা ঘোষের উপস্থিতি খুব সুবিধের হবে বলে তার মনে হ'ল না।

একটু চিন্তা করে প্রাণবল্লভ বলল,—'আপনার সেই বন্ধুর নামটি কি ?'

কোৎনা একগাল হেসে উত্তর দিল,—'ওর নাম রমেশ,—রমেশ আগরওয়াল।

—'আগরওয়ালা ? মানে নন-বেঙ্গলী ?' প্রাণবল্লভকে হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ দেখাল।

—'ছি-ছি!' কোৎনা এবার যেন তাকে ধমকে উঠল,—'এখনও আপনার ওই প্রাদেশিক মনোভাবটা গেল না দাদা।' মিষ্টি হেসে কেষ্ট বলল,—'মনে

রাখবেন আগে আমরা ভারতবাসী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী,—উই অল ইণ্ডিয়া।' অশুদ্ধ ইংরাজী বলে কোৎনা দিব্যি গর্বের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

একথার জবাব নেই। প্রাণবল্লভ তাই অন্যদিকে বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। মৃদু হেসে বলল,—'তাহলে ছেলেদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি। দোতলাটা তো ওদের টাকাতেই তৈরি হয়েছে।'

কোৎনা ঘোষ মুচকি হাসল। বলল,—'আপনি থাকতে ওই ছেলেদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তাই কখনও হয় দাদা? আর এই সংসারের আপনি হলেন মাথা। যা বলবেন ছেলেরা তাই হুকুম বলে জানবে।'

প্রাণবল্লভ মহা ফাঁপরে পড়ল। কোৎনাকে এড়িয়ে যাবার কোনো পথ নেই। সব দিক আগলে যেন সে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে ধরা দিতেই হবে। এরপর ওকে কী বলা উচিত প্রাণবল্লভ গভীরভাবে তাই চিন্তা করছিল।

কোৎনা এবার এক চালে বাজিমাৎ করল। পকেট থেকে নোটের একটা তাড়া বের করে প্রাণবল্লভের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,—'আড়াই হাজার টাকা রাখুন দাদা। এটা সেলামী।'

টাকাটা হাতে নিতে প্রাণবল্লভ তখনও ইতস্তত করছে।

কোৎনার পাশে লালটু পরাণ দাঁড়িয়ে। সে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল,—'টাকাটা সরিয়ে রাখুন মোশায়। দিনকাল ভালো নয়। খবর পেয়ে কোন শালা রাত্তিরে হাপিচ করে দিতে আসবে।'

প্রাণবল্লভ এবার সত্যি ভয় পেল। টাকাটা পকেটে রেখে সে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল,—'কিন্তু তারা কজন লোক? মাসে কত ভাড়া কিছুই তো ঠিক হ'ল না।'

কোৎনা তাকে আশ্বস্ত করল। বলল,—'লোক বেশী নয়। মাত্র পাঁচজন,—স্বামী-স্ত্রী, বুড়ো মা আর দুটি বাচ্চা।'

—'ভদ্রলোক কী করেন?'

—'বৌবাজারে দোকান আছে। সানমাইকা, ফরমাইকা, আরো কী সব জিনিসের ব্যবসা।' কোৎনা ফলাও করে শোনাল।

প্রাণবল্লভ ফের বলল,—'আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক হ'ল না কোৎনাবাবু, মানে ভাড়া কত দেবে?'

এতক্ষণে কোৎনা প্রায় স্বমূর্তি ধারণ করল। মুখখানা বিকৃত করে ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'তখন থেকে খালি ফ্যাচফ্যাচ করছেন মোশায়। যত ভালো কথা বলি, তত নকশাবাজি হচ্ছে আপনার।' ঢোক গিলে বেশ শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে ফের কথা কইল,—'বলেছি তো ন্যায্য ভাড়া আমার বন্ধু দিতে রাজি।

তা তিনখানা ঘরে আড়াই'শ টাকা ভাড়া লিবেন। কী, চলবে?'

—'মাত্র আড়াই'শ টাকা? আমার দুখানা ঘরে মোজেইক করা মেঝে।' প্রাণবল্লভের চোখে গভীর হতাশা।

কোৎনা এবার সাফ জবাব দিল। চোখ পাকিয়ে বলল,—'ঠিক আছে। তাহলে তিন'শ টাকা কথা রইল মোশায়। কিন্তু এতেই রাজি হতে হবে। কাল সকালে ট্যারা হারু এসে টাকা দিয়ে এক মাসের ভাড়ার রসিদ লিয়ে যাবে।'

দলবল নিয়ে কোৎনা ঘোষ আর দাঁড়াল না। বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে বসন্তবিলাস রোডের দিকে এগিয়ে গেল।

বেঁটে বলাই বলল,—'গুরু, শালাকে শেষকালে যা একখানা কড়কে দিলে না। ওতেই ব্লাডার ফেঁসে গিয়েছে।'

মন্তব্য শুনে কোৎনা খুশি হ'ল। বলল,—'চল, আজ ম্যাটিনি শোতে সবাই মিলে একটা ঝাড়পিটের বই দেখে আসি।'

কানকাটা কানাই হঠাৎ বলল,—'গুরু, এবার একটু ঝেড়ে কাশ দিকি বাবা।'

—'কী জানতে চাস?' কোৎনা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

লালটু পরাণ বলল,—'গুরুকে খামোকা চটিয়ে দিচ্ছিস কানাই। মাথায় রক্ত চড়ে গেলে তখন সামলাতে পারবি?'

কোৎনা হাসল। কানাইকে বলল,—'আগরওয়ালার কাছে কত টাকা ঝেড়েছি তাই জানতে চাস তো?'

—'হাঁ-হাঁ।' কানকাটা কানাই মাথা নাড়ল। বলল,—'সেই লোকটাকে তো কখন থেকে ফ্রেণ্ড, নিজের বন্ধু, কত কী বলছিলে। আর আমরা যেন শত্তুর।'

কোৎনা বলল,—'শালা আগরওয়াল একটি চীজ্‌। তিন কামরার ফ্ল্যাটের জন্যে দশ হাজার টাকা সেলামী দিতে রাজি।'

—'দশ হাজার।' ট্যারা হারু অস্ফুটে বলল।

—'হ্যাঁ। কিন্তু তিন'শ টাকার বেশী ভাড়া কিছুতেই খসাতে চায় না।'

বেঁটে বলাই বলল,—'দশ হাজার টাকা সেলামী দিতে পারে, অথচ তিন'শ টাকার বেশী ভাড়া দেবে না,—এ যেন কী রকম কথা বলছ গুরু।'

—'তোর মাথায় শালা গোবর পোরা আছে।' কোৎনা যেন তাকে চিমটি কাটল। ফের হেসে বলল,—'আগরওয়াল হিসেব ঠিক বোঝে। তোর কিম্বা আমার চেয়ে অনেক বেশী তলিয়ে চিন্তা করে। এক থোকে দশ হাজার রুপিয়া সেলামী দিলেও ওর বরং লাভ হয়। দু-নম্বরী টাকা,—যেমন যাবে তেমনি আসবে। ও টাকা দিয়ে তো আর ব্যাংকের সুদ মিলবে না। কিন্তু ধর, ভাড়া

যদি পাঁচ'শ টাকা হয় তাহলে ফি-মাসে আরো দু'শ টাকা করে গচ্চা যাবে। তার মানে বছরে প্রায় আড়াই হাজার। চার বছরে দশ হাজার। তারপর যদি বিশ-পঁচিশ বছর এখানে থাকে তাহলে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা ফালতু লোকসান। ব্যাংকের সুদ ধরলে হয়তো এক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে।'

—'আই বাপস্।' কানকাটা কানাই গালে হাত রেখে বলল,—'তাজ্জব বাত, আমি কেন, আমার চোদ্দ পুরুষ এলেও এমন হিসেবের মারপ্যাঁচ ধরতে পারবে না।' আড়চোখে কোৎনার দিকে তাকিয়ে ফের যোগ করল,—'কিন্তু তুমিও মাইরি বেশ ভোজবাজি দেখালে। আধঘণ্টার মধ্যে কেমন সুড়সুড় করে সাড়ে সাত হাজার টাকা পকেটে এসে গেল।'

লালটু পরাণ বলল,—'আমাদের কিছু বখরা ছাড়বে না গুরু?'

—'হ্যাঁ পাবি।' কোৎনা উদারকণ্ঠে ঘোষণা করল। ফের ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে বলল,—'আগে আগরওয়ালের জিনিসপত্র ঘরে আসুক। শালা প্রাণবল্লভ না আবার বেগড়বাই করে।'

—'বেগড়বাই অমনি করলেই হ'ল? ন্যাকড়াবাজি পেয়েছে নাকি?' বেঁটে বলাই গর্জে উঠল। বলল,—'রাত দুপুরে দেব শালার বাড়িতে একটা পেটো চার্জ করে?'

বসন্তবিলাস রোড থেকে বেরিয়ে হিয়া চৌধুরী বড়ো রাস্তায় পা দিল। কোৎনা ঘোষ আর তার দলবলের সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি দেখা। সে পাশ কাটিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

লালটু পরাণ মুচকি হেসে বলল,—'গুরু, এই তো পটের বিবি।'

কোৎনা নির্লজ্জের মতো একবার হিয়ার দিকে তাকাল। ফের তাকে শুনিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠল,—

সখি, কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

হিয়া চৌধুরী আর সেখানে দাঁড়ানো সঙ্গত মনে করল না। হনহন করে হেঁটে সি. আই. টি রোডের দিকে এগিয়ে গেল।

কোৎনা ঘোষ তার সাকরেদদের সঙ্গে বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। হিয়া চৌধুরী কিছুদূর গেলে সে অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ অশালীন ভঙ্গিতে হা-হা করে হাসল। ফের চেঁচিয়ে বলে উঠল,—মহাসতী বেহুলা।



বাস এসে থামল কর্পোরেশন বাড়ির স্টপে। হিয়া সাধারণত এখানেই নামে। গাড়িটা প্রায় খালি হয়ে যায়। অল্প কিছু যাত্রী থাকে। তারা চৌরঙ্গী রোড পেরিয়ে ময়দানে বাসের টার্মিনাস অব্দি যাবে।

গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট ছাড়িয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত সুরেন ব্যানার্জী রোডে সবদাই গাড়ির ভিড়। প্রায়ই যানজট লেগে থাকে। আবার ট্রাফিক পুলিশ যখন গাড়ি ছাড়ে তখন হু-হু করে সব যেতে থাকে। রাস্তা পেরোবার ফাঁক মেলে না।

ইউ. এস. আই. এস. অফিসটার পাশ দিয়ে হিয়া এলো মেট্রো সিনেমার কাছে। আজ বুধবার। সেই ঝড়জলের রাত্তিরের পর প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। মাঝে পুজো এলো। কটা দিন খুব হৈ-চৈ, পাড়ায় প্যাণ্ডেল বেঁধে সার্বজনীন পুজো হয়। বিসর্জনের আগে পর্যন্ত দিন-রাত্তির মাইকে গান চলে। কখনও নাটক কিংবা কাবিকেচার।

পাড়ায় পুজো, তাই ফি-বছর রতীশের নামে একটা মোটা টাকার চাঁদা ধরে। এবার তো হাজার টাকা চেয়ে বসল। প্রথমে পাঁচ'শ টাকা দিয়ে রেহাই পেলেও পরে আবার রতীশকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। বিজয়ার দিন ঠাকুর বিসর্জনের টাকায় টান পড়ল। লরি ভাড়া, ব্যাণ্ড পার্টি, তারপর আট-দশটা রিকশতে সঙ বেরোবে। এ ছাড়া লাইট, জেনারেটর ইত্যাদি আরো অনেক খরচ আছে। কম করেও আড়াই হাজার টাকার ধাক্কা। তার জন্য সকলকেই অল্পবিস্তর আরো একবার উপুড়হস্ত করতে হ'ল। রতীশের কাছে দু'শ টাকা আদায় না করে পুজো কমিটি ছাড়ল না। শুধু কী তাই? বিজয়া দশমীর কয়েক-দিন পরে পাড়ার ছেলেরা একটা জলসার আসর বসাল। তেমন বড়দরের আর্টিস্ট না পেলেও কয়েকজন মাঝারি গ্রেডের শিল্পী এসে গান গাইল। তার জন্যও চাঁদা পড়ল। জলসার উদ্যোক্তারা রতীশকে আরো দেড়'শ টাকার কমে রেহাই দিল না।

গত দু-মাসে প্রতি বুধবার হিয়া মেট্রো সিনেমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এমনি সময়, বেলা দেড়টা-দুটোর মধ্যে। শুধু একটা দিন বাদে। এবার নবমীতে বুধবার পড়েছিল। ওই দিনটা হিয়া আর বাড়ি ছেড়ে আসে নি।

পুজোর তিন দিন আগে স্কুলের ছুটি হতেই নিলয় চলে এলো। বাড়ি এলে ছেলেটা প্রায় দু-সপ্তাহের মতো থাকে। তার মধ্যে মামাবাড়িতে তিন-চারদিন কাটিয়ে আসে। বাকি কটা দিন নিলয় তাকে ছাড়তে চায় না। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হিয়া দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়ে। ধর্মতলা, চৌরঙ্গী কিংবা পার্কস্ট্রীটে যায়। একদিন মিউজিয়ম অথবা চিড়িয়াখানা যাবার প্রোগ্রাম থাকে। কখনও সিনেমা দেখার জন্য ছেলে বায়না ধরে। ওদের স্কুলের নিজস্ব ছোট হল আছে। সেখানে ছেলেদের উপযোগী ভালো ছবি দেখান হয়। নিলয়ের কিন্তু ঝাড়পিটের বই দেখার ঝোঁক বেশী। ওকে সঙ্গে নিয়ে হিয়া কোনোদিন হলে এসে ঢোকে। হিন্দি ছবি ও আর কতটুকু বোঝে? কিন্তু ঝাড়পিটের দৃশ্য দেখতে বেশ মজা পায়।

ছেলে যে কটা দিন বাড়িতে থাকে, রতীশ যেন পালিয়ে বেড়ায়। তার ব্যবসার কাজ নাকি তখন দ্বিগুণ হয়। কোনো কথা বললেই খুব ব্যস্তভাব দেখায়। তিন মাসের চুক্তিতে যে লরিটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। অথচ পার্টি আর নতুন চুক্তি করতে চাইছে না। এদিকে সামনের সপ্তাহে এক ট্রাক মাল মাদ্রাজে যাবে। তার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। কথার খেলাপ হ'লে ফার্মের গুডউইল নষ্ট। আর একবার বদনাম রটে গেলেই ব্যবসা লাটে উঠবে। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।

হিয়া মুখ গম্ভীর করে বলল,—'ব্যবসা তো তোমার একার নয়। চন্দ্রকান্ত বাবু একজন পার্টনার। এই কটা দিন কাজ-কারবারের দায়িত্ব তাকে দিলেই পার।'

শুনে রতীশ যেন চমকে ওঠে। বলে,—'চন্দ্রকান্তকে ছেড়ে দিলেই হ'ল? বাইরের কাজকর্মের ও কী বোঝে? হুট করে একটা গাড়ির দরকার হ'লে ওর জোগাড় করবার ক্ষমতা আছে?'

—'তাহলে মিছিমিছি ওকে পার্টনার করেছ কেন? লাভের সিকি টাকা তো ঠিক নিয়ে যাচ্ছে।'

রতীশ বলল,—'পার্টনার করতে হ'ল অন্য কারণে। অফিসটা দেখাশুনো করবার জন্য একজন লোক দরকার ছিল। পার্টি মাল জমা দিলে তার চালান কাটতে হয়। সেই মাল স্টোরের খাতায় উঠল কিনা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তারপর ডেলিভারী দেবার সময় হিসেবের খাতায় তুলছে কিনা সেটা চেক করতে হবে। নইলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে। তারপর যাবু মাল সে এসে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে যাক।'

ব্যবসার খোঁজখবর হিয়া রাখে না। রতীশও তাকে কোনোদিন জানাবার

প্রয়োজন মনে করে নি। তবে ব্যবসা যে ভালো চলে হিয়া সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। কাজের দিনে ব্যবসার কাগজপত্র রতীশ কখনও সঙ্গে আনে না। আর সে সময় কোথায়? বাড়ি ফিরে প্রতিদিন তাকে বোতল নিয়ে বসতে হয়। মনমর্জি ভালো থাকলে একটু কম খায়। স্ত্রীর সঙ্গে দুটো বেশী কথা বলে। নইলে তো মাল টেনে পাঁড় মাতাল, কোনোদিন মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়। হিয়া এসে তাকে অতি কষ্টে তুলে ধরে, একটা বোঝার মতো বিছানায় ছুড়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে। রবিবার দিন সন্ধে টা রতীশ বাড়িতে থাকে। ফোলিও ব্যাগে ব্যবসার নানারকম কাগজপত্র, খাতা-বই আগের দিন ঘরে নিয়ে আসে। সন্ধে থেকেই সেগুলি নিয়ে বসে। একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে কী যেন লেখে। যোগ দেয়, আবার বিয়োগ করে। কখনও চিন্তিত মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছু ভাবে।

ব্যবসার প্রসঙ্গ উঠলেই হিয়া কোনোদিন বলে,—'কী যে এত ছুটোছুটি কর বুঝি না। বাড়ির কথা ছেড়ে দিলাম, সে অনেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু এতদিন পরেও তো একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনতে পারলে না। অথচ হীরালালবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখেছ? ক'বছরের মধ্যেই অমন বাড়ি, দু-খানা গাড়ি করে বসে আছে। সেদিন পিতুর মা বলছিল ভদ্রলোক এবার একটা হিমঘর তৈরী করবেন।'

—'হিমঘর মানে কোল্ড স্টোরেজ?' রতীশ মুখ তুলে তাকায়।

—'হ্যাঁ। পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকার কমে নাকি হবে না। তবে সেটা বেশ বড়ো মাপের কোল্ড স্টোরেজ। ষাট-সত্তর হাজার কুইন্টল আলু অনায়াসে রাখা চলবে।'

রতীশের মনটা ভালো ছিল। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরিহাসের সুরে বলল,—'ও বাবা! তুমি তো দেখছি হীরালালবাবুর নতুন ব্যবসার অনেক খবর জেনে বসে আছ। তা এত সংবাদ পেলে কোথায়?'

—'এই বসন্তবিলাস রোডে কোনো কথা চাপা থাকে নাকি?' হিয়া মুখ নিচু করে জবাব দেয়। বলে,—'এখানে কার ঘরে কটা তরকারি রান্না হচ্ছে, মেয়েরা সে খবরও জানে।' স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলল,—'এই যে রাত-দুপুরে তুমি ঘরে মাতলামি কর, পাড়ার কারো সেটা জানতে বাকি আছে?'

কথা নয় খোঁচা। রতীশ তাই গম্ভীর হয়ে গেল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'মদ খাই, বেশ করি। বাড়িতে বসে নিজের পয়সায় খাচ্ছি। পাড়ার লোকের তাই নিয়ে অত মাথাব্যথা কিসের?'

—'মাথাব্যথা হতে যাবে কেন? তারা আড়ালে হাসে। মদ খেয়ে মাতাল

হয়ে মেঝোতে গড়াগড়ি দিয়েছ শুনলে মজা পায়। আমাকে অনুকম্পা করে।'

রতীশ এ কথার কোনো জবাব দিল না। মুখ নিচু করে তার ব্যবসার কাগজপত্রে চোখ রাখল।

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে হিয়া ফের জিজ্ঞাসা করল,—'কই, আমার আগের কথার তো উত্তর দিলে না?'

রতীশ তেমনি গম্ভীরমুখে বলল,—'নিজের গাড়ির চেয়ে আমার আর একটা ট্রাকের অনেক বেশী দরকার। তাই কিনতে পারছি না।'

—'কেন পারছ না সেটাও তো বোঝা শক্ত। আজ আট-ন বছর ধরে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছ, সারাদিন ছুটোছুটি, খাটাখাটুনির কিছু কমতি নেই, —লাভের টাকা তাহলে কোথায় গিয়ে জমছে?' হিয়া এক মুহূর্ত থামল। বাঁকা হেসে ফের বলল,—'বিদেশ থেকেও নাকি লাখখানেক টাকা নিয়ে এসেছিলে। তারপর আমাকে লুকিয়ে কিছুদিন স্মাগলিং'এর কারবার করলে। শুনেছি তাতেও মোটা টাকা লাভ হ'ত।'

রতীশ আড়চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করল। দু-চার সেকেণ্ড পরে সে নিশ্চিন্ত হ'ল। না, স্মাগলিং'এর কারবার করতে গিয়ে রতীশ যে একদিন জালে ধরা পড়ে যাচ্ছিল, হিয়া সে খবর পায় নি। অবশ্য তার জানবার কথা নয়। একমাত্র চন্দ্রকান্ত সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। খুব গোপনে সব ঠিক হয়েছিল। রতীশ জানতে পারে নি। জাহাজের মধ্যে সার্চ হতেই অত টাকার মাল ধরা পড়ল। সবটাই ক্ষতি। টাকা তো আগেই দিতে হয়েছে। সে ধাক্কা সামলে উঠতে রতীশের বহুদিন লেগেছিল। তবে তার গায়ে আঁচড় লাগে নি। নইলে বামালসুদ্ধ ধরা পড়লে নির্ঘাত কয়েক বছর শ্রীঘর বাস করতে হ'ত। বেরিয়ে আসবার কোনো পথ ছিল না। সেদিন বাড়ি ফিরে রতীশ নাকে খত দিয়েছিল। মোটা লাভের আশায় আর ওই স্মাগলিং'এর কারবারে যাবে না। তারপর এই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা ধরল। তাও পুঁজি কম, হাতে টাকাকড়ি কোথায়? তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে একটা ছোট ঘর নিতেই মোটা টাকা সেলামী দিতে হ'ল। বছর দুই তো ব্যবসা জমে নি। নতুন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে বিশ্বাস করে কে মাল দিতে যাবে? যদি পথের মধ্যে খোয়া যায় কিংবা কোম্পানী রাতারাতি লালবাতি জ্বালে? ব্যাঙ্ক থেকে লোনের ব্যবস্থা করে রতীশ প্রথমে ট্রাক কিনল। বছর চার পরে আবার ট্রাক নিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দু-তিন সাল হ'ল কারবার মোটামুটি জমে উঠেছে। তার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর একটা গুড-উইল তৈরি হয়েছে বাজারে। এখন লোকে মাল দিতে ভরসা পায়। আসাম, মাদ্রাজ, কেরালা,—সর্বত্র ট্রাক যাচ্ছে। তাও এখনও অনেক কিছু প্রয়োজন।

অফিস ঘরটায় আর জিনিসপত্র কুলোয় না। পাশে একটা ঘর পেলে রতীশ তার কর্মচারীদের ওই ঘরে সরিয়ে দিত। দরকারী কাগজ আর ফার্মের খাতা-পত্র রয়েছে এমন একটা আলমারি শুধু এই ঘরে থাকবে। এছাড়া তার এবং চন্দ্রকান্তর দুটো পার্টিশন করা ঘর। বড়ো কাস্টমার এলে তারা এখানেই কথাবার্তা বলবে। ছোটখাটো চুনোপুঁটির দল অন্য ঘরে কর্মচারীদের কাছে মাল জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে যাবে। আরো একটা সমস্যা আছে। নিচে বাঁদিকে গলির ভিতর যে গো-ডাউনটা সে ভাড়া নিয়েছে, ওতে আর মাল আঁটে না। কাছাকাছি আরো একটা গুদাম ভাড়া নিলে সুরাহা হয়। দালাল লাগিয়ে রতীশ একটা গো-ডাউনের খোঁজ পেয়েছে। কাছেই দু-মিনিটের রাস্তা। কিন্তু বাড়ির মালিক তিরিশ হাজার টাকা সেলামী হেঁকে বসে আছে। কারবার থেকে দুম করে অত টাকা তুলে নিলে খুব শীগগীর তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। অথচ গুদামঘর না বাড়াতে পারলে মাল নেওয়া বন্ধ করতে হয়। তার মানে ফার্মের কাজকর্মের প্রসার হ'ল না। ব্যবসার পক্ষে এখন না হলেও সেটা ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে রতীশ বলল,—'ব্যবসা তো শুধু লাভ নয়, লোকসানও আছে। তাছাড়া নতুন ব্যবসা চালু করতেই তো অনেকদিন লেগে গেল। প্রথমে একটা ট্রাক কিনলাম। তার জন্যে ব্যাঙ্কের কাছে লোন ছিল। লাভের গুড় তখন পিঁপড়েতে শুষে নিল। তাছাড়া একটা ট্রাক নিয়ে তো ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা চলে না। তাই নতুন আরো একটা নিতে হ'ল। সেও ওই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিয়ে। তারপর কারবার বাড়ল, অথচ মাল পাঠাবার ট্রাক নেই। তখন লোকের কাছ থেকে ট্রাক ভাড়া নিয়ে কাজ চালিয়েছি। লাভের টাকা ভাড়ার খেসারত দিতে বেরিয়ে গেছে।'

শুধু হিয়া নয়। গাড়ি কেনার কথা চন্দ্রকান্তও বলেছে। অন্তত একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনলে কাজকর্মের সুবিধে। নিজের টাকায় নিতে অসুবিধে থাকলে না হয় ফার্মের নামে কেনা হোক। নইলে ট্রামে-বাসে, কিম্বা ট্যাক্সিতে করে কত ঘুরবি? তাছাড়া প্রয়োজনের সময় গাড়ি মেলা ভার। ট্যাক্সি তো ডুমুরের ফুল। আর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে দূর দূর জায়গা থেকেও লোক এসে মাল জমা দিচ্ছে। বারাসতের কাছে একটা কারখানা আছে। তারা তো হামেশা গৌহাটিতে মাল পাঠায়। চন্দননগরের কাছে একটা কোম্পানীর অফিস। ভিনসুকিয়া থেকে তাদের কারখানায় জন্য কাঁচা মাল আসে। তারপর মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম,—ওদিকেও ট্রাক যাচ্ছে।

তবু রতীশ এখনও মনঃস্থির করতে পারে নি। একটু ভালো কণ্ডিশনের

গাড়ির অবশ্য খোঁজ মেলে। দালাল প্রায় তার কাছে আসে। প্রাইভেট কার কেনার ইচ্ছে আছে কিনা জানতে চায়। দু-একটা সন্ধানও নিয়ে আসে। কিন্তু রতীশ জানে,—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনলেও এখুনি কয়করে তিরিশটি হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে। তারপর একবার মোটর গ্যারাজে নিয়ে গেলেই হ'ল। আরো তিন-চার হাজার টাকা খেসারত দাও। এটা খারাপ, ওই পার্টসটা না বদলালে দুদিন বাদেই গাডি ব্রেকডাউন হবে। স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তারের মতো সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে মেকানিক এমন লম্বা-চওড়া একটা এষ্টিমেট দিয়ে বসবে যে গাড়ির মালিকের মাথায় হাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

রাগের মাথায় হিয়া কখনও বলে,—'তোমার টাকা আর থাকবে কেমন করে? ওই বোতলেই সব টেনে নিচ্ছে।'

মেজাজ ভালো থাকলে রতীশ শুধু হাসে। কখনও পরিহাস করে,—'তুমি কেমন যেন মাইরি। এক ঢোক তো কোনোদিন চেখে দেখলে না। আজকাল বারে বসে মেয়েরাও কিন্তু দিব্যি মাল খাচ্ছে।'

নিলয় বাড়িতে এলে হিয়া রীতিমত বিব্রত বোধ করে। আড়ালে রতীশকে ডেকে বলে,—'দোহাই তোমার। এই কটা দিন বাডিতে আর ওইসব ছাইভস্ম গিলবে না।' মদের বোতল ছোট একটা আলমারির ভিতরে থাকে। অপাঙ্গে সেদিকে একবার তাকিয়ে ফের স্বামীকে শাসায়,—'এখুনি আমি চাবি লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখি, তুমি কেমন করে বের কর।'

রতীশ রাগ করে না, মুচকি হাসে। কিছুক্ষণ পরে বলে,—'ছেলেটা বাড়িতে এলে তুমি এত অস্থির হও কেন? ওকে সাহেবদের স্কুলে ভর্তি করেছ। তারা শুধু ড্রিঙ্ক করে না, মেয়ে-পুরুষ কোমর জডিয়ে ঘরে নাচে।'

—'চুপ কর।' হিয়া ধমক দেয়। চোখ পাকিয়ে রতীশকে বলে,—'সাহেবরা বুঝি ওইটুকু ছেলের সামনে বসে ড্রিঙ্ক করে? সব কাজের তো একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে। নইলে আড়াল বলে একটা কথা রয়েছে কেন? চোখের সামনে বাপকে এক বোতল মদ নিয়ে বসতে দেখলে ও কী ভাববে বলতে পার?'

রতীশ মাথা নাড়ে। বলে,—'কী আবার ভাববে? আর আজকাল ড্রিঙ্ক করা তো একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চৌরঙ্গী আর পার্কষ্ট্রীটে এত ঘোরাঘুরি কর। বারগুলোকে কোনোদিন খালি থাকতে দেখেছ?'

হিয়া রাগ করে জবাব দেয়,—'তুমি তো আর বারে যাও না। বাড়িতে বসে বোতল সাবাড় কর। তাও বিলিতী নয়, দিশী মদ। এক বোতল পেটে গেলেই তো বেহেড মাতাল। তারপর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে আজেবাজে কথা

মল। নেশার ঝোঁকে মেঝেতে গড়াগড়ি দাও। ছেলে যদি বাপকে ওই অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে কোনোদিন তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে?'

রতীশ চুপ করে যায়। কোনো উত্তর দেয় না।

হিয়া নিজেই বলে,—'যদি নেশা করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে বরং বারে গিয়ে খেয়ে এস। নইলে চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়িতে।' ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে ফের জিজ্ঞাসা করে,—'সেখানে বোধহয় সুবিধে হয় না কী বল? বন্ধুর গিন্নি শুনেছি খুব কড়া, বাড়িতে বসে মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না।'

নিলয় বাড়িতে এলেই হিয়াকে বেশ সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। সেই আলমারিটাতে সর্বাগ্রে চাবি লাগিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও কী পার পাবার উপায় আছে? একদিন তো রতীশ একটা নতুন বোতল কিনে বাড়ি ফিরল। হিয়া জানতে পেরেই চিলের মতো ছোঁ মেরে সেটি ছিনিয়ে নিল। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শেষ পর্যন্ত একটা রফা হ'ল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে রতীশ তার নেশার বস্তুটি ফিরে পাবে। তাই হ'ল। কিন্তু মাতালের কী কোনো জ্ঞান থাকে? বোতল শেষ হতেই রতীশ উঠে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। আলমারির চাবি খুলে তাকে আর একটা বোতল দিতে হবে। হিয়া প্রথমে কোনো জবাব দেয় নি। কিন্তু ছেলেটা পাশে শুয়ে। ঘুম ভেঙে যেতেই সে উঠে জিজ্ঞাসা করল,—'মা, বাবা কেন অমন করছে?'

রাগে হিয়ার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। একটা মানুষ না জানোয়ার? নিজের এতটুকু আত্মসম্মানবোধ বলতে নেই? ছেলের কাছে এখন সে কী জবাবদিহি করবে?'

দাঁতে দাঁত চিপে হিয়া শুধু বলল,—'তোমার বাবার অসুখ করেছে।'

খাট থেকে নেমে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। স্বামীর হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে অন্য ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বিছানার ওপর ঠেলে শুইয়ে দিল। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে যখন নিজের ঘরে ফিরল, তখন হিয়া রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হয় নি। মদের গন্ধ কখনও চাপা থাকে? তাছাড়া বাড়িতে শুধু হিয়া একা নয়, আরো একটা লোক যখন রয়েছে।

একদিন বিকেলবেলা নিলয় তাকে ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করল,—'মা, একটা কথা বলব?'

—'কী কথা?' হিয়া মৃদু হাসল।

নিলয় কিছু না ভেবেই প্রশ্ন করল,—'বাবা নাকি মদ খায়? রাত্তিরে মাতলামি করে?'

—'একথা কে বলল তোমায় ?' মুহূর্তে হিয়া ঘাড় শক্ত করে টান-টান হয়ে দাঁড়াল।

নিলয় বুঝতে পারল, কথাটা ভালো নয়। ওটা মাকে বলা ঠিক হয় নি। তবু হিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঈষৎ ভয়ে ভয়ে জানাল,—'ওই তো পংখীদা বলছিল।'

পংখী মানে ওই ছোঁড়া চাকরটা বলেছে ? হিয়ার ধৈর্যের বাঁধ আর রইল না। সে ঠাস করে নিলয়ের গালে একটি চড় মেরে বলল,—'ফের যদি ওই কথা মুখ থেকে শুনি, তাহলে পরদিন আমি নিজে গিয়ে তোমাকে হস্টেলে রেখে আসব।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে শোভাবাজারে মামার বাড়িতে রেখে এলো। যখন বসন্তবিলাস রোডে ফিরল তখন ঘড়িতে প্রায় নটা বাজে। একটু আগে রতীশ তার কাজকর্ম সেরে ফিরেছে। স্নান করে বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বোধহয় পরদিনের কাজকর্মের প্ল্যানটা ছকে নিচ্ছিল।

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হিয়া সেই বন্ধ আলমারির চাবিটা আগে খুলল। পাল্লা দুটো টান করে দু-পাশে সরাল। হাত বাড়িয়ে তিন-চারটে মদের বোতল বের করে মেঝের ওপর রাখল। ঘরের ভিতর চাবি খোলা এবং বোতল নামানোর শব্দ শুনে রতীশ বারান্দা থেকে উঠে এলো। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'কী ব্যাপার ? হঠাৎ এগুলো বের করলে যে—।'

—'তোমার জন্যে,' হিয়া চটপট জবাব দিল। ঠোঁট কুঁচকে ঈষৎ বিকৃতমুখে বলল,—'আর লুকোচুরি করে লাভ নেই। ছেলে তার বাপের কীর্তিকলাপ সব জানতে পেরেছে। রাতদুপুরে মদ খেয়ে পড়ে থাক, সে কথা আর গোপন নেই। তাই বোতলগুলো বের করে দিলাম। ছাইভস্ম গিলে তাড়াতাড়ি মাতলামি জুড়ে দাও।'

নিলয় অবশ্য তার কয়েকদিন পরেই স্কুলে চলে গেল। এবার হিয়াকে আর ছেলেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয় নি। স্কুল থেকেই চিঠি লিখে একটা দিন স্থির করে দিয়েছিল। ওই দিন হাওড়া স্টেশনের এক নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে তাকে পৌঁছে দিলেই হবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে ট্যাক্সি ডেকে হিয়া নিজেই ছেলেকে স্টেশনে নিয়ে গেল। মিশনারী স্কুলের একজন ফাদার চার-পাঁচজন বেয়ারা গোছের কর্মচারীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। নীল রঙের একটা ছোট ফেস্টুনে স্কুলের নাম লেখা। দুজন লোক সেটা ধরে প্ল্যাটফর্মের একপাশে দাঁড়িয়ে। যাতে সহজেই নজরে পড়ে। ছেলে নিয়ে যে সব গার্জিয়ান আসবেন

স্কুলের লোকেদের খুঁজে বের করতে তাদের কোনো অসুবিধে না হয়।

ট্রেন ছেড়ে দিল। নিলয় একা নয়। অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা ছেলে। প্রায় দু-হপ্তা পরে বন্ধুদের কাছে পেয়ে নিলয় কিছুক্ষণ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই মিলে কলকল করে কথা বলছিল। কিন্তু শেষে যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন ওর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে। হিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। বগীর জানালায় গরাদে মুখ চেপে ছেলেটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। যখন কাছে থাকে না, তখন একরকম কেটে যায়। কিন্তু যেদিন ফের হস্টেলে চলে যাবে, সেদিন হিয়ার বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে ওঠে। মায়ের মন তো, আড়ালে কাঁদে।

কিন্তু ঘরের ওই মানুষটা যেন বিধি-বহির্ভূত। ছেলেটা যেদিন বাড়ি আসে সেদিন এক-আধটা কথা বলে। স্কুলে কেমন পড়াশুনো হচ্ছে, ছুটি কদিনের ইত্যাদি মামুলি দু-একটা প্রশ্ন করে। জবাব পেলে ভালো, না হলেও চলে। ভাবটা এমনি। বড়জোর উৎসাহব্যঞ্জক এক-আধটা কথা বলে বাপের কর্তব্য সমাপ্ত করে। ওই স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করবার জন্য হিয়া নিজে উদ্যোগী হয়ে চিঠিপত্র লিখেছিল।

তারপর রাঁচীতে অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষা দিতে নিলয়কে সে নিয়ে গেল। তবে শুধু নিজের জোরে অমন নামী স্কুলে ভর্তি হওয়া শক্ত। হিয়া তাই চেষ্টা-চরিত্র করে একজন মুরুব্বীর সন্ধান বের করল। তার পিসতুতো বোনের এক দেওর রাজভবনে কী যেন কাজ করে। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো লোকের পরিচয় আছে। তাকে ধরেই এক ফাদারের কাছ থেকে হিয়া একটা সুপারিশপত্র সংগ্রহ করল। তারপর নিলয় পরীক্ষাতেও খারাপ করে নি। সব মিলিয়ে অ্যাডমিশন টেস্টে উতরে যেতে অসুবিধে হ'ল না।

কিন্তু এই ভর্তির ব্যাপারে রতীশ একবারও মাথা ঘামায় নি। ছেলের বাবাকে দরখাস্তের ফর্মে একটা সই করতে হয়। হিয়া তাই স্বামীকে কাগজটায় স্বাক্ষর দিতে বলেছিল। রতীশ অবশ্য আপত্তি করেনি। কলম বের করে একটা সই দিয়ে আড়চোখে স্ত্রীর মুখের ওপর নজর বুলিয়ে শুধোল,—'ছেলেটাকে কাছে রাখলে অনেক অসুবিধে, কী বল?'

—'তার মানে?' হিয়া চোখ পাকিয়ে তাকাল। 'ওর ভালো হবে ভেবেই ভর্তির জন্য অমন সুন্দর একটা স্কুলে দরখাস্ত করছি। যদি চান্স পায়, সেটা ওর ভাগ্যি জানবে। তাছাড়া এখানকার এই অসুস্থ পরিবেশে থাকলে ও কোনোদিন মানুষ হবে?'

রতীশ এই প্রশ্নের জবাব দেয় নি। সংসারে এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা

সমস্যার মুখোমুখি হলেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে হিয়া অনেক চিন্তা-ভাবনা করছে, রতীশ সেটুকু বেশ বোঝে। কিন্তু এই বিষয়ে তার যে একটা ভূমিকা আছে, সেটা পালনের কোনো দায়িত্ব নেওয়া সে প্রয়োজন মনে করে না। উল্টে একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে দানা বাঁধে। কাছে রাখলে ছেলেটা পায়ের বেড়ী। তাই হিয়া বোধহয় পড়াশুনোর ছল করে নিলয়কে দূরে কোথাও সরিয়ে দিচ্ছে।

শুধু কী তাই ? ছেলে আবার কবে বাড়ি আসবে এ ব্যাপারেও তার কোনো প্রশ্ন নেই। যেন মোটামুটি অনাগ্রহী। বরং স্কুল থেকে ফাদারের চিঠি এলে হিয়া নিজেই সে কথা জানিয়ে আসে। নিলয় বাড়ি আসছে শুনলে রতীশ সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করে। কদিনের ছুটি স্ত্রীর কাছ থেকে বড জোর ওইটুকু জানতে চায়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হয় ছেলে যেদিন রাঁচী ফেরে। প্রথম দিকে হিয়া দু-একবার বলেছে,—'কাল তো নিলয় হস্টেলে চলে যাবে। তুমি স্টেশনে যেতে পারবে না ?'

'আমি ?' স্ত্রীর কথা শুনে রতীশ যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে,—'আমার সময় কোথায় ? সকাল দশটার মধ্যে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। মাল ভেঙেচুরে গেছে, তাই এক পার্টি ড্যামেজ স্যুট করে দিয়েছে। সেই মামলা নিয়ে আজ তিনদিন ধরে ছোটাছুটি।'

আরো একবার বলতে গিয়ে হিয়া ঠিক এই ধরনের জবাব শুনেছে। তারপর থেকে রতীশকে আর এই নিয়ে বিরক্ত করে নি। কখনও ভাইকে সঙ্গে দিয়ে নিলয়কে রাঁচী পাঠিয়ে দিয়েছে। দু-একবার নিজেও যে যায় নি তা নয়। দীর্ঘ হলিডে হ'লে স্কুলে থেকেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। তখন শুধু টিকিট কেটে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিলেই নিশ্চিন্তি। ফাদার এবং তার লোকজন সেখানে ঠিক সময়ে হাজির থাকে।

তবে ছেলের মনে যে একটা দুঃখ আছে হিয়া সে কথা জানে। তার আরো পাঁচটা বন্ধুর মা-বাবা দুজনেই ছেলেকে স্টেশনে সী-অফ করতে আসে। শুধু নিলয়ের বেলায় তার মা একা। হয়তো এই বিসদৃশ ব্যাপারটা ওর ছোট্ট বন্ধুদের নজর এড়ায় নি। সম্ভবত এই নিয়ে তারা কিছু বলাবলি করে। মনের মধ্যে কষ্ট বেশী জমলে নিলয় তাকে সে কথা জানায়। বোধহয় হাল্কা হতে চায়। কখনও হিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—'বাবা নাই বা স্টেশনে এলো। তুমি তো এসেছ মা।'

নিলয় চলে গেল গত শনিবার। এর আগের বুধবারেও হিয়া কিন্তু একবার ঐ-তল্লাটে ঘুরে গিয়েছিল। নিলয় তখন বাড়িতে। হিয়া ছেলেকে সঙ্গে আনে নি।

ওই পংখীর জিম্মায় রেখে এসেছিল। মায়ের সঙ্গে বেরোবার জন্য নিলয় অবশ্য বায়না করে নি। বরং পংখীর কাছে তার সময়টা ভালো কাটে। ছোঁড়া চাকরটা নানারকম গল্প বলে। নিলয়ের একটা ক্রিকেটের ব্যাট আছে বাড়িতে। পংখী হাত ঘুরিয়ে বল করে, আর সে বিশ্ববিখ্যাত কোনো ব্যাটসম্যানের মতো বীরদর্পে রান তোলে। মাঝে মাঝে অবশ্য ছোটখাটো কলহ হয়। দেয়ালে তিনটে মোটা দাগ টেনে উইকেটের মতো আঁকা থাকে। বল সেখানে হিট করলেও নিলয় তা স্বীকার করতে চায় না। তবে শীগগীর একটা মিটমাট হয়। ফের পুরোদমে খেলা চলে।

ধর্মতলায় আসবার খুব একটা প্রয়োজন আজ ছিল না। টুকিটাকি দু-একটা জিনিস,—সে তো বেলেঘাটা কিম্বা শিয়ালদাতে পাওয়া যায়। তবু যাবার সময় ছেলেকে উদ্দেশ্য করে হিয়া বলল,—'কয়েকটা জিনিসের খুব দরকার, তাই একবার বেরোতে হচ্ছে। তোমার জন্যে এক প্যাকেট ভালো চকোলেট নিয়ে আসব, কেমন ?'

নিলয় তখন পরের বলটা কীভাবে মারবে তাই ভাবছে। মায়ের কথা শুনে সে কেবল মাথা হেলিয়ে ঈষৎ হাসল।

গত বুধবার মেট্রো সিনেমার কাছে হিয়া প্রায় একঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল। যদি বিজয় এসে অপেক্ষা করে ? হিয়া যখন ধর্মতলায় পৌঁছল তখন দেড়টা বেজে গেছে। বিজয়কে দুটো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে বলেছিল। সুতরাং এই দীর্ঘ সময় তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। মাঝে মাঝে বিজয়ের ওপর তার এমন রাগ হচ্ছিল। আচ্ছা মানুষ কিন্তু। দু-মাস হতে চলল, এর মধ্যে কী একবারও আসতে নেই ? হিয়া তো প্রতি বুধবার এখানে এসে অপেক্ষা করেছে। শুধু ওই নবমীর দিনটি ছাড়া। কিন্তু সেদিন নিশ্চয় বিজয় এখানে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে নি। এই তো আজ ধর্মতলায় আসবার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল না। দরকারী জিনিসের কথা যেটা বাড়িতে বলে এলো ওটা আসলে অজুহাত। এখানে আসবার কারণ তো একটাই। যদি তার দেখা না পেয়ে বিজয় ফিরে যায় ? তাহলে নিশ্চয় আর বহুদিন সে এদিকে পা মাড়াবে না।

কিন্তু আশ্চর্য ! হিয়া আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ? মেট্রো সিনেমার সামনে বিজয় সশরীরে দাঁড়িয়ে। হিয়ার প্রথমেই ইচ্ছে করল তাড়াতাড়ি ওর কাছে যেতে। তারপর মনে হ'ল একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে না দেখতে পেয়ে বিজয় কী করে সেটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবে। খানিকটা দূরে হিয়া সত্যি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বিজয় সামনে অনেকদূর পর্যন্ত তাকাল।

একটু এগিয়ে গেল, তারপর পিছন ফিরে আবার উল্টোদিকে হাঁটল। হিয়ার এমন হাসি পাচ্ছিল। এত যদি ছটফটানি বাপু, তাহলে মিছিমিছি দুটি মাস কেন গা-ঢাকা দিয়ে রইলে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিয়া এবার চঞ্চল হ'ল। প্রায় দুটো বাজে। না, এমনি দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। বিজয় যদি এখন ছবি দেখব বলে? ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে টিকিট জোগাড় করতেও সময় লাগে। আজকাল এমন কড়াকড়ি হয়েছে। এই তো ক'দিন আগে হিয়ার চোখের সামনে একজন সাদা পোশাকের পুলিশ একটা ব্ল্যাকার ছেলের জামার কলার ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

অকস্মাৎ বিজয়ের সামনে এসে হিয়া তাকে প্রায় চমকে দিল। ফিক করে হেসে বলল,—'কী ব্যাপার? পথ ভুলে নাকি?'

বিজয় জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি কোন দিক থেকে এলেন? আমি এসে অব্দি একবার সামনে আবার পিছনে তাকাচ্ছি।'

হিয়া বলল,—'সে তো স্বচক্ষেই দেখলাম।'

—'তার মানে? আপনি দেখলেন কেমন করে?'

হিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বলল,—'দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে, ওই বড়ো বাড়ির থামটার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম।'

—'কেন?' বিজয় একটু অবাক হয়ে শুধোল।

হিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে অম্লান বদনে মিথ্যাভাষণ করল,—'দেখছিলাম কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকেন।'

—'আপনি না এলে অগত্যা ফিরে যেতাম। তবে আড়াইটে পর্যন্ত নিশ্চয় দাঁড়াতে হ'ত।' বিজয় হেসে উত্তর দিল। ফের বলল,—'সেদিন ওই সময়ের মধ্যে আসতে বলেছিলেন।'

হিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'একটু আগে আপনাকে প্রথম দেখে কী মনে হ'ল জানেন?'

—'কী?' বিজয় সাগ্রহে তাকাল।

—'মনে হ'ল আজ কার মুখ দেখে উঠেছি?'

—'কেন?'

—'সেই ঝড়জলের রাত্তিরের পর প্রতি বুধবার আমি এখানে এসে আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে গেছি।' হিয়া যেন অভিমান করল। একটু থেমে ফের বলল,—'শুধু নবমীর দিনটি ছাড়া।'

—'তাই? তাহলে তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে।' বিজয় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কথা কইল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে ধীর গলায় বলল,—'ভেবেছিলাম

আগেই আসব। তারপর পুজো এসে গেল। নানা কারণে আর আসা হয় নি বৌদি। পরে সব শুনবেন।'

—'ছবি দেখবেন নাকি? তাহলে টিকিটের জন্য চেষ্টা করি।' মুচকি হেসে হিয়া হঠাৎ প্রগলভ হয়ে উঠল।

—'ছবি নিশ্চয় দেখব, তবে ম্যাটিনি শো-তে।' বিজয় যেন ঘোষণা করল। ফের হেসে বলল,—'তারপর কোনো রেস্তোরাঁতে গিয়ে ঢুকব। কিন্তু আজকের বিল আমি পেমেণ্ট করব বৌদি, আপনি যেন আপত্তি করবেন না।'

—'বেশ তাই হবে।' হিয়া খুব খুশি। ভ্রূ নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফের জিজ্ঞাসা করল,—'কী ব্যাপার বলুন তো আপনার? একদিনেই ছবি দেখতে, রেস্তোরাঁতে যেতে ইচ্ছে হ'ল? তারপর সব বিল পেমেণ্ট করবেন, কিন্তু কেন বলুন তো?'

—'কেন আবার? এমনি—'

—'উহুঁ।' হিয়া কেমন রহস্য করে হাসল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, —'দু-মাস আসতে পারেন নি বলেই কী বকেয়াটুকু একদিনে পুষিয়ে নেবেন?'

বিজয় বলল,—'আর দাঁড়িয়ে গল্প করলে কিন্তু সিনেমার টিকিট পাবেন না। ব্ল্যাকাররা কী আপনার জন্যে টিকিট নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

—'চলুন না, দেখি চেষ্টা করে। কোনোদিন তো সিনেমাহল থেকে ফিরে যাই নি।' হিয়া দুর্বলকণ্ঠে তার কৃতিত্বের দাবি করল।

টিকিট পাওয়া গেল, তবে যে ছবি দেখবার ইচ্ছে ছিল সেটা মেলে নি। হিয়া বলল,—'আজ না হয় ছবি দেখা থাক। সামনের বুধবারে আমি টিকিট কেটে রাখব।' মিষ্টি হেসে ফের অনুরোধ করল,—'চলুন না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল কিম্বা গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।'

কিন্তু বিজয়ের এক কথা। ছবি আজ দেখবে। অবশ্য তারপর যদি হিয়ার কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে তাতেও সে রাজি। রাত্তিরে বরং কোনো রেস্তোরাঁতে খাওয়া সেরে বজবজে ফিরবে।'

হিয়া বলল,—'আপনি কিন্তু অবাক করছেন বিজয়বাবু। মুখ ফস্কে যা বেরিয়ে যাচ্ছে তাতেই রাজি।' ফিক করে হেসে ফের মন্তব্য করল,—'হঠাৎ কল্পতরু হয়ে উঠলেন নাকি?'

বিজয় বলল,—'এখনও শো আরম্ভ হতে অনেক দেরি। চলুন, নিউ মার্কেটের ভিতরে সেই রেস্তোরাঁয়। ওখানে গিয়ে চা খেয়ে আসি।'

—'ও বাবা! অত দূরে?' হিয়া সভয়ে তাকাল।

—'দূর কোথায়? নিউ মার্কেট তো কাছেই। পাঁচ মিনিটের রাস্তা।'

—'কিন্তু হাতে সময় কই ?' হিয়া অসহায় ভঙ্গি করল। ফের ঘড়ির কাঁটায় নজর বুলিয়ে বলল,—'দুটো বেজে গেছে। আর পৌনে তিনটেয় শো আরম্ভ হবে।'

বিজয় বলল,—'এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি। চা খেয়ে ফিরে আসতে যথেষ্ট।'

হিয়া তবু আপত্তি করল,—'মিছিমিছি অত দূরে যাওয়া। এখানেই তো চা খেয়ে নিলে হ'ত।'

কিন্তু বিজয় নাছোড়বান্দা। নিউ মার্কেটেই যাবে। সে বলল,—'চলুন না বৌদি। এই তো গতবারে ওখানে চা খাবেন বলে কত তাড়াহুড়ো করলেন।'

হিয়া অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল। মানুষটা আজ যেন একটু অন্য-রকম। নিজে থেকেই সব কিছু বলছে। অথচ গতবারে সিনেমা যাওয়ার প্রস্তাব শুনে কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে ওকে রাজি করতে হিয়াকে অনেক মিষ্টি কথা বলতে হয়েছে।

তবু হিয়ার ভালো লাগছিল। বিজয় হঠাৎ যেন খুব সহজ হয়ে গেছে। তার চারপাশে বন্ধুর মতো ঘিরে দাঁড়িয়ে। সঙ্কোচের বালাই নেই। হিয়াব হঠাৎ মনে হ'ল দশ বছর আগেব সেই হাসিভরা দিনগুলো যেন আবার ফিবে এসেছে।

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে নিউ মার্কেটেব পথ ধরল। খানিকটা গেলেই বাঁ দিকে রক্সি সিনেমা। ডানদিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটা বড়ো রেস্তোরাঁ। এই দুপুরবেলা ফুটপাতে নানারকম পণ্য সাজিয়ে হকারবা বসে। কারো কাছে অঢেল জামা, কেউ বা এবই মধ্যে শীতবস্ত্র এনে হাজিব কবেছে। একজন তো মস্ত একটা চাদর বিছিয়ে নানা ধরনেব বমাল ডাঁই কবে অল্প দামে বেচে দিচ্ছে।

নিউ মার্কেটের ভিতরে সেই রেস্তোরাঁটা আজ ফাঁকা। ছোট একটা গ্রীলের ভিতর ঢুকে বিজয় পর্দা টেনে দিল। টেবিলের দুপাশে দুজনে মুখোমুখি বসল।

হিয়া বলল,—'হঠাৎ আজ এখানেই চা খেতে ইচ্ছে হ'ল কেন ?'

—'দশ বছর আগে এখানেই আমবা চা খেতাম, তাই না বৌদি ?' বিজয় স্মৃতিচারণার ঢঙে কথা কইল।

—'আহা ! আপনি তো সব ভুলে গিয়েছিলেন।' হিয়া চোখ ঘুরিয়ে হাসল। বলল,—'ভাগ্যিস আমি মনে করিয়ে দিলাম।'

—'তা সত্যি।' বিজয় ভ্রূ কুঁচকে যেন সেই অতীতের মরা মাটিতে টহল দিয়ে ফিরছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল,—'তাই তো এখানেই চা খেতে এলাম।'

—'কিন্তু বই যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে আমাকে যেন দোষ দেবেন না।'

বিজয় সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল,—'আচ্ছা বৌদি, হঠাৎ নিউ-মার্কেটে এসে এই রেস্তোরাঁতে ঢুকলে আমার কথা নিশ্চয় মনে পড়বে?'

—'এসব কথা জেনে আপনার কী লাভ? আপনি তো দশ বছর আর এমুখো হননি।' হিয়া মুখ ভার করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,—'জানেন, নিউ মার্কেটে এসে কোনোদিন এখানে ঢুকতে ইচ্ছে করত না।'

ইতিমধ্যে চায়ের পেয়ালা এসে গেছে। বিজয় এক চুমুক দিয়ে বলল,—'এখানে চা কিন্তু মন্দ করে না।'

—'তবু ভালো।' হিয়া পরিহাসের সুরে বলল। 'যদি চায়ের টানে কোনোদিন এদিকে এসে পড়েন।'

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বিজয় উঠে দাঁড়াল। রেস্তোরাঁটার চারদিকে সে বারবার নজর বুলোচ্ছিল।

হিয়া সেটি লক্ষ্য করে বলল,—'কী ব্যাপাব? মনে হয় এই রেস্তোরাঁকে হঠাৎ খুব ভালো লেগে গিয়েছে।'

—'একটা কথা ভাবছিলাম।' বিজয় অন্যমনস্কের মতো বলল।

—'কী?'

—'ভাবছিলাম যদি এখানে আর কোনোদিন না আসি?'

—'তার মানে?' হিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

—'ও কিছু নয়।' বিজয় নিজের মনে হাসল। ফের আগের মতো মৃদুস্বরে বলল,—'হঠাৎ কথাটা জিভের ডগায় এসে গেল তাই।'

বেয়ারা এসে বিল দিয়ে গেল। পকেট থেকে টাকা বের করে বিজয় ইঙ্গিতে বাকিটা তাকে নিতে বলল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিয়া হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'চলুন আর দেরি করলে নির্ঘাত—'

—'ট্রেন মিস করব?' বিজয় সরল টিপ্পনী কাটল।

শুনে হিয়া হো-হো করে হেসে উঠল। বলল,—'ওমা! ট্রেন মিস কববেন কেন?' ফের স্বাভাবিক গলায় তাকে তাড়া দিল,—'বাজে কথা রাখুন। আর দেরি করলে হলে গিয়ে দেখবেন ছবি কখন শুরু হয়ে গেছে।'

বই তখনও পর্দায় আসেনি। দু-একটা বিজ্ঞাপনের স্লিল, সংবাদ পর্যালোচনা সবে শেষ হয়েছে। চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিয়ে হিয়া বলল,—'দেখলেন তো, একেবারে ঠিক সময়ে এসে গেছি। আমো দেরি করলে বই শুরু হবার অনেক পরে পৌঁছতেন।'

—'চুপ। অন্যদের অসুবিধে হবে,' বিজয় চাপাগলায় তাকে সাবধান করল।

—'অসুবিধে না ছাই।' হিয়া ঠোঁট উল্টিয়ে মৃদুস্বরে মন্তব্য করল। ফের বলল,—'এখনও তো বই শুরু হয়নি।'

পিছনে বসে কে একজন উসখুস করে উঠতেই বিজয় তার ডানহাতের তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে হিয়ার বাহুমূলে ঈষৎ চাপ দিয়ে তাকে সতর্ক করল। গত বারে ছবি দেখার সময় পিছন থেকে একটা লোক কুৎসিৎ মন্তব্য করেছিল। সে কথা মনে পড়তেই হিয়া এবার সত্যি চুপ করে গেল।

ছবিটা মন্দ নয়। একটি নিটোল প্রেমের গল্প। ঝাড়পিট প্রায় নেই বললেই চলে। ইনটারভ্যালের সময় বিজয় জিজ্ঞাসা করল,—'বই কেমন লাগছে ?'

—'বারে! আমি তো এটা আগেই দেখেছি।'

—'তাই নাকি ?'

—'হুঁ,' বইটা যে তার কাছে নতুন নয় হিয়া হাবেভাবে ফের সে কথা জানিয়ে দিল। হেসে বলল,—'তবে আপনার সঙ্গে আর একবার দেখলাম,'

—'তাহলে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।' বিজয় অভিমত প্রকাশ করল, 'একবার দেখা হ'লে সে বই কী আর দেখতে ভালো লাগবে ?'

—'তাতে কী হয়েছে ?' হিয়া জবাব দিল। 'আমি তো একটা ছবি দুবার কখনও তিনবারও দেখেছি। সময় কাটাতে কত হলে বারবার গেছি।'

—'একটা কথা কিন্তু আপনাকে বলা হয় নি।' বিজয় আড়চোখে তার দিকে তাকাল।

—'কী ?' হিয়া মরালীর মতো গ্রীবা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসু হ'ল।

—'এই ছবিটা আমিও দেখেছি।' বিজয় হেসে ফেলল।

—'উঃ! কী চাপা লোক আপনি ?' হিয়া অবাক হয়ে শুধোল,—'কোথায় দেখেছেন ?'

—'বজবজে।'

—'তাহলে মিছিমিছি আবার এলেন কেন ?' হিয়া কপট রাগ করে বলল,—'এর চেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল কিম্বা গঙ্গার ধারে গেলেই হ'ত।'

—'তার জন্য চিন্তা কিসের ?' শো ভাঙলে তো সেখানে যাচ্ছি।' বিজয় তাকে আশ্বস্ত করল। ফের কী মনে হতে বলল,—'তবে একটা কথা আপনি বোধহয় আগে ভাবেন নি।'

—'কী বলুন তো ?' হিয়া প্রশ্ন করল।

বিজয় যেন মনোযোগী ছাত্রীকে বলল,—'এর আগে ছবিটা তো আমরা একসাথে দেখিনি।'

—'তা ঠিক।' হিয়া স্বীকার করল।

বিজয় বলল,—'জানেন, ছবিটা দেখার সময় আমার সে কথা কেবলি মনে হচ্ছিল। বইটা আগে দেখলেও এক হিসেবে আবার নতুন করে আসা, তাই না?'

হঠাৎ ঝপ করে অন্ধকার হতেই বিজয় চুপ করে গেল। কয়েকটা বিজ্ঞাপনের স্লাইড দেখানোর পর ছবি ফের শুরু হ'ল। হিয়ার মনের মধ্যে বিজয়ের শেষ কথাগুলি বারবার অনুরণিত হচ্ছিল। সত্যি তো, দুজনে পাশাপাশি বসে এই ছবিটা তারা প্রথম দেখছে। সেই হিসেবে এর নিশ্চয় একটা অন্য মূল্য আছে। কিন্তু বিজয় যেন আজ কেমন নতুন ধরনের কথা বলছে। ওর মনের গভীর থেকে সেই সুর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারিত হচ্ছে।

শো ভাঙলে দুজনে হল থেকে বেরিয়ে এলো। বেলা যায় যায়। সূর্য প্রায় অস্ত যেতে বসেছে। এখনও অন্ধকার হয় নি। তবে ইতিমধ্যে বড় বাড়ির মাথায় হোর্ডিঙের গায়ে নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলছে, ফের নিভছে।

বিজয় কেমন রহস্য করে বলল,—'আজ কিন্তু পরিষ্কার আকাশ, ঝড়-জল নেই।'

—'ঝড়জল থাকলেই বুঝি ভালো ছিল?' হিয়া কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,—'থাকলেও আজ নিশ্চয় আমাকে পৌঁছে দিতে যেতেন না?'

—'এ কথা কেন বললেন?' বিজয় পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের নিজেই জানাল, —'বুঝেচি, আজ রতীশ বাড়িতে আছে তাই—'

—'সে কথা আপনি জানেন।' হিয়া ফের রহস্য করে হাসল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বিজয় জিজ্ঞাসা করল,—'বলুন, এখন কোথায় যেতে চান? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিম্বা গঙ্গার ধার?'

—'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালেই চলুন। ওখানে ঘাসের ওপর বসে দু'জনে গল্প করব।' হিয়া উত্তর দিল।

ওপাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। একটু এগিয়ে বিজয় সেটি ধরল। দুজনে উঠে বসতে ড্রাইভার মিটার ডাউন করে দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে ছুটল।

পিছনের সীটে হেলান দিয়ে হিয়া আরাম করে বসল। মুচকি হেসে বলল, —'আজ কিন্তু আপনি খুব সদাশয়।'

—'তার মানে?'

—'মানে অতি সহজ। যেখানে যেতে চেয়েছি সেখানেই নিয়ে যাচ্ছেন। [illegible] করে।'

বিজয় হেসে জবাব দিল,—'এখন যা বাসে ভিড়। ইচ্ছে থাকলেও আপনি উঠতে পারবেন না।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে নর-নারীর মেলা। অক্টোবরের শেষ। কলকাতায় শীত পড়তে এখনও বেশ দেরি। কিন্তু বিকেল ফুরিয়ে এলেই এমনি ফাঁকা জায়গায় বাতাসে ঈষৎ শিরশিরাণি লাগে। ধীরে ধীরে সন্ধে নামছে। ময়দানে পথের দুধারে দুধশাদা নিওন বাতিগুলি ঘোমটা খুলে ফেলা নতুন বউয়ের মতো আলোর হাসিতে জ্বলে উঠছে। একটা ফুচকাঅলার চারপাশে আট-দশটা মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সেই লোকটা একটা ফুচকা ঠুকরে ভেঙে চামচেতে করে খানিকটা টক জাতীয় তরল ভিতরে ঢেলে দিল। শালপাতার ঠোঙায় সেটা একজন মেয়েকে দিতেই সে খুব বড়ো রকম হাঁ করে ফুচকাটা মুখের মধ্যে ফেলল। কয়েকজন ভেলপুরীঅলা তাদের দোকান নিয়ে পাশাপাশি রয়েছে। একজন লোক চাট বিক্রি করছিল। তার দোকানের পিছনে লাল শালুতে লেখা একটা বিচিত্র বিজ্ঞাপন সে টাঙিয়ে দিয়েছে।

—চাটকা চাটনী কা চটকা
খানে সে দিল হিঁয়া আটকা।—

একজন অবাঙালী মেয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডকে ওই ছড়াটা দেখিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

খরিদ্দারের কোথাও অভাব নেই। বেশ রমরম ব্যবসা চলছে। একটা প্রজ্জ্বলিত উনুনের ওপর চায়ের কলসী বসিয়ে একজন লোক সেটা হাতে ঝুলিয়ে হনহন করে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বিজয় বলল,—'বৌদি, ফুচকা খাবেন নাকি ?'

—'ফুচকা ?' হিয়া বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাল। পরিহাস করে বলল, —শেষপর্যন্ত আমাকে ফুচকা খাওয়াবেন নাকি ? আমি তো ভেবেছিলাম কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় যাবেন।'

—'সে তো রাত্তিরে।' বিজয় জবাব দিল। মুচকি হেসে বলল,—'ভয় নেই। এর জন্য রেস্তোরাঁ প্রোগ্রাম বাদ যাবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসল। আশেপাশে আরো অনেকে দিব্যি আসর জমিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলছে। কোথাও অল্পবয়সী একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। কোথাও বা সাত-আট জনের এক অবাঙালী পরিবার টুকটাক খাবার মুখে ফেলে মজা করে গল্প জুড়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হিয়া বলল,—'ওই দেখুন, কী সুন্দর তিনটে তারা ফুটে উঠল।'

—'তিনটে নয়, চারটে।' বিজয় তাকে শুধরে দিয়ে বলল,—'পিছনে তাকান। হাইকোর্টের মাথায় আর একটা তারা জলজল করছে দেখুন।'

পিছন ফিরে একবার সেদিকে নজর বুলিয়ে হিয়া বলল,—'আজকের দিনটা কিন্তু খুব ভালো কাটল। সত্যি, কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম।'

বিজয় শুনল, কিন্তু ইচ্ছে করেই কোনো জবাব দিল না।

হিয়া ফের বলল,—'জানেন, আমি কিন্তু প্রথমে ভাবতেও পারিনি যে আপনি ওখানে অপেক্ষা করছেন।'

—'কেন ? মনে সন্দেহ ছিল বুঝি ?'

—'থাকবে না ?' হিয়া যেন কথাটা এবার তার দিকে ছুড়ে দিল। বলল,—'যে মানুষ দু-মাস ধরে একদিনও আসেনি, তাকে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব তাই বা কেমন করে ভাবি বলুন ?'

বিজয় হেসে জিজ্ঞাসা করল,—'আর যদি আমাকে না দেখতে পেতেন ?'

—'তাহলে আর কোনোদিন ওখানে এসে দাঁড়াতাম না।' হিয়া যেন অভিমান করে জবাব দিল।

বিজয় হঠাৎ বলল,—'আপনার সঙ্গে অনেক কথা ছিল বৌদি।'

—'কথা ?' হিয়া একটু অবাক হয়ে শুধোল,—'আমার সঙ্গে ?'

—'হ্যাঁ।' বলেই বিজয় আবার থেমে গেল। বোধহয় কেমন ভাবে শুরু করবে মাথার মধ্যে তাই সাজিয়ে নিচ্ছিল।'

—'তাহলে বলুন।' হিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। ফের মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল,—'তাই বুঝি এতদূরে নিয়ে এলেন ?'

—'না মানে ঠিক তা নয়।' বিজয় কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করল।

হিয়ার খুব মজা লাগছিল। সত্যি, এখন যেন মানুষটাকে কেমন বোকা বোকা মনে হচ্ছে। ওর ইতস্তত ভাব, সলজ্জ দৃষ্টি, কথা বলতে গিয়ে বারবার ঢোক গিলছে। নিরিবিলি এমনি সন্ধ্যায় একটি মেয়ের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতে এত লজ্জা কিসের বাপু ? আর হিয়া যখন নানাভাবে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করেনি।

কিছুক্ষণ বাদেই ওর মেয়েলীপনা হিয়ার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ধৈর্য না রাখতে পেরে লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলল,—'এতদিন আপনার কাছ থেকে একটা কথা শুনব বলে শুধু অপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন আর আমার তর সইছে না বিজয়বাবু।'

তবু অপর পক্ষের কাছ থেকে সাড়া নেই। তার মুখটা সলজ্জ নয়, বরং বিষণ্ণ। দৃষ্টি স্থির। এমনিভাবে আরো কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বিজয় ঠাণ্ডা গলায়

বলল,—'বৌদি, আর কোনোদিন যেন মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না।'

শুনে হিয়া চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনো কথা বেরোল না। খুব মিষ্টি একটা সংবাদ শুনবে বলে হিয়া যেন অপেক্ষা করছিল। পরিবর্তে কেউ তার গালে ঠাস করে একটি চড় বসিয়ে দিয়েছে।

বিজয় নিজেই বলল,—'জানতাম, এই কথা শুনলে আপনি নিশ্চয় দুঃখ পাবেন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।'

ততক্ষণে হিয়া একটু সামলে নিয়েছে। মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করল,—'কী হয়েছে জানাতে কোনো আপত্তি আছে?'

—'না, আপত্তি কিসের?' বিজয় মুখ নিচু করে কী যেন চিন্তা করল।' কয়েক সেকেণ্ড পরে ধীরে ধীরে বলল,—'ঝড়জলের সেই রাত্তিরের কথা রতীশ জানতে পেরেছে।'

—'তাই নাকি?' হিয়া ভ্রূ কোঁচকাল। ফের বলল,—'কই, আমাকে তো সেকথা একবারও বলে নি।'

—'জানি, আপনাকে সেকথা বলবে না। অন্তত আমার সঙ্গে তাই কথা হয়েছিল।'

—'ও', হিয়া মুখ গম্ভীর করে বলল। 'তাহলে আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। এখন শুধু আমাকে ওটা জানাবেন বলে এই নির্জন সন্ধেবেলা এখানে নিয়ে এসেছেন?'

বিজয় দুঃখ করে বলল,—'সব কথা আপনাকে না জানালে আমি নিজেও শান্তি পাব না বৌদি।'

—'বেশ তো, তাহলে বলে ফেলুন। আমি শুনতে রাজি।'

বিজয় জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, আপনাদের পাড়ায় হীরালাল বলে কোনো লোক আছে?'

—'তার নাম আপনি কার কাছে শুনলেন?'

—'চন্দ্রকান্ত বলছিল।' বিজয় জবাব দিল।

হিয়া বলল,—'হ্যাঁ, খুব বড়লোক উনি। বসন্তবিলাস রোডের মুখে তেতলা বাড়ি। দুটো গাড়ি আছে। শুনতে পাই চাঁপাদানীর কাছে কোথায় যেন একটা মস্ত হিমঘর তৈরি করছেন।'

—'ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই রতীশ ব্যাপারটা জানতে পারে। সেই ঝড়জলের রাত্তিরে সে কোথায় ছিল, হীরালালবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করে। শিলিগুড়িতে জরুরী কাজে যেতে হয়েছিল শুনে বলেছে, আপনার এক বন্ধু হঠাৎ

এখানে এসে রাত্তিরে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন।'

হিয়া একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'হীরালালবাবু সেকথা কেমন করে জানলেন ?'

বিজয় বলল,—'ভোরবেলা আমরা যখন নিচে নেমে এলাম তখন হীরালালবাবু তার বাড়ির জানালা দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছেন।'

—'তারপর ?' হিয়া বাকিটুকু শোনার জন্য কৌতূহলী হ'ল।

'বন্ধুর চেহারাটা কেমন রতীশ নাকি সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বিবরণ শুনেই তার সন্দেহ হয়। তারপর চন্দ্রকান্তকে দিয়ে চিঠি লিখে আমাকে ডেকে পাঠায়।'

—'আর সেই নিমন্ত্রণ পেয়ে বন্ধুর হুকুম তামিল করবার জন্য আপনি ছুটে এলেন।' হিয়া যেন ব্যঙ্গ করল।

—'না এলে ব্যাপারটা আরো খারাপ হ'ত।' বিজয় বলল,—'ও ভাবত ইচ্ছে করেই ঘটনাটা আমরা চেপে গেছি। কারণ সেই ঝড়জলের রাত্তিরে একটা কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ওখানে থেকে গিয়েছিলাম।'

হিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল,—'ও যা ভেবেছে, হাজার চেষ্টা করলেও আপনি সেটা বদলে দিতে পারবেন না।' পরিহাসের সুরে ফের শুধোল,—'কিন্তু সে যাই হোক, প্রথম দেখা হতেই বন্ধু নিশ্চয় আপনাকে বেশ মধুর গলায় আপ্যায়ণ করল ?'

—'আপ্যায়ণ ? হ্যাঁ, তাও একরকম বলতে পারেন।' বিজয় ম্লান হাসল। আড়চোখে একবার হিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলল,—'জানেন, ওর ধারণা ঘটনা শুধু একটা নয়। এই দশ বছরে আপনার সঙ্গে আমার গোপনে যোগাযোগ ছিল।

—'চমৎকার' হিয়া চোখ নাচিয়ে প্রায় নাটকের নায়িকার মতো ঢঙ করল। ফের হেসে বলল,—'তার মানে এতদিন আমরা দুজনে চুটিয়ে প্রেম করেছি।'

—'হ্যাঁ, চন্দ্রকান্তেরও সেই মত। সুযোগ পেয়ে আমাকে ছুটো কুৎসিৎ গালাগালি করে বলল,—'ছি-ছি ! বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এমন ঢলাঢলি করতে তোর বিবেকে বাধল না ? রতীশ খুব দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে বউকে তোর সঙ্গে সিনেমা হলে পাঠিয়েছে। আর সেই সুযোগে মেয়েটাকে ফুসলিয়ে তোর গোপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছিস।'

—'আপনি অম্লানবদনে সব অপবাদ মেনে নিলেন ?'

—'না-না। বরং রতীশকে বুঝিয়ে বলেছি গত দশ বছরে একবারও আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি। সেদিন যা ঘটেছে সেটা নেহাৎ আকস্মিক। দেখা হতে বৌদি বেলেঘাটার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তারপর সেই আগের

মতো দুজনে সিনেমা গেছি। ঠিক ছিল, শো ভাঙলে আমি বজবজে ফিরে যাব। কিন্তু হঠাৎ অমন ঝড়বৃষ্টি। ট্রাম-বাস উধাও। শেয়ালদতে একটা ম্যাটাডর ভ্যানে কিছু মানুষ বেলেঘাটা যাচ্ছিল। ওই উটকো লোকগুলোর সঙ্গে বৌদিকে একলা যেতে দিই নি। তাই আমি সঙ্গে গেলাম। তখন বৃষ্টিতে দুজনেই কাকভেজা। আর বাইরে অমন দুর্যোগ। শেয়ালদতে ফেরা এক সমস্যা। তারপর অত ঝড়জলে বজবজের ট্রেন ছাড়বে কিনা সন্দেহ। অগত্যা রাত্তিরটা থাকতে বাধ্য হলাম। অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

—'আপনার বন্ধু সেকথা বিশ্বাস করলেন ?' হিয়া শুধোল।

—'জানি না। মনের কথা কেউ টের পায় বলুন ?' বিজয় কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবছিল। ফের ধীরে ধীরে শুরু করল,—'জানেন, চন্দ্রকান্ত হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। বলল, রতীশের বউয়ের ওপর তুই কুনজর দিসনে বিজয়।'

—'কুনজর ?'

—'হ্যাঁ। আমার হাত ধরে বলল, আর সত্যি যদি অন্য কোনো মতলব নাই থাকে, তাহলে তোর মরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা কর যে কোনোদিন হিয়া বৌদিকে নিয়ে সিনেমা দেখবি না। কখনও ওকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে-ময়দানে কিংবা গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাবি না। এখন থেকে মনে করবি রতীশের বউয়ের সঙ্গে তোর কোনোদিন পরিচয় হয় নি। কিম্বা সেটা হ'লেও সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে।'

হিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। শুধোল;—'আপনি মরা মায়ের নামে শপথ করলেন ?'

—'হ্যাঁ।' বিজয় মাথা নিচু করে জবাব দিল,—'না করে উপায় ছিল না বৌদি।'

—'কেন ?'

—'বিশ্বাস করুন, রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে তখন আমার কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া একটা কথা আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম।'

—'কী কথা ?'

'—হ্যাঁ, সমস্ত কিছু খুলে বলব।' বিজয় যেন স্বীকারোক্তি দিতে তৈরি। বলল,—'তাই তো আপনার সঙ্গে সেই দুপুর থেকে ঘুরছি বৌদি।'

হিয়া একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। এই মানুষটাকে এখন যেন কেমন নতুন লাগছে। সেই বিজয় নয়। অজানা, অচেনা অন্য কেউ। তার কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদের সুর। ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল

করে নিয়ে বিজয় বলল,—'ওর সামনে দাঁড়িয়ে আমার মরা মায়ের নামে দিব্যি করলাম। কিন্তু একটা শর্তে। এই সব কথা রতীশ কোনোদিন আপনাকে বলতে পারবে না। শুধু আমি বলব। আর একটি দিন ঠিক আগের মতো দুজনে ঘুরে বেড়াব। নিউ মার্কেটে সেই চায়ের দোকানে যাব। ছবি দেখব। ময়দানে কিংবা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসব। তারপর রাত্তিরে দুজনে রেস্তোরাঁতে খেয়ে চিরকালের মতো আপনার জীবন থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাব। কোনোদিন সামনে এসে দাঁড়াব না। হঠাৎ দেখা হ'লে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখব।'

—'বিজয়বাবু।' হিয়া অস্ফুটে বলল।

—'হ্যাঁ বৌদি। এই কথাটা এতদিন আপনাকে বলা হয় নি। দশ বছর আগে কতবার ইচ্ছে হয়েছে মুখ ফুটে সব বলে ফেলি। কিন্তু গলার কাছে এসে মাছের কাঁটার মতো কথাটা আটকে গেছে। কিছুতেই বের করতে পারিনি। আসলে ভালবাসা কী জানেন বৌদি? অল্প একটু জ্বর হ'লে বাইরের কেউ তা টের পায় না। কিন্তু যার হয়, মৃদু উত্তাপ একমাত্র সেই বুঝতে পারে। ভালোবাসা ঠিক তাই। হঠাৎ একদিন টের পেলাম, আপনার একটা সুন্দর ছবি নিভৃত মনের কোনে কখন যেন এঁকে ফেলেছি। দশ বছরে সেই ছবিটা কই ভুলতে পারলাম না। তাহলে রতীশ তো কোনো অন্যায় বলে নি। সিনেমা দেখার নাম করে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।'

হিয়া নিবিষ্ট মনে শুনছিল। ভালো সন্দেশ খাওয়ার মতো একটা সুখানুভূতিতে তার গলা বুজে এলো। প্রার্থিত পুরুষের মুখে প্রেমের এই স্বীকারোক্তি কানে বড়ো মধুর, বাঁশীর সুরের মতো মিষ্টি শোনাল।

বিজয় বলল,—'আমার অবস্থাটা কী হ'ল জানেন? দশ বছরে অন্য কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই মনের কোনে আঁকা সেই ছবিটা অন্তরে ভেসে উঠত। বন্ধুরা প্রথমে অনেক চেষ্টা করেছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে তারা জবাব দিয়ে গেল,—ধুর ছাই। তোর দেখি মেয়ে পছন্দ হয় না। থাক তবে সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে'।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অদূরে অন্ধকার নেমেছে। সৌধের আশেপাশে আবছা আলো। কাছাকাছি কোনো লোক নেই। যারা বসেছিল, তারা কখন উঠে গেছে। তবু হিয়া ফিসফিস করে বলল,—'আপনার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নিন বিজয়বাবু।'

—'তা হয় না বৌদি।' বিজয় ম্লান হাসল। বলল,—'আপনি কী ভাবছেন রতীশ জোর করে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেছে? না আমি ভয় পেয়ে নিজেকে বাঁচাতে ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি? আসলে ওই প্রতিজ্ঞাটুকু করা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।'

—'কিন্তু সমস্ত জীবন নিজেকে এইভাবে বঞ্চিত করলেন কেন?' হিয়া মৃদুস্বরে বলল। আপনার মনের বাসনা যখন পূর্ণ হতে কোনো বাধা নেই।' 'বঞ্চিত না করলে কী হ'ত জানেন?' বিজয় যেন তাকেই প্রশ্ন করল। ফের নিজেই বলল,—'একটু আগে তো আপনি প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নিতে বলছিলেন। সেটা করতে হ'লে রতীশের ঘর ভাঙত। তাহলে চন্দ্রকান্ত তো ঠিকই ধরেছিল। সিনেমা দেখার সুযোগ নিয়ে বন্ধুর স্ত্রীকে আমি ফুসলিয়ে বের করে আনতে চেয়েছি। আর রতীশ যে বলেছিল, তাহলে সে কথাও তো মিথ্যে হয়ে যেত। তারপর রাঁচী থেকে ফিরে এসে নিলয় যখন সব শুনত, তখন আপনি কী জবাবদিহি করতেন বৌদি?'

হিয়া মুখ নিচু করে রইল। একটি কথাও বলতে পারল না।

বিজয় বলল—'তার চেয়ে এই বোধহয় ভালো হ'ল বৌদি। একদিন রতীশ ঠিক বুঝতে পারবে তার কোনো ক্ষতি আমি করি নি। অবশ্য মনে মনে হিয়া বৌদিকে ভালোবেসেছি। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি নিয়ে কোনোদিন তার দিকে হাত বাড়াই নি।'

হিয়া বলল,—'আপনি শুধু নিজের দিকটাই দেখলেন বিজয়বাবু। বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে মরা মায়ের নামে শপথ করে অনায়াসে ভালোমানুষ সাজতে পারলেন। তারপর মনের মধ্যে যার ছবি এঁকেছিলেন, সমস্ত জীবন হয়তো তার কথা ভেবেই ব্যাচিলর হয়ে কাটিয়ে দেবেন। লোকে নিশ্চয় একদিন আপনার ভালোবাসা আর ত্যাগের প্রশংসা করবে। কিন্তু সেই মেয়েটির কথা কী একবারও ভেবেছেন?'

—'হিয়া।'

এতদিন পরে প্রায়ান্ধকার রাতে বিজয় হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকতেই সে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। অন্তরের সব দুঃখ উজাড় করে জানাল,—'জীবনে আমি কী পেলাম বলতে পার? যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল স্ত্রীকে সে কেবল একটা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে শিখেছে। হৃদয় দূরে থাক, রক্ত-মাংসের একটি মেয়ের মনের ছোট্ট সাধ-আহ্লাদের কথা কোনোদিন জানতে চেষ্টা করল না।'

—'আমি সব জানি।' বিজয় গাঢ়স্বরে বলল,—'রতীশকে চিনতে আমার একটুও দেরি হয় নি।'

–'তাহলে ? ওই মানুষটার কাছে আমাকে সমস্ত জীবন পড়ে থাকতে বলছ ? তোমার মতো একজন পুরুষের মন আমি আনন্দের জোয়ারে কানায় কানায় ভরে তুলতাম। সে সুযোগ আমাকে দিলে কোনোদিন ঠকতে না।'

আবছা অন্ধকারে দুজনে মুখোমুখি বসে। বাতাস এখন অনেক শীতল, বোধহয় হিম পড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে বিজয়ের একটা হাত নিজের নরম মুঠোর মধ্যে সে টেনে নিল। অনেকক্ষণ পরে বলল, –'তোমার ওই প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নাও বিজয়।'

সে কোনো জবাব দিল না। বোধহয় সমস্ত কিছু গভীরভাবে চিন্তা করছিল। ভাবনা শেষ হ'লে ম্লান হেসে বলল, –'এখন আর তা হয় না হিয়া। রতীশ আর চন্দ্রকান্তর সামনে দাঁড়িয়ে মরা মায়ের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। শুধু একটি দিন ছাড়া আর কখনও তোমার সামনে এসে দাঁড়াব না। বড়ো মুখ করে বলেছি, বন্ধুর ঘর ভাঙার কুমতলব আমার কোনোদিন ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না। সেদিনের প্রতিজ্ঞা যদি এখন না রাখি তাহলে রতীশের ঘর ভাঙার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে। জীবনে কোনোদিন আমরা সুখী হতে পারব ভেবেছ ?'

হাতের মুঠো কখন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে হিয়া বলল,—'এই মাত্র ভালোবাসার বড়াই করছিলে না ? যার কথা ভেবে সমস্ত জীবন একলা কাটাবে, তার চেয়ে পাপ-পুণ্যের চিন্তা তোমার কাছে বড়ো হ'ল বিজয় ?' এক মুহূর্ত থেমে ফের সে অনুনয় করল, –'অন্তত আর একটি বার তুমি ভেবে দেখ।'

বিজয় মুখ নিচু করে উত্তর দিল, –'আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি হিয়া। এখন আর তা বদলান যায় না।'

–'বুঝতে পেরেছি।' ঘৃণায় মুখ কুঁচকে হিয়া কথা কইল। 'পাপ-পুণ্যের দোহাই তোমার মিথ্যে অজুহাত। আসলে তুমি খুব দুর্বল, কাপুরুষ।'

—'আমাকে কাপুরুষ বলছ ?' বিজয়কে ঈষৎ আহত দেখাল।

—'হ্যাঁ, তার বেশী তুমি কিছু নও।' আগের মতো সে ঠোঁট বিকৃত করে তাকিয়ে রইল। ফের কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'তাছাড়া আমার স্বামীকে তুমি মনে মনে ভয় পাও। একটু আগে জোর গলায় বলছিলে, বন্ধুর ঘর ভাঙার কু-অভিসন্ধি তোমার কোনোকালে ছিল না। আসলে ওটাই সত্যি। ঘর ভাঙা দূরে যাক, আমার স্বামীর হাতের মুঠো থেকে একটা সামান্য জিনিসও ছিনিয়ে নেবার মতো দুঃসাহস তোমার কোনোদিন হবে না।'

কথা শেষ করেই হিয়া উঠে দাঁড়াল। চটিটা পায়ে গলিয়ে তাড়াতাড়ি

পিছন ফিরল।

বিজয় বলল, – 'রাত্তিরে রেস্তোরাঁতে খাওয়ার ঠিক ছিল কিন্তু।'

– 'খাওয়া মানে ডিনার ?' হিয়া ঠোঁট টিপে প্রায় কটাক্ষ করে যেন ব্যঙ্গ করল। ফের কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল – 'চন্দ্রকান্তবাবু যা বলেছিলেন সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে থাকবে ? নিজের মৃতা মায়ের নামে একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছ, মোহে কিম্বা দুর্বলতার বশে সেটা ভেঙে স্বর্গগতা জননীকে তোমার পাপের ভাগীদার করবে না আশা করি।'

– 'হিয়া' বিজয় যেন তাকে মিনতি করল।

– 'ছি। ওই নামে আমাকে ডাকবার কোনো অধিকার তোমার নেই।' হিয়া সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। ফের গম্ভীর মুখে বলল, – 'তোমার মতো একজন দুর্বল পুরুষের কাছে নিজেকে ছোট করেছি ভাবলে লজ্জায় আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ই'চ্ছে হবে।'

খানিকটা দূরে রাস্তার ওপর দু-চারটে খালি ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাই একটা নেবার জন্য হিয়া দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বিজয় নির্বাক, চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

সে ভাবছিল দশ বছর পরে মহম্মদ আলী পার্কের কাছে হিয়ার সঙ্গে সেদিন তার দেখা না হ'লে আজকের এই বিশ্রী পরিস্থিতির আবর্তে তাকে পডতে হ'ত না।



গাড়ির কাছে এসে রঘুনন্দন দেখল চামেলী একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় চারটে বাজে। এখন ঠিক ডিউটি শুরু হবার সময় নয়। আয়াদের আট ঘণ্টা করে কাজ। সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত। তারপর দুপুর দুটো থেকে রাত্তির দশটা। আর নাইট ডিউটি গিয়ে শেষ হয় সেই সকাল ছটায়। তবে রুগীর অবস্থা তেমন মনে হ'লে কিম্বা পার্টি চাইলে আয়াকে আরো দু-চার ঘণ্টা থাকতে হয়। তার জন্য আলাদা টাকা পায়। চামেলী

অমন কতবার বাড়তি সময় ডিউটি দিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন ধরে সে প্রায় ডিউটিতে কামাই করছে। কাজে এলেও দুপুরের শিফট্ ভিন্ন অন্য কোনো ডিউটি নেয় না। মাঝে প্রায় পনের দিন ছুটি নিয়ে হাওড়ার কাছে ঝিকড়দাতে তার কাকার বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে আসতেই ফের সেই ঝামেলা শুরু হয়েছে।

সেদিন থেকে নগেন আবার প্রেসের কাজে যায়। নিজেই কোন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধপত্র কিনে এনে খাচ্ছে। চামেলীর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। শুধু নার্সিং হোমে ডিউটিতে যাবার কথা উঠলেই বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হতে বাকি থাকে।

ঘটনা প্রথম দিনেই গুরুতর রূপ নিল।

নগেন বেরিয়ে যাবার পর সেদিন দুপুরের শিফটে কাজে গিয়েছিল চামেলী। বাড়ি ফিরতে রাত্তির হ'ল, তা প্রায় এগারোটা। মেয়ে দুটো ঘুমিয়ে কাদা। খাওয়া সেরে নগেনও বিছানায় শুয়ে। বাইরে কড়া নড়ে উঠতেই সে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। চামেলী বাড়ি ঢুকে জুতো ছেড়ে বাথরুমে যাবে ভাবছে, এমন সময় নগেন এসে কেমন ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, – 'গিয়েছিলি কোথায় ?'

– 'কেন ? যেখানে যাই।' একটা কিছু আঁচ করে স্বামীর মুখের ওপর নজর বুলিয়ে সে বলল, – 'ডিউটি দিতে।'

নগেন এবার তার মুখোমুখি দাঁড়াল। মুখখানা শক্ত করে জিজ্ঞাসা করল, – 'তোকে কাল রাত্তিরে কী বলেছিলাম ?'

চামেলী চুপ করে রইল। এই রাত্তির এগারোটায় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না।

নগেন কিন্তু থামে নি। মুখ খিঁচিয়ে রাগের ভঙ্গিতে বলল, – 'তোকে আর ওই আয়াগিরি করতে যেতে হবে না। কথাটা আজ পস্ট বলে দিলাম, মনে থাকে যেন –।'

– 'তার মানে ?' চামেলীকে অগত্যা জবাব দিতে হ'ল। 'না গিয়ে উপায় কী ? দুটো অপোগণ্ড মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হবে না ?'

– 'তার জন্যে আমি আছি।' নগেন প্রায় ধমকে উঠল। 'তোকে সেটা ভাবতে হবে না।'

চামেলী বলল, – 'তোমার ওপর ভরসা করব কিসের জোরে ? অমন একটা শক্ত ব্যামো শরীরে। ফের যদি বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে তো আমাকে উপোস করে মরতে হবে। ভাগ্যিস বসাকবাবুর বাড়িতে তখন রান্নার কাজটা জুটল। তাও পাড়ার কেউ গিয়ে নিশ্চয় ভাংচি দিয়ে এসেছে। গিন্নি তো

আমাকে আর একটি বেলাও রাখতে চায় নি। শেষে ডাক্তারবাবু ওই নার্সিং হোমে কথা বলে এই আয়ার কাজটা জুটিয়ে দিলেন। তাই কোনোরকমে খেয়ে পরে এখনও বেঁচে আছি।'

নগেন গলাবাজী করে বলল,—'এখন তো আর আমার রোগ-অসুখ নেই। এতদিন তোরা মিথ্যে করে সেটা বলে বেড়াস্লি।'

—'মিথ্যে করে? কী বলছ তুমি?' চামেলী যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফের দুঃখ করে বলল,—'তোমার অসুখ ভালো হোক, তাই তো আমি চাই। কিন্তু বুকের মধ্যে যে রোগ বাসা বেঁধেছে, সেটা সেরে গেছে তুমি জানলে কেমন করে?'

—'এ তো আমার কথা নয়। শেয়ালদাতে এক ডাক্তারবাবু দেখে বলেছে।' নগেন মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'অসুখ প্রায় চোদ্দ আনা ভালো হয়ে গেছে। আর যেটুকু আছে, ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। কলকাতায় যা ধুলো আর ধোঁয়া। অমন একটু-আধটু বুকের দোষ অনেকের আছে। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। তাই বলে কী তারা সংসার-ধর্ম পালন করছে না? কাজে না বেরিয়ে কী ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে?'

চামেলী তবু বলল,—'ওগো, সেই বড়ো ডাক্তারবাবুর কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে? অন্তত আরো ছ-মাস বিশ্রাম আর চিকিৎসা না হ'লে তুমি সম্পূর্ণ সেরে উঠবে না।'

—'তাহলে তোর ভারী সুবিধে হয়, তাই না?' নগেন যেন কী একটা ইঙ্গিত করে কথা কইল,—'আরো ছটি মাস সেই ডেরাইভারটার সঙ্গে দিব্যি ফষ্টিনষ্টি করতে পারিস।'

অপমানে চামেলীর মুখখানা কালো হয়ে উঠল। প্রতিবাদ জানিয়ে সে শুধু বলল,—'কী বলতে চাও তুমি?'

—'যা বলতে চাই, সেটা খুব পষ্ট। তোর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধে হয় নি।' নগেন যেন তাকে চিমটি কাটল। ফের দু-হাত প্রসারিত করে প্রায় বীরের মতো ভঙ্গিতে বলল,—'এখন আমি সেরে গেছি। ফের আগের মতো কাজ করছি। মালিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে। কাল থেকে তোর আয়াগিরির টাকা ঘরে না আনলেও আমার সংসার দিব্যি চলবে, কোনো অসুবিধে হবে না।'

রাত্তিরে চামেলী আর কথা বাড়ায় নি। মানুষটার মাথায় যে পোকা ঢুকেছে তাতে কোনো সন্দেহ আছে? এখন নিজের মনে বকবক করবে। মুখের ওপর জবাব দিলে কাণ্ডজ্ঞান হারাতে কতক্ষণ? রাত দুপুরে কুৎসিত ইঙ্গিত করে বউকে

কদর্য গালিগালাজ করতেও ওর জিভে আটকাবে না।

তারপর দুটো দিন ইচ্ছে করেই ঘরে বসে রইল চামেলী। নার্সিং হোমের দিকে আর পা বাড়ায় নি। রগচটা, গোঁয়ার মানুষ। যদি এতে একটু শান্ত হয়। জিদ বজায় থাকলে হয়তো ভাববে,—না বউটা তাকে সত্যি মানে, ভয় করে। তখন হয়তো মত পাল্টাবে। সেই আশায়, পর পর দুদিন কামাই করে একরোখা মানুষটাকে সে ঠাণ্ডা করবে ভাবছিল। একবার মনে করল, রাত দুপুরে ঘরের দরজা খুলে ওর কাছে যাবে। গোঁয়ার-গোবিন্দ যাই হোক, পুরুষমানুষ বৈ তো নয়। তাকে বশ করতে কতক্ষণ? গায়ে হাত বুলিয়ে, সোহাগ করে দুটো মিষ্টি কথা বললেই রাগ জল। নার্সিং হোমে যাওয়ার অনুমতি আদায় করে ফিরবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার খুব ভয় করল। নগেন এখন উপোসী ছারপোকা। হাতের মুঠোয় পেলে আর রেহাই আছে? চামেলীকে কী অমনি ছেড়ে দেবে? ওর নিঃশ্বাসে, থুতুতে, শক্ত ব্যামোর বীজ লুকিয়ে আছে। শেষপর্যন্ত রোগ যদি চামেলীর দেহে সংক্রামিত হয়? তার শরীরেও ওই ব্যাধি বাসা বাঁধে? কথাটা ভাবতেই সে শিউরে উঠল। তাহলে কোনোদিন চামেলীর চিকিৎসা হবে?

কিন্তু ভবী ভোলার নয়।

দুদিন বাদে ফের নার্সিং হোমে গিয়েছিল চামেলী। দুপুর দুটো থেকে রাত্তির দশটা অব্দি ডিউটি। বাড়ি ফিরতে পৌণে এগারোটা বাজল। কড়া নাড়তেই নগেন এসে দরজা খুলে দিল। একটি কথাও বলে নি। জুতো খুলে ঘরে ঢুকে সে দেখল মেয়ে দুটো বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল চামেলী। আজকাল সময় পেলেই তার নিজেকে দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়। দর্পনে ভেসে ওঠা প্রতিবিম্বে সাগরপারের সবুজ দ্বীপের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা জাহাজের কোনো নাবিকের মতো তার নতুন সৌন্দর্যকে সে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। তবে এখন দাঁড়াবার সময় নেই। চামেলীকে বাথরুমে যেতে হবে। রাত্তির যতই হোক ডিউটি থেকে ফিরে এসে চামেলী গা ধোবে। নার্সিং হোমের জামা কাপড় ছেড়ে সাবান জলে ভিজিয়ে রাখবে। পরদিন সকালে তার কাজের মেয়েটি এসে সেগুলি কেচে শুকোতে দেবে।

চামেলী প্রথমে ভেবেছিল নগেন হয়তো তার ডিউটিতে যাওয়া নিয়ে আর চিল্লাচিল্লি করবে না। দুটো দিন তো মুখ বুজে ঘরে বসেছিল। তার জন্য অন্তত তিরিশটি টাকা তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য এই লাভ-লোকসানের কথা এখন নগেনকে বলেও কোনো ফল নেই। প্রেসে ফের কাজ পাওয়ায় পর নগেন যেন হাতে পায়ে বল পেয়েছে। বউয়ের রোজগারের টাকা

সংসারে নিতে হয়তো এখন তার আত্মসম্মানে বাধছে। অথচ কিছুদিন আগেও যখন চাকরি ছিল না, রোগ-অসুখে মুখ বুজে বাড়িতে শুয়ে থাকত, তখন ঘরের বউকে নার্সিং হোমে ডিউটিতে পাঠাতে একবারও আপত্তি করে নি। তারপর বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র আর পথ্যি জুগিয়ে চামেলী যখন তাকে প্রায় সুস্থ করে তুলল, তখন নগেন বউকে শাসিয়ে আয়ার কাজে যেতে তাকে নিষেধ করছে। চেঁচামেচি, কুৎসিৎ গালিগালাজ দিয়ে তার স্বামীত্বের অধিকার ফলোচ্ছ। চামেলী ভাবছিল, পুরুষ জাতটা সত্যি এমন নেমকহারাম হয়?

কয়েক মিনিট না যেতেই ঘরের দরজা ঠেলে নগেন ভিতরে ঢুকল। চামেলী তখন গায়ের জামা খুলে বাথরুমে যাবার জন্য তোয়ালেটা খুঁজছে। অতর্কিতে স্বামীকে সামনে দেখেই, কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক করে বুকের কাছটা ঢেকে দিল। নগেন ভনিতা না করেই স্ত্রীকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল,—'ফের কেন তুই আয়ার কাজে গিয়েছিলি?'

চামেলী বুঝতে পারল, এবার তাকে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। বিষয়টা যত সহজ হবে সে ভেবেছিল, তা হয় নি। শুধু রাগের বশে কিম্বা ঝোঁকের মাথায় নগেন তাকে আয়ার কাজে যেতে নিষেধ করে নি। তাহলে দু-চারদিন বাদে ব্যাপারটা নিয়ে ফের এমন জেদাজেদি করত না। প্রথমে সে ভেবেছিল গোঁয়ার মানুষটার মাথা ঠাণ্ডা হ'লেই আবার সে নার্সিং হোমের কাজে বেরুতে পারবে। এ ধারণা এখন তো প্রায় মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে চলেছে। আসলে নগেনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। চামেলীর কাছে বাইরের পৃথিবীর দরজাটা সে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিতে চাইছে।

মুখখানা শক্ত করে চামেলী জবাব দিল,—'সেখানে গিয়ে কিছু অন্যায় করেছি?'

নগেন বুদ্ধি খাটিয়ে বলল,—'ন্যায়-অন্যায়ের কথা ছাড়। মেয়েমানুষ কাজ করতে যায় সংসারের প্রয়োজন থাকলে। এখন আর তোর রোজগারের দরকার নেই। তাই আয়াগিরির চাকরিতে জবাব দিয়ে আসবি।'

চামেলী বলল,—'দরকার নেই তাই বা বুঝছ কেমন করে? তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী দুজনে চাকরি করলে সংসারের সুরাহা হয়, স্বচ্ছলতা থাকে। হঠাৎ একটা বিপদে-আপদে পড়লে ধারদেনায় মাথার চুল বিকোয় না। আমাদের ওই নার্সিং হোমে স্বামী-স্ত্রী দুজনে ডাক্তার—এমন কত রয়েছে। অনেক নার্স দিদি আছে, তাদের সোয়ামীরা সব অন্য কাজ করে। কই তারা তো কেউ বউকে চাকরিতে জবাব দিয়ে আসতে বলে নি?'

অকাট্য যুক্তি। নগেন ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল, বছরখানেক

বাইরে গিয়ে চামেলী সুন্দর কথা বলতে শিখেছে। এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠবে না। মেজাজ দেখিয়ে সে বলল,—'কে কী করছে তাই নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আগে শরীরে অসুখ ছিল, তাই সংসারের প্রয়োজনে চাকরি করতে গিয়েছিস। এখন আমি সেরে উঠেছি, কাজেকর্মে যাচ্ছি। তাই তোর আয়াগিরিতে আর দরকার নেই।'

চামেলী বলল,—'কী অদ্ভুত মানুষ তুমি? সংসারে টাকা পয়সার প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় নাকি? আর তুমি যা রোজগার করে আনবে তাতে টেনেটুনে সংসার চলে। আগের পক্ষের ছেলেটাকেও তো মাসে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাঠাতে হয়। অসুখ করবার পর কতদিন একটি পয়সা দেওয়া হয় নি।'

নগেন মুখ বিকৃত করে বলল,—'থাক। সতীনপোর জন্যে তোকে আর দরদ দেখাতে হবে না।'

তবু সে কথা গায়ে না মেখে চামেলী বোঝাল,—'এখন যদি খেটেখুটে মাস গেলে তিন-চার'শ টাকা ঘরে আনতে পারি তাহলে কতখানি সাশ্রয় বল? পায়ের ওপর পা তুলে রাজার হালে থাকবে। তাছাড়া'—

—'তাছাড়া কী?' নগেন যেন খিঁচিয়ে উঠল। 'যা বলছিলি শেষ কর।'

চামেলী মুখ নিচু করে বলল,—'আমার তো মনে হয় এখনও তোমার অসুখ সারে নি। এত তাড়াতাড়ি বোধহয় কাজে না বেরুলেই পারতে।'

শুনে নগেন যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। রাগে খাপ্পা হয়ে বলল,—'আমার অসুখ সেরেছে কিনা সেটা তুই বুঝবি?'

চামেলী তবু বলতে ছাড়ল না,—'আমি কেন বুঝতে যাব? স্পেশ্যাল ডাক্তারবাবু সেকথা নিজেই বলেছেন। এখনও অসুখ পুরো সারে নি। আরো ছ-মাস বিশ্রাম আর ওষুধপত্র খেলে তবেই সেরে উঠবে।'

নগেন প্রায় চিৎকার করে বলল,—'আমার অসুখ আছে কিনা সে আমি বুঝব। কিন্তু তোকে সাফ কথা বলে দিলাম চামেলী। কাল থেকে ফের যদি আয়ার কাজে বেরোতে দেখি, তাহলে একটা কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়ব।'

—'কুরুক্ষেত্তরের আর কী বাকি আছে?' চামেলী অসীম বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল। ফের বলল,—'রাত দুপুরে চেঁচামেচি। তা এতদিন কেন বউকে সেই আয়াগিরি করতে পাঠিয়েছিলে? কথায় বলে,—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।'

নগেন হঠাৎ এগিয়ে এসে শাসাল,—'আমার সামনে দাঁড়িয়ে বল, কাল থেকে আর ওই নার্সিং হোমে আয়ার কাজ করতে যাবি না।'

—'আমি সেকথা বলতে পারব না।' চামেলী জোরগলায় অস্বীকার করল।

বলল,—'এতদিন ওই আয়ার কাজ করে সংসারে চারটে প্রাণীর মুখে অন্ন জুটেছে। যতদিন পারব ওই কাজ আমাকে করতেই হবে।'

—'তাই নাকি?' নগেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ শার্দূলের মতো গজরাতে লাগল। 'তুই তাহলে ফের কাজে যাবি?'

—'হ্যাঁ। অপোগণ্ড দুটোর কথা ভেবে এখন আমার কাজ ছাড়লে চলবে না।' চামেলী তার শেষ কথা জানিয়ে দিল।

এগিয়ে এসে নগেন হঠাৎ তার চুলের গোছায় হাত দিল। শক্ত করে মুঠিতে ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিতেই চামেলী প্রায় আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু নগেন তাকে রেহাই দিল না। সজোরে তার পিঠে, ঘাড়ে, কয়েকটা কিল চড় বসিয়ে দিল। চামেলী আর সহ্য করতে না পেরে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। ঘরের মধ্যে অমন একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হতেই মেয়ে দুটো ঘুম ভেঙে উঠে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। স্ত্রীর গায়ে নগেন আর হাত তুলল না। কিন্তু শাসিয়ে বলল,—'ফের যদি কাল আয়াগিরি করতে যাবি, তাহলে তোর একদিন কী আমারই একদিন।' চৌকাঠ পেরিয়ে অন্য ঘরে যাবার আগে নগেন কুৎসিৎ মুখভঙ্গি করে বলল,—'ওখানে কিসের টানে যাস সে কথা পাড়াসুদ্ধ লোক জানে। নাইট-ডিউটির নামে ওই ড্রেরাইভারটার সঙ্গে ছেনালি করে ঘরে ফিরে সতীপনা ফলাচ্ছিস?'

পরদিন সকালে নগেন কাজে বেরোবার পর চামেলী যাবার জন্য তৈরি হ'ল। নিজের জামাকাপড়, মেয়ে দুটোর কখানা করে ইজের আর ফ্রক গুছিয়ে নিয়ে সে হাওড়ার কাছে ঝিকড়দার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। ঝিকড়দাতে তার কাকার বাড়ি। ছেলেবেলায় মা-বাবা দুজনেই গত হয়েছে। তাদের কথা ভালো করে মনে নেই। ওই কাকার বাড়িতে বাসন মেজে, ঘর মুছে, গোবর কুড়িয়ে দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে চামেলী পঁচিশ বছর কাটিয়ে ছিল। তবু পাত্র জোটে নি। গ্রামের ঠাকুমা-দিদিমার বয়সীরা কতবার তার কাকাকে এসে বলে গেছে,— 'ভাইঝিটাকে কী চিরকাল গলায় ঝুলিয়ে রাখবি? এবার একটা বিয়ে-থার ব্যবস্থা কর। বয়সকালে বে হ'লে যে আজ তিন ছেলের মা হ'ত।'

শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খবর পেয়ে কাকা ওই নগেনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ করল। দোজবরে, তায় বয়সটা একটু বেশী। কিন্তু চামেলীর তাই নিয়ে মনে কোনো দুঃখ ছিল না। বরং ফুলশয্যের রাত্তিরে নগেন অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল। তাই শুনে চামেলীর বুকটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। মনে হ'ল হোক দোজবরে, তবু মানুষটা ভালো। নিশ্চয় তাকে জীবনে সুখী করতে পারবে। বিয়ের পর চামেলী আর ঝিকড়দাতে কবার গিয়েছে? সাকুল্যে তিন-চার

বার। গেলেও একদিন কিম্বা বড় জোর দুটো দিন থেকে চলে এসেছে। তখন সংসার সামলাতে চামেলী ব্যতিব্যস্ত। কাকার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? ক'লকাতায় এলে কাকা অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করে। বিয়ের আগে কাকীমা তাকে উঠতে বসতে খাওয়ার খোঁটা দিত। কাজে-কর্মে একটু আলগা দিলেই বলত,—'গতরে আর কত সুখ করবে? দুবেলা কাকার ঘাড়ে বসে খেয়ে গায়ে তো দিব্যি গত্তি লেগেছে। ঘরের দুটো কুটো নেড়ে সংসারের একটু উবগার করতে ইচ্ছে হয় না?' তবে কাকা তাকে ভালবাসে। নিজের দাদার মেয়ে, মা-বাপ বেঁচে থাকতে ওই কাকা নাকি তাকে কোলে করে গাঁয়ের এপাড়া-ওপাড়া বেড়িয়ে এসেছে।

চামেলী গিয়ে যখন ঝিকড়দাতে পৌঁছল, তখন বেলা দুটো বাজে। কাকা সবে খাওয়া সেরে উঠে একটা লাউগাছের গোড়ায় কুলকুচি করে জল ফেলছে। চামেলীকে দেখে বলে উঠল,—'ওমা! তুই কখন এলি?'

—'এই মাত্তর।' চামেলী একগাল হেসে জবাব দিল। কাকার জন্যে বুদ্ধি করে সে এক বাক্স সন্দেশ এনেছে। কাকীর জন্য চল্লিশ টাকা খরচ করে একটা তাঁতের শাড়ি। এখন হাতে পয়সা কড়ি থাকে। তাছাড়া নিজের রোজগার। প্রয়োজন হ'লে নগেনের কাছে হাত পাততে হয় না। চামেলী দু-তিন'শ টাকা আলাদা জমিয়ে রেখেছিল। আসবার সময় তার খানিকটা সঙ্গে এনেছে।

চামেলীর গলা শুনে কাকী আর খুড়তুতো ভাইবোনেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গেরস্থ বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ এলেই প্রথমে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। তারপর আবার সব থিতিয়ে আসে। চামেলী নিচু হয়ে কাকা আর কাকীকে প্রণাম করল। তার দেখাদেখি মেয়ে দুটো ঢিপ ঢিপ করে গুরুজনদের পায়ের কাছে মাথা ঠেকাল। ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে কাকা রসিকতা করে বলল,—'ওগো, এই শালীটা তো দিব্যি ফুটফুটে সুন্দরী হয়েছে। তাহলে পুরুত ডেকে পাঁজি-পুঁথি বের করে একটা বিয়ের দিন স্থির করি।'

শাড়ি পেয়ে কাকী অবাক খুশি। তবু ঢঙ করে বলল,—'ওমা! আমার জন্যে আবার শাড়ি নিয়ে আসা কেন তোর?'

—'তাতে কী হয়েছে? আমার বুঝি নিজের হাতে তোমাকে একটা কাপড় দিতে ইচ্ছে করে না?' চামেলী কেমন ছেলেমানুষের মতো আবদেরে গলায় কথা কইল। সংসার ভারী বিচিত্র স্থান। তার মুখ দেখে একবারও মনে হ'ল না বিয়ের আগে রাগের মাথায় এই কাকী একদিন তার পিঠে একটা আস্ত চেলা-কাঠ বসিয়ে দিয়েছিল। উল্টে চামেলী বরং হেসে বলল,—'এখন তো আমার নিজের রোজগার কাকী। কেন, কাকা তোমায় কিছু বলে নি?'

নগেনের অসুখ হবার পর এই একটা বছর চামেলী আর ঝিকড়দাতে আসে নি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কাউকে চিঠিপত্র লিখে সংসারের দুরবস্থার কথা জানায় নি। অবশ্য জানিয়ে কোনো ফল হ'ত না। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবার মতো কারো অবস্থা নয়। মিছিমিছি চিঠি লিখে বিব্রত করা। তাছাড়া বসাকবাবুর চেষ্টায় কিম্বা ঈশ্বরের অনুগ্রহে হোক নার্সিং হোমে আয়ার কাজটা পেতেই সংসারের দুঃখ-ধান্দা থেকে চামেলী প্রায় মুক্তি পেয়েছে। আর নগেন যাই অপবাদ দিক, রঘুনন্দন নিজে উদ্যোগী হয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল,—তাই ওষুধপত্রের দরুণ ঘর থেকে একটি পয়সাও চামেলীকে বের করতে হয় নি।

কাকা অবশ্য পরে সব জানতে পেরেছিল। নগেনের ওই অসুখ, তারপর চামেলী এখন একটা নার্সিং হোমে আয়ার কাজ করে সংসারের অভাব-অনটন মেটাচ্ছে। একদিন ওই রঘুনন্দনের গাড়িতে ডাক্তার দেখিয়ে নগেনকে নিয়ে ফিরেছে। কাকা তখন বাড়িতে এলো। সব শুনে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রশংসা করে বলেছিল,—'বুঝলি, তোর তপিস্যের জোরে বোধহয় জামাই ভালো হয়ে উঠবে।'

—'ওমা, তাই তো?' কাকী যেন লজ্জা পেয়ে বলল। 'মেয়ে যে এখন নিজেই চার-পাঁচ'শ টাকা রোজগার করে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে কাকীর জন্যে একটা শাড়ি আনতে পারে বৈ কি।'

তার কাকা বলল,—'হ্যারে, নগেন এখন কেমন আছে? আমি তো আর তেমন খোঁজখবর নিতে পারি নি।'

—'সে তো আবার প্রেসের চাকরিতে ঢুকেছে।' চামেলী শুধু যেন একটা সংবাদ জানাল।

কাকী জিজ্ঞাসা করল,—'তাহলে তো জামাইয়ের অসুখ সেরে গেছে, কী বল?'

চামেলী কী যেন চিন্তা করল। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'রোগ-ব্যাধির কথা ডাক্তার-বদ্যিতে জানে। বোধহয় ভালো হয়ে গেছে বলে নিজে মনে করে। নইলে ফের চাকরিতে ঢুকবে কেন?'

কাকা বলল,—'তা সে যাই হোক, এবার অন্তত একটা হপ্তা এখানে থেকে যা। কতদিন আসিস নি।'

কাকীও সেই কথা বলল,—'একবার যখন আসতে পেরেছিস, তখন কটা দিন কাটিয়ে যাস। আর ওই একটা হপ্তা হুস করে পেরিয়ে যাবে। জামাই রাগ-রোষ করলে আমার নাম করে বলবি, কাকী কিছুতেই আসতে দিল না।'

চামেলী নিজেও তাই চাইছিল। অন্তত কিছুদিন এখানে থেকে যাবে। এক মাস পর্যন্ত কামাই করলে নার্সিং হোমে হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু

তারপর ? যদি সে ছুটি বাড়িয়েই চলে তাহলে নিশ্চয় তার জায়গায় বদলি লোক নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চামেলী কী করবে ? নার্সিং হোমে আয়ার কাজটা ছেড়ে ফের তার আগের জীবনে ফিরে যাবে ? পাড়ার আরো পাঁচটা বউ-ঝিউড়ির মতো সকালে মাটির কলসী পেতে কলে জল ধরবে ? এঁটো হাঁড়ি-কড়া, এক গাদা থালা-বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে মাজতে বসবে ? মাথায় কাপড় দিয়ে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাওয়ার সময় হঠাৎ কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে একপাশে দাঁড়াবে ? অথবা আর একটা রাস্তা আছে। নগেনের হুকুম অগ্রাহ্য করে ফের সেখানে ডিউটিতে যেতে পারে। কিন্তু তার পরিণতি যে কতদূর অব্দি গড়াবে, চামেলী নিজে তা ভালো করে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য তার রঘুনন্দনের কথা মনে পড়ল। নগেনের আসল রাগটা তো সেইখানে। তবে দোষটা শুধু স্বামীর একার নয়। পাড়ার পাঁচটা কুচুক্কুরে মেয়ে-পুরুষ নগেনের কানে মন্তর দিয়ে তার মনটাকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছে। অথচ রঘুনন্দন মানুষটা কত ভালো। লম্বা-চওড়া চেহারা, কোঁকড়া চুল, পুরুষালী গড়ন। চামেলী কতদিন লুকিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। মাঝে মাঝে এমনও ইচ্ছে হয়, ওই মানুষটার প্রশস্ত রোমশ বুকে সে ঢিপ ঢিপ করে মাথা ঠুকে মরে। কেন যে এমন চিন্তা মাথায় আসে তা সে জানে না। কিন্তু ইচ্ছেটা হয়, বুকের মধ্যে কোথায় যে সেটা লুকিয়ে থাকে চামেলী টের পায় না।

ঝিকড়দাতে কটা দিন দিব্যি কাটল। এককালে মার্টিনের রেলের গাড়ি তাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে চলত। ছেলেবেলায় ছোট্ট একটা ইঞ্জিন আর চার-পাঁচটা কামরা নিয়ে রেলগাড়িটা কু-ঝিক-ঝিক করে তার বন্ধু অনিমাদের বাড়ির উঠোনের ধার মাড়িয়ে যেত। তারা দুজনে মিলে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খানিকটা দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ত। ঝিকড়দা গ্রামের চারপাশে মাঠ, ঘরের পিছনে কালকাসুন্দের ঝোপ। হলুদ রঙের কটু-গন্ধ ছড়ানো কী একটা বুনো ফুল ফুটেছে। গোয়াল ঘরের পিছনে আস্তাকুঁড়ের ধার ঘেঁষে তেশিরা ফণী মনসার গাছ। পুকুরের জলে টোকচা পানা। ভোর হতেই গেরস্থের হাঁস দল বেঁধে ঘাটে নামে। বিকেল হলেই আকাশ কী সুন্দর ফটফটে নীল। বকের দল পালতোলা নৌকোর মতো সাদা পাখা মেলে দূরে তেঁতুল গাছটার মগডালে গিয়ে বসে। চামেলী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাখে। এখানকার মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস তার শৈশবের অকিঞ্চিৎ কর নানা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

নগেনের সঙ্গে তার কলহ-বিবাদের কাহিনী চামেলী কারো কাছে ভাঙেনি। সে জানে ভবিষ্যতের কথা এখন তার ভাবনা। ঝিকড়দা থেকে ফিরে যাবার

আগেই চামেলীকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে চোখে তাই ঘুম নামে না। দ্বিতীয় প্রহরে শেয়ালের ডাক শোনা পর্যন্ত সে প্রায় জেগে থাকে। কখনও পাশ ফিরে মাটির ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বলে একটা নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে নিজের কথা আরো বেশী করে ভাবে।

কাকী শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল,—'তোর ওই ঘাড়ের কাছে অমন কালসিটের দাগটা কিসের?'

প্রথমটা চামেলী একটু থতমত করল। তারপর ঢোক গিলে বলল,—'ওই তো সেদিন বাসে উঠতে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা। ওর হাতে কী ছিল কে জানে? সেটা লেগেই তো অমনি দাগ পড়েছে।' প্রায় ধরা পড়ে গিয়েও একটা মিথ্যে কথা বলে চামেলী কোনোমতে নিজেকে বাঁচাল। কালসিটের দাগটা আসলে নগেনের অত্যাচারের চিহ্ন। সেই রাত্তিরে ক্রুদ্ধ স্বামী তার দেহে এলোপাথাড়ি কিলচড় মেরেছিল। চামেলী আর একটু সাবধান হ'লে ভালো করত। মেয়েমানুষের চোখে এসব বড়ো একটা এড়ায় না।

সাতদিন নয়, ঝিকড়দা থেকে চামেলী ফিরল পনের দিন পরে। আশ্চর্য! প্রেসের কাজ সেরে বাড়ি এসে নগেন কিন্তু একবারও সেই রাত্তিরের ঘটনার কথা উল্লেখ করল না। বরং তার খুড়শ্বশুর আর খুড়শাশুড়ির খোঁজখবর নিল। মেয়ে দুটোকে একটু আদর করল। চামেলী দেখে ভাবল এই দশ দিনে মানুষটা হয়তো বদলে গেছে। এবার বোধহয় সে ডিউটিতে যেতে চাইলে চোয়াড়ের মতো অমন জঘন্য গালিগালাজ করবে না। রাত্তিরে খাওয়ার পর নগেন হঠাৎ বলল,—'আর আলাদা ঘরে তোর শুয়ে কাজ নেই। আগের মতো একসঙ্গে বিছানা কর।'

চামেলী চোখ বড়ো বড়ো করে বলল,—'ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে?'

—'কেন?' নগেন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল,—'আগে চারজনের একসঙ্গে বিছানা হয় নি?

চামেলী খুব নরম হয়ে বলল,—'তখন তোমার ওই রোগব্যাধি ছিল না।'

—'অসুখ আমার কবে সেরে গেছে।' নগেন যেন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত দিল। ফের মন্তব্য করল,—'এখন দিব্যি সুস্থ আছি। মিছিমিছি তুই এত ভয়-ডর করিস কেন বল দিকি?'

চামেলী তবু খুঁতখুঁত করল, 'অন্তত আরো কটা মাস যাক, তারপর—'।

নগেন এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরল। বউয়ের গাল টিপে আদর করে বলল,—'আচ্ছা বোকা মেয়ে তুই। আমি সুস্থ হয়েছি, প্রেসের মালিক তাই ডেকে চাকরি দিয়েছে। শরীরে রোগ থাকলে কেউ কাজে বহাল করে ?'

চামেলী বলল,—'তাহলে একবার সেই বড়ো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসবে চল। তুমি রাজি থাকলে রঘুনন্দনকে কাল-পরশুর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে বলি।'

বারুদের স্তূপে যেন একটি প্রজ্বলিত দিয়াশলাই শিখা পড়ল। নগেন তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল,—'আচ্ছা ঢ্যামনা মেয়েমানুষ তো তুই। ডেরাইভারটার কথা বুঝি এখনও ভুলতে পারিস নি ?'

চামেলী চুপ করে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'ওই ভালোমানুষটার ওপর দেখি তোমার বড়ো আক্রোশ।'

—'কী বললি ?' নগেন ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো রুখে দাঁড়াল। 'ওই ডেরাইভারটা তোর কাছে ভালোমানুষ হ'ল ?'

চামেলীর আর ধৈর্য সইল না। সে তখুনি জবাব দিল, –'হ্যাঁ ভালোমানুষ, নিশ্চয় ভালোমানুষ। তোমার মতো তার মনে পাপ নেই।'

– 'কী বললি ? আমার মনে পাপ আছে ?' নগেন এগিয়ে এসে দুই হাতে তার গলা টিপে ধরল। ফিসফিস করে বলল,—'আর একটি কথা মুখ দিয়ে বেরুলে তোকে আজ খুন করে ছাড়ব।'

চামেলী ধস্তাধস্তি করে কোনোমতে নিজেকে মুক্ত করল। কিন্তু নগেন তখন মরীয়া, সে অসহায় রমণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, চড়, ঘুঁষিতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। চামেলী পড়ে পড়ে মার খেল, তবু তার মুখ দিয়ে এতটুকু কাতরোক্তি বেরোল না।

পরদিন সকালে ভুবনপিসী এসে হাজির। নগেন তখন কাজে গিয়েছে। গতরাতের মারধোরের চিহ্ন সমস্ত দেহে। ঠোঁটের কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছিল। কপালের ঠিক ওপরে একটা কিল খেয়ে সেখানটা গোটা সুপুরির মতো ফুলে রয়েছে।

একনজর তার দিকে তাকিয়ে ভুবনপিসী হঠাৎ সহানুভূতিতে গলে পড়ল, —'ছি-ছি ! নগেন কী শুরু করেছে বল দিকি ? গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো রাত দুপুরে বউটাকে ধরে ঠ্যাঙাবে নাকি ? আসুক আজ বাড়িতে। আমি পরিষ্কার বলে দেব, পাড়ায় ঘরে বসে এসব কেলেঙ্কারী চলবে না।'

চামেলী কোনো জবাব দেয়নি। সে এদিক-সেদিক ঘুরে সংসারের কাজ দেখছিল।

ভুবনপিসী বলল,—'আর তোমাকেও বলি বাছা। ওই আয়ার কাজে না গেলেই পার। সোয়ামী যখন পছন্দ করে না, তখন মিছিমিছি অশান্তি বাড়িয়ে কী লাভ? শুধু শুধু ঘরে বসে মার খাচ্ছ।'

চামেলী তবু চুপ। একটি কথাও বলে নি।

ভুবনপিসী ফের বলল,—'অবিশ্যি নগেনকেও দোষ দেওয়া চলে না। তুমি যদি একটা পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি শুরু কর, তাহলে সোয়ামী বা মুখ বুজে থাকবে কেমন করে? যত গণ্ডগোল তো ওই ডেরাইভার ছোঁড়াটাকে নিয়ে। তোমাকে গাড়িতে তুলে নাকি এ-মুল্লুক, সে-মুল্লুক করে বেড়ায়। চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে। নগেন যে একটা বছর ধরে মুখ বুজে ছিল সেই ঢের।'

চামেলীর আর সহ্য হ'ল না। সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল,—পিসীমা, আপনি এখন বাড়ি যান।'

এমন একটা জবাব তার মুখের ওপর কেউ ছুড়ে দিতে পারে ভুবনপিসী বোধহয় তো ভাবতেও পারেনি। গালে হাত রেখে বলল,—'ও বাবা! এ তো বিষ নেই সাপের কুলোপানা চক্কর। কিন্তু ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কার মুখে হাতচাপা দিতে পারবে? ওই ডেরাইভারটা যে তোমার রসের নাগর সে কথা পাড়ায়-ঘরে কারো জানতে বাকি আছে?'

ভুবনপিসী হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

গাড়ির কাছে চামেলীকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রঘুনন্দন শুধোল,—'এখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছ?'

—'আপনার সঙ্গে কথা ছিল।' চামেলী মৃদুস্বরে জানাল।

রঘুনন্দন বলল,—'তুমি নাকি ছুট্টি নিয়ে দেশে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, আমার বাপের বাড়িতে। দিন পনের সেখানে ছিলাম।' চামেলী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—'আজ ডিউটিতে এসেছ?' রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করল।

—'না।' চামেলী মাথা নাড়ল।

—'কিঁউ?' রঘুনন্দন তার মুখের দিকে তাকাল। মুচকি হেসে বলল,—'ঘরে বসে থাকলে পার্টি তোমাকে পয়সা দিয়ে যাবে?'

চামেলী চুপ করে করে শুনল। কোনো জবাব দিল না।

রঘুনন্দন ফের জিজ্ঞাসা করল,—'হাঁ, কী বাত আছে বলছিলে?'

—'সেনগুপ্ত সাহেবকে বলে আমাকে এখানে একটা ঘর দিতে পারেবেন?' চামেলী জবাবের আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'ঘর ? মানে কোয়ার্টার ? তুমি এখানে থাকবে ?' রঘুনন্দন ভ্রূ কোঁচকাল। ঈষৎ চিন্তা করে ফের বলল,—'লেকিন সাহেব তো জিজ্ঞাসা করবেন, নিজের ঘর আছে, তবু তুমি কেনো এখানে থাকতে চাইছ ?'

রঘুনন্দনের কাছে এসে এমন একটা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে চামেলী তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে নি। একটু ভেবে কিছুক্ষণ পরে সে বলল,—'যদি সেখানে থাকতে কোনো অসুবিধে হয়।'

রঘুনন্দন হেসে জিজ্ঞাসা করল,—'হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি ?'

—'না।' চামেলী গম্ভীরমুখে জবাব দিল।

—'সেনগুপ্ত সাহেবকে হামি বলে দেখতে পারি।' রঘুনন্দন হাল্কাভাবে কথা কইল।

চামেলী হঠাৎ দৃঢ়গলায় বলল,—'ঘর একটা আমার চাই। নইলে এই আয়ার কাজটা ছেড়ে দিতে হবে।'

—'কাজ ছেড়ে দেবে ? কী পাগলের মতো বলছ তুমি ?' রঘুনন্দন বোধহয় এতক্ষণে তার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করল।

চামেলী হতাশ ভঙ্গি করে উত্তর দিল,—'এছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

রঘুনন্দন তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'ঠিক আছে। সেনগুপ্ত সাহেবকে হামি বুঝিয়ে বলছি। ঘর তো খালি আছে। উনি হুকুম করলেই তুমি এখানে থাকতে পারবে।'

চামেলী অনুনয় করল,—'আপনি একটু চেষ্টা করুন। নইলে ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে আমার যে কী দশা হবে তা নিজেও জানি না।' কথা শেষ হতেই চামেলীর চোখ জলে ভরে উঠল।

—'রোনা মৎ।' রঘুনন্দন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—'ঘর তুমি পেয়ে যাবে। লেকিন হামি ভাবছি, এই নিয়ে তোমার হাজব্যাণ্ড আবার হুজ্জুত করবে না তো ?'

চামেলী মুখখানা শক্ত করে বলল,—'হাঙ্গামা-হুজ্জুত করলেও আমি সেখানে ফিরে যাব না।'

এতক্ষণ হয়তো রঘুনন্দনের নজরে পড়েনি। চামেলীর ঠোঁটের কাছে কাটা দাগ, কপালের একপাশে রক্ত জমে থাকা খানিকটা জায়গা একটা ছোট কুলবিচির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে ফের দ্রুত নজর বুলিয়ে রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করল,—'কী হয়েছে চামেলী ?'

—'আপনাকে সব কথা বলব। একটুও গোপন করব না।' চামেলী প্রায়

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তাকাল। ফের মিনতি করে বলল,—'ডাক্তার সাহেবের হুকুম নিয়ে কাল সকালেই আমাকে ঘরটা করে দিন। জিনিসপত্র গুছিয়ে মেয়ে দুটোর সঙ্গে দুপুরবেলা এখানে চলে আসি।'

—'তুমি এখানে দাঁড়াও।' রঘুনন্দন ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'সেনগুপ্ত সাহেব এখন চেম্বারে একা আছেন। আজ মেজাজ বহত খুশ। হেসে হেসে টেলিফোনে কার সঙ্গে মিঠা মিঠা বাত বলছিলেন। হামি চট করে তাকে কথাটা বলে আসি।'

চামেলী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে আয়া, নার্স, এমন কী ডাক্তাররাও অনেকে তাকে চেনে। সেনগুপ্ত সাহেবের গাড়ির কাছে এমনি কাঠপুতলির মতো অপেক্ষা করা রীতিমত অস্বস্তিকর। হঠাৎ দেখলে কে কী মনে করবে?

তবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় নি। রঘুনন্দন ফিরে এলো মিনিট দশ বাদে। এসেই সহর্ষে বলে উঠল,—'আগে কী খাওয়াবে বাতাও।'

চামেলী বুঝতে পারল তার সমস্যা মিটেছে। ফিক করে হেসে উত্তর দিল, —'আপনাকে পেট ভরে মিষ্টি খাইয়ে দেব। কিন্তু আগে বলুন সেনগুপ্ত সাহেব কী হুকুম করলেন?'

আর কোনো ভনিতা না করেই রঘুনন্দন জবাব দিল,—'তোমাকে একটা ঘর দিতে বলেছেন।'

—'উনি কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন? নিজের ঘর আছে, তবু কেন এখানে থাকতে চায়?'

—'না।' রঘুনন্দন মাথা নাড়ল। 'বরং ডাগদার-সাব বলছিলেন নার্স কা মাফিক কুছু আয়া যদি নার্সিং হোমে থাকে তাহলে কাজের সুবিধে। তারপর রাত্তির দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি দিয়ে বাড়ি ফিরতে কোতো তকলিফ আছে।'

চামেলী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলল,—'যাক, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এখানে একটা আশ্রয় না পেলে আমার ভাগ্যে যে কী হ'ত সে একমাত্র আমি জানি।'

রঘুনন্দনের তাড়া ছিল। গাড়ির জন্য তেল নিতে পাম্পে ছুটতে হবে। আর আধঘণ্টা পরে সেনগুপ্ত সাহেবে বেরোবেন। পথের মধ্যে পেট্রল পাম্পে ঢুকে তেল নিতে গেলে অযথা দেরি। ডাক্তার সেটা আদৌ পছন্দ করেন না।

চামেলী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল,—'আপনি যে কী উপকার করলেন, তা বোঝাতে পারব না।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবার আগে রঘুনন্দন পরিহাস করল,—'কাল দুপুরে মিঠাইয়ের বাক্স নিয়ে আসবে। নইলে ঘরের দরজায় হামি তালা লাগিয়ে দেব।'

শুনে চামেলী শুধু হাসল। কোনো জবাব দিল না।

বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে চামেলী বিছানায় শুয়ে রইল। কাজের মেয়েটিকে ডেকে বলল,—'তার গায়ে ব্যথা। অল্প জ্বর আছে। রাত্তিরে কিছু খাবে না।'

মেয়েটি তবু বলল,—'দুখানা রুটি গড়ে দিই? সমস্ত রাতটা উপোস করে থাকবেন?'

চামেলী মাথা নাড়ল। বলল,—'থাকি না একটা রাত্তির না খেয়ে। শরীরের গলদ বরং অনেক কেটে যাবে।'

নগেন বাড়ি ফিরল সন্ধ্যের প্রায় এক ঘণ্টা পরে। আজকাল এমনি দেরি করে ফেরে। কাজের মেয়েটি তাকে বলছিল প্রেসে নাকি এখন ওভারটাইম চলছে। নগেনও বোধহয় বাড়তি সময় খাটে। ওভারটাইম করলে প্রায় দ্বিগুণ পয়সা আসে। কিন্তু শরীরে অমন একটা শক্ত ব্যামো, তাও ভালো করে সারে নি। ওষুধপত্র কী খাচ্ছে, সেই জানে। দুদিন পরে ফের যদি কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে, তাহলে প্রেসের মালিক অসুখের দোহাই দিয়ে চাকরি থেকে ছাঁটাই করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

গত রাত্তিরের সেই ঘটনার পর নগেন তার সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। অমন বেধড়ক মার খেয়ে চামেলী প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামীর সঙ্গে কখনও যেচে কথা বলবে না। নগেন বাড়ি ফিরে অসুস্থ স্ত্রীর খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। চামেলীর খুব দুঃখ হ'ল। কিন্তু উপায় কী? লোকটা যখন এমনি তখন মুখ বুজে তাকে এই অপমান সহ্য করতে হবে।

অনেক রাত্তির পর্যন্ত চামেলীর চোখে ঘুম আসে নি। কাল দুপুরবেলা জিনিস পত্র গুছিয়ে মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে চামেলী নার্সিং হোমে গিয়ে উঠবে। নগেন সে কথা জানে না। বাড়ি ফিরে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত চামেলী যে ঘর ছেড়ে মেয়ে দুটোর হাত ধরে অন্যত্র উঠতে পারে এ ধারণা বোধহয় সে কোনোদিন করেনি।

রাত দুপুরে কখন এক চটকা নিদ্রা এসেছিল। হঠাৎ একটা বিশ্রী কাশির শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। চামেলী কান পেতে শুনল কাশির শব্দটা নগেনের ঘর থেকে আসছে। সেই ঘঙঘঙে কাশি। তার বুকের ভিতরটা

হঠাৎ ভয়ে হিম হয়ে এলো। অসুখটা প্রায় সেরে এসেছিল। কটা মাস নিয়মে থাকলে আর সেই বড়ো ডাক্তারের ওষুধপত্রগুলো খেলে রোগ দিব্যি সেরে যেত। কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে না? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। নগেনের কপালে তাই লেখা। পরের কথা শুনে বউকে এমনি অবিশ্বাস? এবার হাতেনাতে ফল পাবে।

পরদিন বেলা দুটো নাগাদ একটা রিকশ ডেকে চামেলী বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে জিনিসপত্র বেশী নেয় নি। একটা সুটকেস, দুটো থলি আর সামান্য বিছানা। পাড়াটা এই সময় চুপচাপ, ঠাণ্ডা থাকে। বাড়িতে খেয়ে দেয়ে মেয়েরা একটু গড়িয়ে নেয়। কিম্বা সকলে মিলে এক ঠাই বসে মজলিশ করে। তাছাড়া চামেলী কোথায় যাচ্ছে তাই নিয়ে কার এত মাথাব্যথা আছে? কেউ দেখলে নিশ্চয় ভাববে সোয়ামীর ওপর রাগ করে চামেলী সেই হাওড়ার কাছে ঝিকড়দাতে তার বাপের বাড়ি চলেছে। আর দেখা হ'লে ভুবনপিসী কিম্বা জগমাসী বলত,—'মেয়েমানুষের অত দপদপানি ভালো নয়, বুঝলে বাছা? সোয়ামী যেমন বলে তেমনি চললেই পার। তাতেই সংসারে শান্তি বজায় থাকে।'

শুধু ঘর নয়, রঘুনন্দন তার জন্যে নার্সিং হোমের দুখানা খাট, গদীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। দেখা হতে হেসে বলল,—'কই, মিষ্টির বাক্স কোথায়? তোমার জন্যে সব রেডি করলাম, আর হামার পাত্তনাটার কথা ভুলে গেলে?'

চামেলী জিভ কেটে বলল,—'সত্যি, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

শুনে রঘুনন্দন হো-হো করে হেসে উঠল। চোখ টিপে রহস্য করে বলল,—'হামার কথা সাচ্ ভাবলে নাকি? হামি তো স্রেফ জোক করেছি।'

লোকটা সত্যি ভালো। এগিয়ে এসে তার ছোট মেয়েটাকে আদর করল। বড়ো মেয়েটার গাল টিপে বলল,—'এ ভি মায়ের মতো সুন্দর হয়েছে।'

চামেলী বলল,—'আজ সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে আমার জন্যে একটা তোলা উনুন কিনে আনবেন?'

'কিনবে কেনো?' রঘুনন্দন পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল, 'হামার ঘরে একঠো ফালতু পড়ে আছে। এখন সেটা এনে দিচ্ছি।'

ঘরটা ভালো। একতলা, কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই। উঁচু বারান্দার পাশে ঘর। দোতলায় নার্স দিদিমণিরা থাকে। দক্ষিণে বড়ো জানালা। নিচের তলার অন্য ঘরগুলোয় নার্সিং হোমের নানা সরঞ্জাম থাকে। কেবল একেবারে প্রান্তের একটা ঘরে একজন ড্রেসার আর তার স্ত্রী রয়েছে।

রঘুনন্দন থাকে পিছনের দিকের একটা ছোট ব্লকে। দোতলার এককোণে ঘর। নিরিবিলি, আশেপাশের কামরা খালি পড়ে আছে। প্রায় লোক থাকে

না। এখানকার স্টাফ ওগুলোকে ভি. আই. পি. রুম বলে। পাশাপাশি তিন খানা ঘর। ভারী চমৎকার সাজানো গোছানো। খুব মান্যগণ্য কিম্বা যথেষ্ট ধনবান কোনো রোগী হঠাৎ নার্সিং হোমে ভর্তি হ'লে ওই ঘরে তাকে রাখা হয়। দরজার সামনে সর্বদা নার্স বসে থাকে। তাছাড়া একজন ডাক্তার দিবা-রাত্রি রোগীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। ভি. আই. পি. রুমগুলি আরো একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। শেষের ঘরটাকে প্রয়োজন হ'লে অপারেশান থিয়েটার হিসেবে সাজানো যায়। তখন আর অন্য কোনো পেশেণ্টকে রাখা হয় না। এখানে কী ঘটছে কাকপক্ষীতে টের পাবে না। চামেলীর মনে আছে কিছুদিন আগে রঘুনন্দন হঠাৎ তাকে বলল,—'জানো, ভি. আই. পি. রুমে ভারী খুবসুরত একটা 'চিডিয়া' এসেছে।'

—'চিডিয়া ?'

—'হাঁ। চিড়িয়া ছাড়া কী ? তোমরা মেয়েরা তো সব পনছির জাত। খালি উড়ে বেড়াচ্ছ, সহজে ধরা যায় না।'

চামেলী মুচকি হেসে বলল,—'তাহলে আপনারা পুরুষরা হলেন শিকারী, তাই না ?'

রঘুনন্দন শুনে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,—হাঁ, মেয়েটা তো শিকার হয়ে গেছে।'

—'শিকার ?' কী ঘটেছে চামেলী যেন আঁচ করতে পারল।

রঘুনন্দন বলল,—'খানদানী ঘরকা লেডকী। সেনগুপ্ত সাহেবের বহত জান-পহচান ফেমিলি। ভুল সে ফাঁস গয়া। কাল মর্নিং মে উসকা অপারেশান হোগা। মামুলি কাম,—দো-চার রোজ বাদে ফিন ঘর চলা যায়েগা।'

মেয়েটিকে চামেলী দেখে এসেছিল। কুড়ি-একুশের বেশী বয়স নয়। কিন্তু কী রূপ! আয়ত কালো চোখ, পানের পাতার মতো সুডৌল মুখখানি। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশদাম। ঘরের ভিতর একটা চেয়ারে সে বিষণ্ণ, উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিল। এরকম কেস নার্সিং-হোমে আরো এসেছে। এমনিতে কোনো অসুবিধে নেই। শুধু লোকলজ্জা বলে একটা বস্তু আছে। ভি. আই. পি. রুমে থাকলে যথেষ্ট গোপনীয়তা বজায় থাকে। খুব সিনিয়র ডাক্তার আর নার্স ভিন্ন সেখানে কাউকে ডিউটি দেওয়া হয় না। তবু কখনও পার্টির ইচ্ছায় আরো একটু সাবধানতা নেওয়া হয়েছে। কেউ বা বেমালুম আত্ম-পরিচয় চেপে যায়। ভর্তির সময় উল্টোপাল্টা নাম লিখিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

সন্ধ্যে থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশটা মেঘলা। অসময়ের

বৃষ্টি। জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগে এখন দু-একবার জল হবে। হয়তো কাল সকালে রোদ উঠলে ঠাণ্ডা বাড়বে। ঘড়িতে নটা বাজল। মেয়ে দুটো অগাধ ঘুমে। রাত্তিরের খাওয়া আটটা বাজতেই চামেলী চুকিয়ে দিয়েছে। কাল থেকে কাজে বেরোতে হবে। এখন কটা দিন নাইট ডিউটি নেওয়া যাবে না। মেট্রন দিদিকে বলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। তবে বেশীদিন নয়। দিন পনের গেলেই মেয়ে দুটো এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে। তখন নাইট-ডিউটি নিতে অসুবিধে নেই। তাছাড়া দিনের চেয়ে রাত্তিরের কাজে পয়সা বেশী। আর চামেলীর যখন টাকার প্রয়োজন। বলতে গেলে দুটো মেয়ের সব দায়িত্ব সে এখন ঘাড়ে করে নিয়েছে। কিন্তু অন্য একটা চিন্তা সন্ধ্যে থেকেই তার মাথায় কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে। নগেন কী চুপ করে ব্যাপারটা মেনে নেবে? বাড়ি ফিরে চামেলী আর মেয়ে দুটোকে না দেখে এতক্ষণ বোধহয় তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছে। যা গোঁয়ার-গোবিন্দ একরোখা মানুষ। শেষ পর্যন্ত কী যে কেলেঙ্কারী করে বসবে সেই চিন্তায় চামেলী অস্থির হয়ে আছে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বারান্দা থেকে নিচে নামল। হ্যাঁ, পিছনের দিকের ছোট ব্লকটার কোণের ঘরে আলো জলছে। রঘুনন্দন তাহলে জেগে আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চামেলী মাথার ওপর কাপড়টা টেনে দ্রুতপায়ে দোতলায় এসে উঠল। ভি. আই. পি রুম সব খালি, রুগী নেই। চামেলী একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। এমনি রাত্তিরবেলা রঘুনন্দনের ঘরের দিকে গেলে ডিউটিতে থাকা নার্স দিদিমণি নিশ্চয় ভ্রূ কুঁচকে তাকাত।

তাকে দেখে রঘুনন্দন উষ্ণ অভ্যর্থনা করল,—'আরে, এস এস। খেয়ে দেয়ে বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে?'

চামেলী মাথা হেলিয়ে ঈষৎ হাসল।

রঘুনন্দন তাকে ঘরের ভিতর একটা চেয়ারে বসতে দিল। নিজে বিছানার ওপর উঠে দেয়ালে পিঠ রেখে জিজ্ঞাসা করল,—'আব কেয়া খবর বাতাও।'

চামেলী কী বলবে বোধহয় মুখ নিচু করে তাই ভাবছিল।

—'আরে তোমার হয়েছে কী?' রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করল, 'খামোশ কিঁউ?'

চামেলী এবার মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

—'হাঁ-হাঁ। কী কথা আছে বোলো।' রঘুনন্দন জিজ্ঞাসু হ'ল।

—আপনি তখন জানতে চেয়েছিলেন নিজের ঘর আছে তবু কেন আমি এখানে থাকতে এসেছি?'

—'হামি কেনো?' রঘুনন্দন হেসে বলল,—'ই বাত তো সকলে পুছবে।'

চামেলী চুপ। কথাটা সে কোনখানে শুরু করবে তাই যেন ভেবে পাচ্ছিল না।

রঘুনন্দন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার মরদ কেমন আছে ?'

—'সে আবার চাকরি নিয়েছে।' চামেলী জবাব দিল।

—'চাকরি মানে কাম করছে ?' রঘুনন্দনকে বেশ অবাক দেখাল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,—'লেকিন উসকা তবিয়ত তো খারাপ হুয়, আচ্ছা নেহি হুয়া।'

—'কিন্তু তার বিশ্বাস সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে।' চামেলী কেমন ভারী গলায় কথা কইল। 'তাই প্রেসে কাজে যাচ্ছে, ওভারটাইম করছে। কিন্তু আমি জানি ও এখনও ভালো হয় নি। কাল রাত্তিরে সেই বিশ্রী ঘঙঘঙে কাশিটা ফের হচ্ছিল।'

—'আরি বাস!' রঘুনন্দন চমকে উঠে বলল,—'তার মানে রোগ আবার বেড়ে যাবে। ফের অ্যাটাক করলে টিউবারকুলোসিস ঠিক ওকে খতম করে ছাড়বে।'

—'শুধু ওকে নয়। ওর সঙ্গে থাকলে রোগ আমাকেও শেষ করবে।' চামেলী যেন ভবিষ্যদ্বাণী করল।

রঘুনন্দন বলল,—'একবার গিয়ে তোমার হাজব্যাণ্ডকে কথাটা বুঝিয়ে আসব ?'

চামেলী কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'এখন ওকে কিছু বোঝাতে গেলে ও তার উল্টো মানে করবে। কারণ ওর ধারণা যে অসুখ কবে ভালো হয়ে গেছে। এতদিন আপনি আর আমি দুজনে মিলে ওকে মিথ্যে রুগী বানিয়ে রেখেছি।'

—'তাজ্জব বাত।' রঘুনন্দন অস্বীকার করে বলল,—'হাম লোগ রুগী বানাব কেনো? স্পেশ্যালিস্ট ডাগদার-সাব নিজে বলেছেন।'

চামেলী বলল,—'শেয়ালদার কাছে কোন এক ডাক্তারের কাছে ও দেখিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, রোগ নাকি পনের আনা সেরে গেছে। যেটুকু বাকি আছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

রঘুনন্দন কোনো জবাব দিল না। সে চুপ করে শুনছিল।

চামেলী ফের বলল,—'ওর সঙ্গে থাকতে হ'লে আমাকে এই কাজ ছেড়ে দিতে হবে। কারণ ওর মত হ'ল স্বামী যখন আবার কাজ করতে বেরুচ্ছে, তখন ঘরের বউকে বাইরে যেতে হবে কেন ?'

—'কিন্তু তুমি তো চার-পাঁচ'শ টাকা কামাই করছিলে।' রঘুনন্দন বলল।

—'টাকাতে ওর প্রয়োজন নেই।' চামেলী তার স্বামীর কথার পুনরাবৃত্তি করল। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'আসলে ওর মনে একটা সন্দেহ ঢুকেছে।'

—'সন্দেহ ?'

'হ্যাঁ।' চামেলী চাপাগলায় কথা কইল। 'ওর ধারণা আপনার সঙ্গে একটা অন্য কিছু সম্পর্ক আছে, নইলে আমার জন্যে আপনিই বা এতো করবেন কেন ?'

রঘুনন্দন মৃদুগলায় শুধোল,—'তোমার স্বামী এই কথা বলেছে ?'

—'শুধু আমার স্বামী নয়। পাড়াসুদ্ধ লোক নাকি তাই বলে। ফি মাসে একবার আপনি ওকে বড়ো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বিনা পয়সায় ওষুধপত্র এনে দিয়েছেন। এক্স-রে করতেও খরচপত্র লাগেনি। তারপর গাড়ি করে আমাকে এদিকে-সেদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন। কেউ কেউ তা নিজের চোখে দেখেছে।'

রঘুনন্দন কোনো জবাব দিল না। স্থিরদৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছিল।

চামেলী বলল,—'মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখানে চলে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তার কারণ এই কাজটা এখন ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছ ড়া ছাড়ব কিসের ভরসায় বলুন ? নিজে যখন জানি, ওর অসুখ ভালো হয় নি। দুদিন বাদেই আবার বাড়াবাড়ি শুরু হতে পারে। তখন এই অপোগণ্ড মেয়ে দুটোকে নিয়ে তো আমাকে পথে বসতে হবে।'

চামেলীকে বেশ উত্তেজিত দেখাল। সে শুধু একটা ঢোক গিলল, কিন্তু থামল না। জিভটাকে সচল করে নিয়ে ফের শুরু করল,—'তাছাড়া ও চায় আমরা সেই আগের মতো থাকি। এতদিন মেয়ে দুটোকে নিয়ে অন্য ঘরে আলাদা বিছানায় শুয়েছি। এখন সেটা ওর পছন্দ নয়। তার শেষ কী হবে বুঝতে পারছেন ? ওই রোগ আমার শরীরেও বাসা বাঁধবে। একটু একটু করে আমাকেও মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। তখন আমার চিকিৎসা হবে ? ওষুধপত্র জুটবে ? বলুন, মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে ওঠা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল ?'

চামেলী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল,—'লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু মানুষটা গোঁয়ার, নির্বোধ। তারপর ওই সন্দেহটা মনের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসেছে। আমার কাজটা ছাড়তে পারব না বলতেই একদিন আমাকে অজস্র কিল, চড়, ঘুঁষি মারল। অত্যাচারের ভয়ে বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতে কাটিয়ে এলাম। তারপর ফিরে আসতেই সেই কথা কাটাকাটি। রেগে

গিয়ে রাত দুপুরে আমার গলাটা টিপে ধরল। নেহাৎ রোগে খানিকটা কাবু, শরীরে তেমন বল নেই। নইলে বোধহয় ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারতাম না। নিশ্চয় টুঁটি টিপে আমাকে মেরে ফেলত।'

চামেলী কাঁদছিল। টপ টপ করে চোখের জল তার গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। রঘুনন্দন বিছানা ছেড়ে কাছে এসে বলল,—'এতক্ষণ তুমি বাত বলছিলে আর হামি শুনছিলাম চামেলী। এখন হামি কুছু বলি, তুমি শুনবে।'

চামেলী মুখ তুলে তাকাল।

রঘুনন্দন বলল,—'তোমার দুখ দেখলে হামার মনে কষ্ট হয় চামেলী। জানো পহেলা দিন তোমাকে দেখেই কেমন ভালো লেগে গেল। মালুম হ'ল কী ভারী চমৎকার লেড়কী। তাই তোমার মরদকে বড়া ডাগদার-সাবের কাছে নিয়ে গেলাম তোমাকে খুশি করব বলে। বহুৎ কৌশিশ্ করে দাওয়াই জোগাড় করে দিয়েছি। সেনগুপ্ত সাবকে বলিয়ে ফ্রি-তে এক্স-রে করিয়ে এনেছি। লেকিন একঠো বাত মেরে মনমে থি, কভি উও নেহি বোলা হ্যয়।' রঘুনন্দন এক মুহূর্ত থামল। ফের গাঢস্বরে বলল,—'তুমাকে হামি পেয়ার করি চামেলী।'

আলনা থেকে একটা রুমাল টেনে নিয়ে রঘুনন্দন তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল,—'রোনা মৎ। সব ঠিক হো যায়েগা। আর তুমি তো কুছু অন্যায় করনি। ওখানে থাকলে তুমার ভি. টি. বি. হ'ত।'

আশ্চর্য! এমন একটা সান্ত্বনার ভাষা শুনে চামেলী ফের কেঁদে উঠল। এতকাল মনের মধ্যে যে ইচ্ছেটা এক'শবার হয়েছে আজ হঠাৎ তাই সে বাস্তবে করে বসল। রঘুনন্দনের প্রশস্ত বুকে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি গুঁজে দিয়ে এই প্রথম যেন একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পেতে চাইল।

রঘুনন্দন দু-হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিল। নারী-পুরুষের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মুহূর্তে কোথায় যেন একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। এতদিন মনের কোণে যে রুদ্ধ বাসনা অবদমিত ছিল,—জলে ভেসে ওঠা পানকৌড়ির মতো চকিতে দেখা দিত, ফের ডুব দিয়ে মুখ লুকোত,—এই মুহূর্তে তা যেন পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের বিশাল জলোচ্ছ্বাস নিয়ে এক নদীর দুই কূল প্লাবিত করে দেহের প্রতিটি রক্তকণিকায়, রোমকূপে সাড়া জাগাল। রঘুনন্দন বুঝতে পারছিল ধীরে ধীরে তার দেহে কী যেন একটা উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কর্ণমূলে, রগের পাশে হঠাৎ যেন অনল জ্বালা অনুভব করল। চামেলীর উষ্ণ নরম দেহ বেপথুমতী, তার শরীরের সঙ্গে যেন সেঁটে রয়েছে। রঘুনন্দন হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চামেলীকে দুই বাহুর সাহায্যে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বিছানার শুইয়ে দিল। দ্রুত পায়ে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে ফিরে এসে

দেখল চামেলীর চোখ বোজা, ঠোঁট দুটি মৃদুমন্দ মলয়ানিলে নতুন গজিয়ে ওঠা কিশলয়ের মতো তিরতির করে কাঁপছে। রঘুনন্দন ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে তার অধরোষ্ঠ স্পর্শ করল। মুহূর্তে সমস্ত দেহে যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটে গেল।

আর চামেলী? তার মনে হ'ল হঠাৎ এক যাদুমন্ত্রে সে যেন এক ময়ূরপংখী পানসীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর রঘুনন্দন তার হাল ধরে চামেলীকে এক সুখের সাগরের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে যে পানসীখানা ভিড়াবে তা সে জানে না। অথচ এই মানুষটাকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন শক্তি কণামাত্র তার দেহে অবশিষ্ট নেই।

খালধারে আজ জমজমাট আসর। ঢোল নিয়ে বনমালী বসেছে। অন্যদিনের মতো গান শুরু হবার কথা। কিন্তু ফকির দাস এসে পৌঁছতেই সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

ফকির দাসের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কাঁচা-পাকা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডান চোখটায় সামান্য ছানি পড়েছে বলে নজর কম হয়। বাঁ চোখটায় দেখতে পায়। একজন কণ্ট্রাক্টরের কাছে এখন চাকরি করে ফকির দাস। পরিশ্রমের কাজ করবার আর ক্ষমতা নেই। ইঁট, বালি, সিমেণ্ট আরো মালের হিসেব রাখে। কামিন-মজুর খাটায়। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এদিক থেকে ওদিক তদারকি করে বেড়ায়।

লণ্ঠন হাতে ফকির দাস এসে ঢুকল। কীর্তন গানের এই ঘরটায় ইলেকট্রিক আলো নেই। হ্যারিকেন জ্বলে। যারা গান করে, তারা কোনো অসুবিধে মনে করে না। বনমালী ঢোলে চাঁটি দেয়, মূল গায়েন সুর করে গান ধরে। বাকিরা সেই পদটি ফের সমস্বরে গায়।

ফকির দাসকে দেখে বনমালী ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়াল। অভ্যর্থনা করে বলল,—'আরে এস, এস ফকিরদা। কতদিন পরে এবার এলে বল দিকি?'

—'কী করব ভাই?' ফকির দাস তার অক্ষমতার কারণ শোনায়। বলে,—'সমস্ত দিন ওই কণ্ট্রাক্টর বাবুর মালের হিসেব রাখতেই হিমসিম। তারপর কামিন-মজুরের পিছনে ছুটোছুটি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে আর বেরোবার ক্ষ্যামতা হয় না।'

ফকির দাস এলেই কীর্তন গাওয়া মুলতুবী থাকে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের পুরানো কলকাতার গল্প শুরু হয়। এই বসন্তবিলাস রোডের এখন সেই সব চেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা। অতীত দিনের অনেক ঘটনার সাক্ষী।

বনমালী বলে,—'একটা পুরানো দিনের গান শোনাও দিকি। তুমি তো

কত কী জান।'

ফকির দাস হাসে। বলে,—'এখন আর গান গাইবার বয়স আছে? ভাঙা গলায় কী সুর আসে বনমালী?'

নীলাম্বর এই আসরের মূল গায়েন। গলাটি মিষ্টি। কীর্তনের প্রথম পদটি সেই ধরে। নীলাম্বর অনুরোধ করে,—'সুর নাই এলো, তুমি না হয় মুখেই গানটা একবার শোনালে।'

ফকির দাস রাজি হয়। বলে,—'একটা গান বেশ মনে আছে। গানের কথাগুলো তখন খুব ভালো লেগেছিল। আর এখন বুড়োবয়সে মনে হয় গানটা কত সত্যি।'

—'কী গান ফকিরদা?' বনমালী শোনার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

ফকির দাস গুনগুন সুরে গায়—

যৌবন কোকিল পাখি
দেহ বৃক্ষ শাখে
বসন্ত চলিয়া গেলে
আর নাহি ডাকে।

—'বা-বা! বড়ো চমৎকার পদটি।' নীলাম্বর তারিফ করে।

ফকির দাস নিজেই আবার বলে,—'সেকালের টপ্পা গান শুনেছ তোমরা?'

—'টপ্পা?' বনমালী তাকায়।

—'হ্যাঁ, নিধুবাবুর টপ্পা।' খালধারের এই স্বল্পালোকিত ঘরে বসে ফকির দাস চিৎপুরের এক আলোকজ্জ্বল গানের আসরের কথা স্মরণ করে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ পরে বলে,—'একবার একটা আসরে নিধুবাবুর টপ্পা শুনেছিলাম, বুঝলে? আহা! কী গানের ভাষা—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বিনে আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড়ো ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।'

বনমালী শুনে ঢোলে একটা চাঁটি মারে। মনের আনন্দ প্রকাশ করে বলে,—বলিহারি!

ফকির দাস স্মৃতি চারণার ঢঙে কথা কয়। বলে,—'এই যে খালটা দেখছ, ত্যাখন এই খাল দিয়ে বড়ো বড়ো নৌকো আসত। যশোরের নৌকো থেকে জিওল মাছ বিক্রি হ'ত এক বালতি দু-আনা তিন আনা দরে। আর ওই যে খালের ওপারে আট-দশ তলা উঁচু উঁচু বাড়িতে এখন সেলস্ ট্যাক্সের অফিস

হচ্ছে, আগে ওখানে ভিজিয়ানাগ্রামের রাজার প্রাসাদ ছিল। তারও অনেক আগে ওই জায়গাটা ছিল কালীপ্রসাদ দত্তের বাগানবাড়ি। সেই বাগানবাড়িতে তিনি এক মুসলমানী মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন। তার নাম ছিল বিবি আনারো। পরমাসুন্দরী মেয়ে। কালীপ্রসাদ আত্মীয় স্বজন বাড়িঘর ছেড়ে ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকতেন। তাই সেকালে হিন্দুরা তাকে একঘরে করেছিল।'

একটু রাত হ'লে ফকির দাস আড্ডা ছেড়ে ওঠে। বনমালী আর নীলাম্বরের দল রাত্তির দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কীর্তন গান করে। ফকির দাসের শরীরে এখন আর অত ধকল সয় না। সকাল হ'লেই ফের কণ্ট্রাক্টরের চাকরি। রোদে-জলে এই বয়সে শরীর আর কত অত্যাচার সইবে?



হিয়া চৌধুরীর হঠাৎ একদিন আলাপ হ'ল ভড়বাবুর সঙ্গে।

লোকটির নাম বলরাম ভড়। বয়স চল্লিশের মতো, মাঝারি গড়ন। পরনে ফুলপ্যাণ্ট আর হাওয়াই সার্ট। উড়ু-উড়ু চুল, রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে। চোখের নিচে ঈষৎ থলথলে স্ফীতি, মানুষটা যে সুরারসিক তার ইঙ্গিত বহন করে।

চাঁদনীর কাছে কী যেন একটা পৈতৃক বিজনেস আছে। কিন্তু ব্যবসার টাকার জন্যে বলরাম ভড়কে কোনোদিন হা-পিত্যেশ করে থাকতে হয় নি। ক'লকাতা শহরে তিনখানা বাড়ি, ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট, লকারে সোনা-দানা,—এর জোরেই বলরাম হাতের মুঠি চিরকাল আলগা করে রেখেছে। শক্ত করে চেপে ধরার কোনোদিন প্রয়োজন হয় নি।

চকোলেট রঙের একটা ফিয়াট গাড়ি সে নিজে ড্রাইভ করে। ড্রাইভার আছে, কিন্তু বলরাম তাকে বড়ো একটা সঙ্গে নেয় না। গাড়ির স্টীয়ারিঙে হাত না রাখলে নিজেকে তার কেমন বুড়ো মনে হয়। আর গাড়িটা এখন পোষমানা জানোয়ারের মতো। চাবি ঘুরিয়ে অ্যাকসিলেটরে একটু চাপ দিলে এগিয়ে চলে, ইচ্ছে মতো গীয়ার পাল্টিয়ে স্পীড বাড়িয়ে কিম্বা কমিয়ে নিতে পারে।

পুরুষ মানুষের দেহে বোধহয় দ্বিতীয়বার যৌবন আসে। অনেকটা

দক্ষিণ ভারতের বর্ষার মতো। প্রথমবার মহাসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু ধেয়ে এলে প্রবল বৃষ্টি। আবার সেই বায়ু যখন ফিরে যায় তখন আর একবার অল্প স্বল্প বর্ষণ। পুরুষের যৌবনও অনেকটা তেমনি। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশের দিকে যায়, তখন মৌসুমী বাতাসের প্রত্যাবর্তনের মতো সে আর একবার যৌবনের স্পর্শ অনুভব করে। শরীরের প্রবৃত্তিগুলি হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেহের স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে আসার আগে এই ধরণীর বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ আর একবার উপভোগ করতে সে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

অথচ এই বয়সে নারীর অবস্থা ঠিক বিপরীত। আগেকার দিনে বলত মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। সেকালের সঙ্গে একালের অনেক ফারাক। কুড়ি না হোক তবে বয়স যখন চল্লিশের বুড়ি ছুঁই-ছুঁই করে, মেয়েদের তখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। শরীরে একটা আলগা টান, শেকড় পচে যাওয়া মাচার লাউয়ের মতো দেহটা শুকিয়ে আসে। শীতের বাতাস লেগে ত্বক যেমন খসখসে হয়, চল্লিশের কাছে এলেই মেয়েদের মুখের চামড়া অনেকটা তেমনি দেখায়। একদা যে নয়ন হ'তে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ পুরুষকে অসহায়, সম্মোহিত করত,—এখন সেই নজর অচপল, অবোলা প্রাণীর দৃষ্টির মতো স্থির হয়ে এসেছে।

বলরাম ভড়ের সেই দশা। স্ত্রী মৃদুলা ব্লাড প্রেসারের রুগী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে রক্তচাপও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। মাঝে মাঝে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ডাক্তারের কথা মতো মৃদুলাকে স্রেফ বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। যখন প্রেসার একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করে, মৃদুলা তখন গাড়ি নিয়ে তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়ি যায়। তবে ব্যাধি একবার স্থায়ী হ'লেই তা দ্রুত মনে ছড়ায়। শরীরের রোগের সঙ্গে মনের ব্যাধিটাও পড়ন্ত বেলার দেহের ছায়ার মতো তরতর করে দীর্ঘ হতে থাকে। মৃদুলার এখন তাই হয়েছে। নিজের রোগ-অসুখ ছাড়া অন্য কোনো আলোচনা তার মুখে বড়ো একটা শোনা যায় না। অনেক দিন পরে কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'লেই এক ঝুড়ি রোগের বৃত্তান্ত বলে।

অগত্যা বলরাম ভড় একাই ঘোরে। পৈতৃক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য বাপের আমলের বিশ্বস্ত কর্মচারী আছে। বলরামের শুধু কাগজপত্র আর চেক দাখিলায় সই দিলেই চলে। দিনে দু-তিন ঘণ্টা দোকানে গিয়ে বসলেই হয়। তাও সে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। দোকানের এককোণে ছোট একটা চেম্বারের মতো করে নিয়েছে। তার কাচের দরজা, চারপাশের দেয়াল ঠিক তেল চকচকে পাকা বাঁশের রঙের প্লাই কাঠে মোড়া, মাথার ওপরের আচ্ছাদনটাও তাই।

টেবিলের ওপর সবুজ রঙের একটা টেলিফোন। পুরু ফোমের গদী মোড়া স্প্রীংয়ের চেয়ার। ইচ্ছে মতো ঘুরপাক খেয়ে এদিক-সেদিক করতে ভারী মজা লাগে।

বলরাম ভড়ের মেয়েদের প্রতি বেশ দুর্বলতা আছে। এ কথা মৃদুলাও জানে। তবে তার কিছু করবার নেই। বেচারী রক্তচাপের রুগী। মাসে দশ-পনের দিন বিছানাতে পড়ে থাকে। তখন সকাল-বিকেল বাড়িতে নার্স মোতায়েন। সুস্থ-সমর্থ হ'লে তবু স্বামীকে চোখে-চোখে রাখত। কোথায় যায় আসে, সাধ্য মতো তার খোঁজখবর নিত। প্রয়োজন মনে করলে সঙ্গে বেরুত। কিন্তু এখন ভগবানের মার, তাই ভিতরে সন্দেহ পুষে রেখে চুপ করে থাকে।

হিয়া চৌধুরীকে মাস খানেক আগে বলরাম হঠাৎ আবিষ্কার করল। ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপরে একটা সিনেমা-হলের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ঢ্যাঙা মতন ব্ল্যাকার ছোকরার কাছ থেকে টিকিট কিনছিল। এক নজরেই বলরামের ওকে ভালো লাগল। দিব্যি গড়ন, চমৎকার স্মার্ট হাঁটে। কিন্তু মেয়েটা কে ? কোথায় বাড়ি, এর কোনো সদুত্তর পাওয়া তখন সম্ভব ছিল না। তারপর আরো দু-তিন দিন একা-একা হিয়া চৌধুরীকে চৌরঙ্গীপাড়ায় সে ঘুরতে দেখল। বলরাম বুঝতে পারল, মেয়েটা নিঃসঙ্গ। এমনি একলা ঘোরে। ছবি দেখতে প্রায় এই অঞ্চলে আসে। অ্যাডভান্স টিকিট কিনে রাখে না। শো আরম্ভ হবার আধঘণ্টা কিম্বা বড়জোর এক ঘণ্টা আগে এসে ব্ল্যাকারদের কাছে থেকে টিকিট জোগাড় করে হলে ঢোকে।

হিয়া চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বলরাম ভড় এক ফন্দি বের করল। নতুন ছবি রিলিজ হতেই ধর্মতলা স্ট্রীটের এক সিনেমা হলের ম্যাটিনি শোতে দুখানা টিকিট কিনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। দুটো দিন টিকিট নষ্ট। কিন্তু তৃতীয় দিন হিয়া চৌধুরী সশরীরে উপস্থিত। বলরাম বুঝতে পারল উৎসুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেয়েটা এখন ব্ল্যাকারের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

হঠাৎ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে সে বলল,—'আমার কাছে একটা এক্সট্রা টিকিট ছিল।'

হিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। অবশ্য এমন হামেশা হয়। সঙ্গী এসে না পৌঁছলে কিম্বা আকস্মিক কোনো ব্যাঘাত ঘটলে সিনেমার টিকিট বিক্রি করে যায়। এক মুহূর্ত চিন্তা করে হিয়া পরিষ্কার শুধোল,—'কত লাগবে ?'

টিকিটের যা দাম বলরাম তাই জানাল।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে হিয়া তার দিকে এগিয়ে দিল।

ইনটারভ্যালের আলো জ্বলতেই ফের আলাপ হ'ল। বলরাম তার পাশের সীটে বসে। আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে হিয়াকে জিজ্ঞাসা করল,—'বইটা কেমন লাগছে ?'

ছবিটা দারুণ ভালো। হিয়া নিবিষ্টমনে দেখছিল। কিন্তু তাই বলে অচেনা মানুষের সামনে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'লে চলে না। একটু রেখে ঢেকে বলতে হয়। হিয়া তাই মুখ গম্ভীর করে জবাব দিল,—'খারাপ হয় নি।'

—'কী বলছেন আপনি ?' বলরাম যেন প্রতিবাদ জানাল। বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল,—'দেখবেন, ছবিটা ঠিক হিট করবে।'

হিয়া তাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ! এই লোকটা কেমন করে যেন তার মনের কথা টের পেয়ে নিজের মুখে প্রকাশ করে দিল।

অন্য একটা ছবির নাম করে বলরাম ফের জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি ওই বইটা দেখেছেন ?'

হিয়াকে এসব প্রশ্ন করবার কোনো অর্থ হয় না। প্রতিটি ছবি সে একাধিকবার দেখেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের সেটা জানবার কথা নয়। মৃদু হেসে আগের চেয়ে অনেক সহজ ভঙ্গিতে সে তাই জবাব দিল,—'হ্যাঁ, ওই ছবিটা তো বেশ ভালো।'

—'ভালো মানে হিট পিকচার।' বলরাম নিজেই ব্যাখ্যা করে বলল,—'আমি জানি শুধু ইস্টার্ন রিজিয়নেই ছবিটা প্রায় এক কোটি টাকার বিজনেস করেছে।'

এত খবর অবশ্য হিয়া রাখে না। ছবি দেখা এখন তার শুধু একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কতদিন স্রেফ সময় কাটাবার জন্য হলে ঢুকে বসে থাকে। মুখ তুলে হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি বুঝি এই লাইনেই আছেন ?'

বলরাম সেয়ানা লোক। সে জানে এসব মেয়ের সঙ্গে কেমন করে ভাব জমিয়ে নিতে হয়। যে বিষয়ে ওর ঔৎসুক্য আছে আলোচনাটা সেদিকে টেনে নিতে পারলেই কাজ হাঁসিল হতে দেরি হয় না। যেমন এই মেয়েটি সিনেমা দেখতে ভালবাসে। বলরাম তাই ইচ্ছে করেই সগু রিলিজ হওয়া একটা ছবির দুখানা টিকিট কিনে আজ হলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ফিল্মের ভালো-মন্দ নিয়ে খানিকটা আলোচনা করলে আলাপটা সহজেই দানা বাঁধবে।

মুচকি হেসে সে জবাব দিল,—'ঠিক লাইনের লোক নই। তবে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সিনেমার কাজকর্ম করে। একজন তো ডিরেক্টর,—ওদের কাছ থেকেই খবর পাই।'

হিয়া বলল,—'আপনি সব ছবি ভাখেন ?'

—'প্রায় সব।' বলরাম উত্তর দিল। ফের মুখ ঘুরিয়ে বলল,—'ভালো ছবি হ'লে দুবার কখনও তিনবারও দেখেছি।'

হিয়া ফিক করে হেসে বলল,—'আপনি তাহলে ঠিক আমার মতো।'

—'তার মানে?' ব্যাপারটা না বোঝার ভান করে বলরাম ভড় পাকা অভিনেতার ঢঙে সহজ দৃষ্টিতে তাকাল।

—'কোনো ছবি আমি বাদ দিই না।' হিয়া যেন দেমাক করল। বলল,—'বেশীর ভাগ ছবি রিলিজ হবার দিন ফার্স্ট শোতে দেখি।'

—'এটা কিন্তু তৃতীয় দিনে গড়াল।' বলরাম ঠোঁট টিপে হাসল।

—'এর আগে আসি কেমন করে?' হিয়া পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল,—'পরশু দিন আর একটা ছবি রিলিজ করেছে না? ওটা কিন্তু ফার্স্ট শোতে দেখেছি।'

ঈষৎ চিন্তা করে বলরাম ছবিটার নাম করল। ফের নিজেই বলল,—'আমার কিন্তু এখনও ওটা দেখা হয় নি।'

—'তাহলে কাল-পরশু দেখে আসুন।' হিয়া চৌধুরী এমনি আলগোছে কথাটা জানাল। ফের মন্তব্য করল,—'খুব আহামরি না হ'লেও ছবিটা দেখতে মন্দ লাগবে না।'

—'আপনার নিশ্চয় ভালো লেগেছে?' বলরাম ফের মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

—'তা বলতে পারেন।' হিয়া স্বীকার করল।

বলরামের মনে হ'ল একসঙ্গে এই ছবিটা দেখার কথা ওকে বলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল এমন একটা প্রস্তাব করা খুব অনুচিত হবে। মেয়েটির সঙ্গে এখনও ভালো করে আলাপ জমে নি। আজ একটা এক্সট্রা টিকিট ছিল বলতেই সে না হয় ওটি কিনে পাশাপাশি বসে ছবি দেখছে। কিন্তু তাই বলে আগে থেকে ঠিক করে দুজনে একসঙ্গে হলে ঢুকে ছবি দেখবে, তেমন সম্পর্ক নিশ্চয় এখনও তৈরি হয় নি। বলরাম অভিজ্ঞ, পোড়-খাওয়া ব্যক্তি। ইতিমধ্যে তার জীবনে এমন বহু নারী এসেছে। গায়ে-পড়া পুরুষকে কোনো মেয়ে আদৌ পছন্দ করে না। তারপর একবার যদি মনে সন্দেহ ঢোকে যে লোকটা আগে থেকেই তার ওপর নজরদারি রেখেছে এবং তার অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে, তাহলে পরমুহূর্তেই মেয়েটি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইবে।

বলরাম শুধু জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি একা ছবি দেখতে এসেছেন?'

—'আমি তো একাই সিনেমা দেখি।' হিয়া স্পষ্ট জবাব দিল। অনাবশ্যক হলেও ফের বলল,—'বাড়িতে বসে সময় কাটে না, তাই দুপুর হ'লে এদিকটায় চলে আসি।'

—'আপনার হাজব্যাণ্ড খুব ব্যস্ত থাকেন?'

—'ভীষণ।' হিয়া মুখ নিচু করে কথা কইল। বলল,—'তার এক ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। দিবারাত্রি তাই নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। সিনেমা দেখা দূরের কথা সংসারের প্রয়োজনে এতটুকু সময় দেবার তার অবসর নেই।'

বলরামের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। অবশ্য মেয়েটিকে প্রথম দেখলে সে রকম একটা ধারণা না হওয়ার কথা। তবে আজকাল বাইরে থেকে কতটুকু বোঝা যায়? মাঝে মাঝে ম্যাটিনি কিম্বা ইভনিং শো আরম্ভ হবার কিছু আগে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সিনেমা হলের সামনে দু-চারটি মেয়ে অমন দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বোধহয় কারো জন্য অপেক্ষা করছে। সে এলেই দুজনে হলে ঢুকে ছবি দেখবে। বেশবাস এবং চেহারার দিকে তাকালে চট করে কোনো সন্দেহ মনে রেখাপাত করবে না। এই তো কয়েক মাস আগে বলরামের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের কাছেই কোনো সিনেমা হলের সামনে একটি মেয়েকে সে দাঁডিয়ে থাকতে দেখেছিল। দিব্যি ছিমছাম সাজসজ্জা। তার সঙ্গে শুধু চোখাচোখি ছাড়া আর কোনো ব্যাপার ঘটেনি। বলরাম কাউণ্টারে টিকিট কিনতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে মৃদুগলায় কে যেন বলল,—'দুটো কাটবেন।'

একটু অবাক হয়ে মুখ ফেরাতেই মেয়েটিকে সে দেখতে পেল। বলরামের কৌতূহল বাড়ল। দেখা যাক না, জল কতদূরে গড়ায়। পকেট থেকে পার্স বের করে ড্রেস-সার্কেলের দুটো টিকিট সে কিনে ফেলল। ইতিমধ্যে ছবি শুরু হবার বেল বাজতে শুরু করেছে। বলরাম কাউণ্টার ছেড়ে গেটের দিকে অগ্রসর হতেই বুঝতে পারল ছায়ার মতো মেয়েটি তাকে অনুসরণ করছে।

দোতলায় সীট। গেটকীপারকে টিকিট দুটো দেখাতেই টর্চের আলো ফেলে কোণের দিকের নির্দিষ্ট আসনে দুজনকে বসতে বলল। মেয়েটি স্বচ্ছন্দে তার পাশের সীটে বসে পড়ল। কোনো সঙ্কোচ নেই। যেন বলরামের নিজের কেউ, বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে ছবি দেখবে বলে এই সিনেমা হলে ঢুকেছে।

ইতিমধ্যে বই শুরু হয়ে গেছে। তাদের সীটটা প্রায় পিছনের দিকে। পুরনো ছবি, ম্যাটিনিতে হাউস-ফুল হয় নি। এদিকে বেশ কিছু আসন খালি। কাছাকাছি সীটে কেউ বসে নেই।

কিছুক্ষণ পরে বলরাম জিজ্ঞাসা করল,—'আমাকে হঠাৎ টিকিট কাটতে বললে কেন?'

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল। কোনো জবাব দিল না।

বলরাম ফের শুধোল,—'তোমার বাড়ি কোথায়?'

—'টালিগঞ্জের কাছে।' সে চাপাগলায় কথা কইল। 'রাস্তার নামটা জেনে আর কী করবেন?'

—'সিনেমা শেষ হ'লে কোথায় যাবে?' বলরাম প্রশ্ন করল।

—'আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।' সে উত্তর দিল।

—'আমার তেমন কোনো জায়গা নেই।' বলরাম নেতিবাচক ভঙ্গি করল।

মেয়েটি ঈষৎ হেসে বলল,—'কাছেই জানাশুনো একটা বাড়ি আছে। ট্যাক্সিতে মিনিট দশ লাগবে। ইচ্ছে করলে সেখানে—'

—'খারাপ বাড়ি?' বলরাম ভ্রূ কোঁচকাল।

—'খারাপ বাড়িও নয় আর খারাপ পাড়াও নয়।' মেয়েটি সগর্বে জানাল। ফের চাপাগলায় বলল,—'আশেপাশে সব ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স।'

—'তাহলে?'

—'চার্জ একটু বেশী, এই যা—'মেয়েটি ফিসফিস করে বলল,—'ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা।'

বলরাম চুপ করে রইল।

মেয়েটি ফের বলল,—'তেমনি খুব সেফ্ জানবেন। কাকপক্ষীতেও ব্যাপারটা টের পাবে না।'

—'হঠাৎ কেউ যদি এসে পড়ে?' বলরাম সাবধানী হতে চাইল।

—'তার জন্যে চিন্তা নেই।' মেয়েটি তাকে আশ্বস্ত করল। বলল,—'তেমন কিছু ঘটলে অরুণাদি ঠিক আমাদের আত্মীয় বলে চালিয়ে দেবেন।'

বলরাম অস্ফুটে বলল,—'আজকাল ভদ্রলোকের বাড়িতেও এসব হয়?'

শুনে সে কেমন বাঁকা হাসল। বলরামের মনে হ'ল তার অজ্ঞতাকে মেয়েটি উপহাস করছে।

অনেকক্ষণ পরে বলরাম বলল,—'টালিগঞ্জের বাড়িতে তোমার মা-বাবা থাকেন?'

—'শুধু মা-বাবা কেন?' মেয়েটি হেসে জবাব দিল। বলল,—'আমার ছোট দুই-ভাই আর এক বোনও থাকে।'

—'ভাইরা কাজকর্ম করে?'

—'না।' মেয়েটির কণ্ঠস্বরে যেন এবার দুঃখের সুর বাজল। বলল,–'ভাইদের মধ্যে যে বড়ো অনেকদিন আগে ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করে সে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এতদিন বাড়িতেই বসে থাকত, এখন শুনতে পাই ওয়াগন ব্রেকারদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।' এক মুহূর্ত থেমে ফের স্বচ্ছন্দে মন্তব্য করল,—'এরপর কোনদিন পুলিশের গুলি খেয়ে মরবে।'

বলরাম আলতোভাবে ওর গায়ে হাত রাখল। সে কোনো আপত্তি করল না। ডান হাত বাড়িয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল, মেয়েটি বাধা দিল না।

বলরাম কানের কাছে মুখ রেখে বলল,—'সেই অরুণাদির বাড়িতে তুমি আগেও গিয়েছ?'

মেয়েটি কেমন নীরস গলায় জবাব দিল,—'আপনার সঙ্গে কী ঠাট্টা করছি?'

বলরাম ঘাড় ফিরিয়ে একবার ওর মুখের দিকে তাকাল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো। চড়া পেইন্ট এবং ঈষৎ উগ্র সাজসজ্জা করে নিজেকে একটু দামী প্রতিপন্ন করতে মিথ্যে চেষ্টা করেছে। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সব মেকী। ওর সাজসজ্জার আড়ালে একটি দুঃস্থ অভাবী মেয়ে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

বলরাম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'এই রোজগারের টাকা কোথা থেকে আসে তোমার মা-বাবা সেকথা জানতে চান না?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'জানতে না চাইলেও হয়তো কিছুটা বুঝতে পারেন। কিন্তু টাকা একবার আসতে শুরু করলে তাকে ঠেকানো বড়ো কঠিন। আসলে টাকার এতো প্রয়োজন যে সেটা কোথা থেকে আসছে আমাদের মতো সংসারে কেউ আর তাই নিয়ে এখন মাথা ঘামায় না।'

বলরাম কোনো মন্তব্য করল না। সে জানে ক্ষতটা গভীর অভ্যন্তরে। গ্যাংগ্রীণের আকারে সেখানে পচন শুরু হয়েছে। সমাজের সব স্তরের মানুষ তার শিকার, বিশেষ করে টাকার মতো একটা ধারালো অস্ত্রের কাছে জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ এখন ভোঁতা হয়ে গেছে।

পকেট থেকে পার্সটা বের করে বলরাম একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তার সামনে ধরল। সে খুব অবাক হয়ে বলল,—'এখনই টাকা দিচ্ছেন কেন?'

—'রাখো তোমার কাছে।' বলরাম চোখ টিপে কেমন রহস্য করে তাকাল। বলল,—'তোমার সেই অরুণাদিকে দিতে হবে না?'

মেয়েটিকে খুশি দেখাল। ফিক করে হেসে বলল,—'জায়গাটা খুব সেফ্, বুঝলেন?' ফের চোখ নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল,—'ছবিটা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবেন নাকি?'

বলরাম পরিহাস করে বলল,—'তোমার দেখছি তর সইছে না।'

—'হ্যাঁ, মিছিমিছি দেরি করে কী লাভ?' মেয়েটি স্পষ্ট বলল,—'এখানে তো আর ছবি দেখতে আসিনি।'

—'আমি কিন্তু পুরো বই না দেখে এক পাও নড়ছিনে। পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কেটেছি।' বলরাম ওর মুখের দিকে তাকাল।

—'তাই হবে।' মেয়েটি ঈষৎ হতাশ ভঙ্গি করল। মুখ কুঁচকে ফের বলল, —'যা বই। ছবিটা শেষ হ'লে বাঁচি।'

ইনটারভ্যাল হতেই আলো জ্বলে উঠল। বলরাম বলল,—'আমি নিচে থেকে সিগারেট খেয়ে আসি।'

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে ঈষৎ হাসল।

নিচে নেমে বলরাম একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাল না। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলেসলীর কাছে যেখানে তার গাড়িটা পেট্রল পাম্পে পার্ক করে রেখেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল। একটু পরেই ছবি শুরু হ'লে মেয়েটি নিশ্চয় উসখুস করবে। তারপর যখন তার ফেরার সময় সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত মনে হবে, তখন নিজেও হল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। টালিগঞ্জের বাসে ওঠার আগে একবার হয়তো অস্ফুটে বলবে,—'আচ্ছা মানুষ যা হোক। তাকে দিব্যি বোকা বানিয়ে চলে গেল।'

কিন্তু বলরামের এছাড়া উপায় ছিল না। নির্বোধের মতো মেয়েটার বৃত্তান্ত শুনতে গিয়ে যত ঝামেলা। ওর অসহায় জীবনের গল্প কানে যেতেই সেই আদিম রিপুটা কোথায় যে মুখ লুকিয়ে রইল, বলরাম কিছুতেই তার সন্ধান পেল না।

তবে এই মেয়েটির কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলরাম ভড় তাই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলছিল। এর মধ্যে যতটুকু আঁচ করতে পেরেছে তা হ'ল মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্কটা সুস্থ, স্বাভাবিক নয়। যে পরিবেশে থাকে, সেখানে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে। তাই দুপুর হ'লেই চৌরঙ্গী পাড়ায় চলে আসে। ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে টিকিট জোগাড় করে। সময় কাটাতে একই ছবি দুবার, কখনও তিনবারও ছাখে।

হিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার এই টিকিটটা বাড়তি হ'ল কেন? কার আসবার কথা ছিল? আপনার স্ত্রীর?'

—'না।' বলরাম মাথা নাড়ল। অম্লান বদনে জানাল,—'আমার এক বন্ধু আসবে বলেছিল।'

—'শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারলেন না?'

—'না। টেলিফোন করে বলল, আড়াইটের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে যেন টিকিটটা বেচে দিই।'

—'তাহলে তো আপনার স্ত্রীকে আসতে বললেই পারতেন।'

—'তার উপায় নেই।' বলরাম দুঃখ করল।

—'কেন?'

—'আমার স্ত্রীর হাই ব্লাড-প্রেশার। মাসের মধ্যে দশ-পনের দিন তাকে

বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। রোগে ভুগে এমন খিটখিটে হয়ে গেছে যে ছবি-টবি দেখতে তার ইচ্ছে করে না।' বলরাম এক মুহূর্ত থামল। গলার স্বর নরম করে নিজের নিঃসঙ্গতা জানিয়ে বলল,—'বেশীর ভাগ ছবি আপনার মতো একা দেখি।'

ঝপ করে হঠাৎ অন্ধকার হতেই বিজ্ঞাপনের স্লাইড ফের'পর্দায় ভেসে উঠল। দু-চার মিনিট যেতেই সিনেমা শুরু হ'ল। অগত্যা আর কথা বলা গেল না। মুখ বন্ধ করে দুজনেই পর্দার ছবির দিকে তাকাল।

হল থেকে বেরিয়ে এসে বলরাম সবিনয়ে বলল,—'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জিজ্ঞাসা করা হয় নি।'

—'আমার নাম হিয়া,—হিয়া চৌধুরী।' সে মিষ্টি হেসে তাকাল।

বলরাম আত্মপরিচয় দিল। শেষে বলল,—কাঁকুড়গাছিতে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই রয়েছে। আর চাঁদনীর কাছে পৈতৃক ব্যবসা। তা ওটা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না। বাবার আমলের ভালো ম্যানেজার আছেন। তিনি সব দেখাশুনো করেন।'

হিয়া প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'আপনার রুচি আছে। তাই ব্যবসার লেনদেনের মধ্যে নিজেকে চাপা দেন নি। সময় করে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে ভালোবাসেন।'

বলরাম স্বীকার করল,—'হপ্তায় অন্তত দুটো ছবি না দেখলে আমি কিন্তু হাঁপিয়ে উঠি। তবে আমাকে শুধু ফিল্ম-লাভার ভাববেন না। যাত্রা-থিয়েটার, ভালো ফাংশন, গানের আসর কিছুই আমার বাদ যায় না। কথা শেষ হতেই এক মুহূর্ত কী যেন সে চিন্তা করল। ফের বলল,—'একটা-ভালো নৃত্যনাট্যের ফাংশন আছে পরশু। যদি যেতে চান, তাহলে আপনাকে কার্ড দিতে পারি।'

প্রস্তাবটা ভালো। হিয়া চৌধুরীর মনে ধরল। সিনেমা তো অনেক দেখা হ'ল। মাঝে মাঝে একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। থিয়েটারে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। হলগুলো সব উত্তর ক'লকাতায়। তাছাড়া সিনেমার টিকিটের ব্ল্যাকার রয়েছে। হিয়ার সঙ্গে তাদের মুখ চেনা। থিয়েটারের টিকিট কী অমন শেষ মুহূর্তে গিয়ে জোগাড় হবে? হিয়া ঠিক ভরসা করতে পারে নি।

ঈষৎ হেসে সে জিজ্ঞাসা করল,—'নৃত্যনাট্য কোথায় হবে?'

—'রবীন্দ্র সদনে। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়।' বলেই বলরাম আর দেরি করল না। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তার সামনে ধরল।

হিয়া মুচকি হেসে বলল,—'কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি না আসতে পারি?'

—'তাতে কোনো ক্ষতি নেই।' বলরাম বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর

দিল,—'একটা সীটে পরে কাউকে বসিয়ে দেবে।'

হাত বাড়িয়ে হিয়া কার্ডটি গ্রহণ করল। সামান্য কুণ্ঠার সঙ্গে বলল,—'আপনি আসবেন তো?'

—'নিশ্চয়। হলে ঢুকে আমাকে দেখতে পাবেন।' কী ভেবে ফের বলল,—'আপনার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়েও অপেক্ষা করতে পারি।'

—'না-না। তার প্রয়োজন নেই।' হিয়া সলজ্জ হাসল।

বলরামকে খুশি দেখাল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এখন সে বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই। আর মেয়েমানুষের মন না মতি। এই আছে, কিন্তু পাল্টে যেতে কতক্ষণ?

পকেটে ফের হাত ঢুকিয়ে বলরাম সোজা হয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি থাকেন কোথায়?'

—'বেলেঘাটায়, বসন্তবিলাস রোডে।' হিয়া জবার দিল।

—'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়, আপত্তি কিসের?'

—'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' বলরাম মৃদুস্বরে বলল। 'যদি অসুবিধে না থাকে, তাহলে শেয়ালদা পর্যন্ত আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি।'

—'আপনার নিজের গাড়ি?' হিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—হ্যাঁ।' বলরাম মিষ্টি হাসল। বলল,—'নিজেই ড্রাইভ করি। কিন্তু আপনার আপত্তি থাকলে আমি জোর করব না।'

হিয়ার ঠিক আপত্তি ছিল না। বরং এখন ট্রামে-বাসে যা ভিড়। শেয়ালদা পর্যন্ত লিফট পেলে সুবিধে হ'ত। আর ওই ভদ্রলোককে হিয়ার খারাপ লাগেনি। মিষ্টি ব্যবহার, কথা বলার চমৎকার ঢঙ। কিন্তু হিয়াকে যেটি সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে সেটি ওর ব্যক্তিত্ব। অল্পক্ষণ আলাপ, কিন্তু হিয়ার বুঝতে অসুবিধে হয়নি ভদ্রলোক স্মার্ট, চটপটে এবং চৌখশ। তবু প্রথমদিন মাত্র পরিচয়। সঙ্কোচ সেখানেই। ...হুট করে ওর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসলে উনিই বা কী মনে ভাববেন? ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে হিয়া তাই বলল,—'আজ থাক।'

বলরাম আর জিদ করেনি। সে জানে আপত্তিটা শুধু আজকের। অন্যদিন বললে হিয়া চৌধুরী তার গাড়িতে উঠতে অমত করবে না। মেয়েদের স্বভাব এই। কোনো পুরুষকে গ্রহণ করবার আগে তাকে অমন দু-চারবার প্রত্যাখান জানিয়ে যাচাই করে। আসলে এটাও এক ধরনের পরীক্ষা। যে ধৈর্য রাখতে পারে, মেয়েটি পরে তাকে ফুলমার্কস দেবে বলে তৈরি হয়ে থাকে।



বাড়ির কাছে পেঁছতেই পিতুর মায়ের কেমন খটকা লাগল। এই সাতসকালে এত লোক? দোতলার সেই মাড়োয়ারী ভাড়াটেও ওপরে ব্যালকনির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা-দরজা সব খোলা। পিতুর মা যখন বাড়িতে ঢোকে তখন কর্তা হয় তো সবে বেড়িয়ে ফিরেছে। গিন্নি খাটে শুয়ে থাকে। কতদিন এমন হয় পিতুর মা সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কর্তা বেড়িয়ে ফিরলে চাবি খুলে ভিতরে ঢোকে।

কিন্তু আজ যেন সব উল্টোপাল্টা। ভোর সকালে এত লোক কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল? দোতলার ভাড়াটে বা কেন ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে? তবে কী রাত্তিরে তিনতলায় চুরি-ডাকাতি হ'ল? হয়তো খবর পেয়ে পুলিশ এখনও এসে পেঁছয়নি। নইলে বাড়ির কাছে পুলিশের জিপ কিম্বা কালো গাড়ি সে নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত।

সিঁড়ির দরজা হাট করে খোলা। কোলাপসিবল গেট দুদিকে টানা। যাতে অনেক মানুষ একসঙ্গে আসা-যাওয়া করতে পারে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে পিতুর মা এবার খানিকটা আন্দাজ করল। সব যেন কেমন চুপচাপ। কেউ বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। তারপর রিনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই আর কোনো সন্দেহ রইল না। রিনির শুকনো মুখ, চোখে জল। একটু আগেও বোধহয় কাঁদছিল, তাই চোখ ফোলা।

পিতুর মা জিজ্ঞাসা করল,—'কী হয়েছে গো রিনিদিদি?'

আর কিছু বলতে হয়নি। জবাব দেবার আগেই রিনি ফের চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভেজাগলায় কোনোরকমে বলল,—'মামীমা নেই।'

তারপর ধীরে ধীরে পিতুর মা সব শুনল। রাত্তির এগারোটা নাগাদ অমিয়াবালা হঠাৎ একবার বমি করে। দিবানাথ প্রথমে ভাবলেন হয়তো অম্বল-টম্বল হয়েছে। তাই মনে করে দু-চামচে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আধঘণ্টা না যেতেই ফের বমি। তারপর বুকের বাঁ দিকে একটা যন্ত্রণা। কিছু বলার আগেই অমিয়াবালা অজ্ঞান হয়ে গেল। অত রাত্তিরে ডাক্তার পাওয়া শক্ত। তবু দিবানাথ দোতলায় নেমে তার ভাড়াটে কিষনলালকে ডেকে তুললেন

ওরাই ছুটোছুটি করে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে একজন ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এলো। কিন্তু অমিয়াবালার তখন প্রায় শেষ অবস্থা। নাড়ির গতি ক্ষীণ, রক্তচাপ মাপবার পরই ডাক্তার প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেন। মিনিট দশ পরে একটা হেঁচকি তুলতেই অমিয়াবালার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল।

অত রাত্তিরে দিবানাথ প্রথম রিনিকে খবর দিলেন। ঘুমভাঙা চোখে আলুথালু বেশে বিছানা থেকে উঠে রিনি রিসিভারটা তুলল। শুনেই সেই অবস্থায় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ফুলবাগানে এসে পেঁছল। পিতুর মাকে বলল,—'খবরটা পেয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত কী অপেক্ষা করতে পারি? একটা মড়া নিয়ে বুড়োমানুষটা সারারাত্তির জেগে থাকবে? যা আছে কপালে বলে তাই ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

রিনি এসেই প্রথম কান্নাকাটি শুরু করে। দিবানাথ তখন পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিষণলালের বাড়ির একজন তাঁর কাছে রয়েছে। অমিয়াবালা খাটে শুয়ে। যেন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। টেলিফোন করে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রিনি খবর দিল। ভোর না হতেই তারা আগে পরে এসে পেঁছতে শুরু করল। প্রায় সকলে চলে এসেছে। শুধু সাদার্ন অ্যাভেনিউতে হিরণের শ্বশুর বাড়িতে একটা খবর দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে এখনও কেউ আসেনি।

গ্যাসের উনুনে বড়ো কেৎলিটা কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে চায়ের আয়োজনও চলছে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। জীবন আর মৃত্যু চিরকাল সহাবস্থান করে এসেছে। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে পিতুর মা দেখতে পেল একটি মেয়ে খুঁজে পেতে চায়ের কাপ, গ্লাস, দুধ, চা-চিনি সব বের করে রাখল। ওকে সে চেনে না। কিন্তু পিতুর মা যখন এসে পড়েছে, তখন চায়ের ব্যবস্থা তাকে করতে হয়। গিন্নি মারা গেছে সংবাদ পেয়ে এরা সব খোঁজখবর নিতে এসেছে। বাড়ি থেকে নিশ্চয় চা খেয়ে আসেনি। আর এই কাক-ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে চা তৈরি করতে কে যাবে? অবশ্য গত রাত্তিরে এই বাড়িতে একটা মৃত্যুর ঘটনা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এক কাপ গরম চা দিয়ে আপ্যায়ন না করলে এরাই বা কী মনে করবে?

রান্নাঘরে ঢুকে পিতুর মা তাকে বলল,—'আপনি যান। আমি এখুনি চা করে নিয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটি তাকে চেনে না। সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

পিছন থেকে রিনি বলল,—'ওর নাম পিতুর মা। সকাল-বিকেল রান্না-বান্নার সব কাজকর্ম তো ওই করে।'

ইতিমধ্যে কেৎলিতে জল গরম হয়েছে। পিতুর মা অভ্যস্ত হাতে কাপে জল মেপে একটা সস্‌প্যানে ঢালল। আড়চোখে একবার বারান্দার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল অন্তত কুড়ি কাপ চায়ের কমে হবে না। পাতা ভিজতে দিয়ে দুধের কড়াটা উনুনে বসিয়ে দিল। গরম হতেই সেই দুধ মাপ করে সস্‌প্যানে ঢেলে নিল। তারপর চিনি মিশিয়ে এতগুলি লোককে কেমন করে চা পরিবেশন করবে তাই ভাবছিল। কাপ মাত্র ছটা আর আটটা গ্লাস। একসঙ্গে সকলকে চা দেওয়া যাবে না। এক প্রস্থ শেষ হ'লে সেই কাপ-ডিশ ধুয়ে অন্যদের দিতে পারে। তবে এতে মনে করবার কিছু নেই। বাড়টা তো চায়ের দোকান নয় যে বিশ-তিরিশ জন লোককে একই সঙ্গে চা পরিবেশন করতে পারবে।

একটা ট্রে তে চায়ের কাপ আর গ্লাস সাজিয়ে পিতুর মা সকলকে পরিবেশন করল। কর্তা যে কাপটায় চা খান সেটা তার সামনে এনে রাখল। দিবানাথ এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে চাযের কাপটা সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করলেন।

বিপিন বলল,—'তুমি একটু খাও মামা, আবার কখন চা তৈরি হবে তার ঠিক আছে?'

কিন্তু দিবানাথ শুধু ঘাড় নাড়লেন। মানুষটা যেন হতবাক, স্ত্রী বিয়োগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কে একজন বলল,—'চলে গিয়ে এক হিসেবে বোধহয় ভালোই হয়েছে। ইদানীং বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে গিছলেন। তারপর ধর, তোমাকে যদি আগে যেতে হ'ত, তাহলে বৌদির কী কষ্টে দিন কাটত তা একবার চিন্তা করতে পার?'

দিবানাথ সে কথার কোনো জবাব দিলেন না।

একজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করল,—'ছেলেকে খবর পাঠান হয়েছে?'

কিষণলাল একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে বলল,—'নিউ-জার্সি আর মিশান দু-জায়গাতেই আমি কেবল করবার ব্যবস্থা করেছি।'

শবযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা রিণির স্বামী করল। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা ম্যাটাডর ভ্যান নিয়ে সে ফিরল। সঙ্গে আট-দশ জন ছেলে, তারা দাহ করবে বলে কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি হয়ে এসেছে। ভ্যানের ওপর শবযাত্রার খাট, ফুল-টুল, মালা, আনুষঙ্গিক আরো সমস্ত কিছু কিনে এনেছে। একজন আত্মীয় প্রস্তাব করেছিল, হিন্দু সংকার সমিতির গাড়িতে করে কেওড়াতলা নিয়ে যেতে। আজকাল ইলেকট্রিক চুল্লীতে দাহ করা সুবিধে। কিন্তু দিবানাথ রাজি হন নি। মাথা নেড়ে তাঁর অসম্মতি জানালেন।

স্বামীকে আড়ালে ডেকে ঝিণি বলল,—'মামার ইচ্ছে নিমতলা ঘাটে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে দাহ করে। তুমি সেই ব্যবস্থা দেখ, বুঝলে ?'

মৃতদেহ বাড়ি থেকে নিচে নামানোর আগে দিবানাথ প্রথম কথা কইলেন। আলমারি খুলে একটা বেনারসী শাড়ি বের করে ঝিণির হাতে দিয়ে বললেন. —'কাপড়টা তোর মামীকে পরিয়ে দিস।'

শাড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে ঝিণি একটু অবাক হয়ে বলল,—'এটা তো বেনারসী মামা, খুব দামী।'

-'হ্যাঁ', দিবানাথ প্রায় ধরা গলায় জবাব দিলেন। 'ওর বিয়ের শাড়ি। এখন অনেক দাম।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে ফের বললেন, 'কার জন্যে রাখব বলতে পারিস ? বর' যাবার আগে ওই শাড়ি পরিয়ে ওকে তোরা ভালো করে সাজিয়ে দে। আমি শেষবার দেখি।'

শুধু শাড়ি পরানো নয়। ঝিণি এবং আরো দু-তিন জন মেয়ে এসে অমিয়াবালাকে যত্ন করে সাজাল। চুল আঁচড়ে দিল। পায়ে টকটকে লাল আলতা পরাল। মাথায় সিঁদুর, গলায় গোড়ের মালা। ঠিক যেন সেই বিয়ের কনে। ধবধবে সাদা কাগজে আলতা-লেপা পায়ের ছাপ তুলল। ফটোগ্রাফার এসে ছবি নিল। স্ত্রীর শেষশয্যার পাশে দিবানাথ বসে সেই পোজে দু-তিনটে শট। তারপর বয়সে যারা ছোট তারা এক-এক করে এসে অমিয়াবালার পায়ের ধুলো নিল। বড়রা হাতজোড় করে মৃতাকে চিরবিদায় জানাল। পিতুর মা কাঁদতে কাঁদতে পা ছুঁয়ে গিন্নিকে প্রণাম করল।

বেলা নটা নাগাদ শব নিয়ে শেষযাত্রা শুরু হ'ল। আত্মীয়-স্বজন যারা ভোরবেলা এসেছিল, তারা অনেকে ফিরে গেল। হিরণের শ্বশুর-শাশুড়ি নিজেদের গাড়িতে করে এসেছিল। দিবানাথ আর ঝিণিকে তুলে নিয়ে তারা ভ্যানের পিছু পিছু শবযাত্রা অনুসরণ করল।

মুখাগ্নি ঝিণিকেই করতে হ'ল। আর কেউ তেমন ছিল না। তাছাড়া দিবানাথ নিজেই বললেন,-'মেয়েটাকে ও খুব ভালবাসত। ঝিণির হাতের আগুন পেলে ওর আত্মা নিশ্চয় তৃপ্তি পাবে।'

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের একজন বলল, –'এছাড়া উপায় কী ? খবর পেয়ে হিরণ কিংবা কাকলি কবে আসবে তার কিছু ঠিক আছে ?'

দাহ করে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে গড়াল। পিতুর মা বিকেল থেকে এসে চুপ করে বসেছিল। কোলাপসিবল গেটের কাছে সিঁড়ির ওপর অমনি একলা বসে থাকতে তার ঈষৎ ভয়-ভয় করছিল। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরার সময় হ'লেই

গিন্নি তাকে ডেকে বলত,—'আমাকে ওই গরম জলের ব্যাগটা দিয়ে যেও পিতুর মা। এখন সেঁক নিলে রাত্তিরে একটু আরাম করে পাশ ফিরে শুতে পারব।'

রিণি তাকে ডেকে বলল,—'ক'টা দিন আমি এখানেই থাকব। তুমি কিন্তু রোজ এস।'

পিতুর মা বলল,—'মুখে আগুন দিয়েছ। তোমার এখন অশৌচ। রান্নাঘরে আর গিয়ে কাজ নেই। জামাই দাদার চা-জলখাবার, ভাত-রুটি, তরকারি সব আমি তৈরি করে দেব।'

রিণি ম্লান হেসে জবাব দিল, 'তুমি কী ভেবেছ ও এখানেই থাকবে? বড়জোর আজকের রাত্তিরটা—কাল সকাল হ'লেই চলে যাবে। নিজের ব্যবসা ছেড়ে একটা দিন কোথাও থাকতে চায় না।'

'ওমা!' পিতুর মা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে ঘর-সংসার ফেলে তুমিই বা কেমন করে এখানে এতদিন থাকবে?'

—'তাছাড়া যে উপায় নেই।' রিণি বোধহয় তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করল। বলল,—'অন্তত হিরণ কিম্বা কাকলি যতক্ষণ না এসে পৌঁছয়। নইলে শোক-তাপ পাওয়া মানুষটাকে একা-একা এত বড় বাড়িতে ফেলে যাই কেমন করে?'

শ্মশান থেকে ফিরে দিবানাথ চুপ করে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইলেন। পিতুর মা এক কাপ চা এনে দিতেই হাত বাড়িয়ে সেটি নিলেন। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন। অপাঙ্গে মানুষটাকে দেখে পিতুর মায়ের মনে হ'ল কর্তা যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। হয়তো পুরানো দিনের কথা। চোখের সামনে এখন ছবির মতো সব ভেসে উঠছে। দিবানাথ অবিকল দেখতে পাচ্ছেন।

রিণির সঙ্গে দেখা হতেই পিতুর মা বলল,- 'কর্তা বড়ো শোক পেয়েছেন, বুঝলে?'

সে কথা রিণিও জানে। ছেলে-মেয়ে বিদেশে যাওয়ার পর থেকে মামা আর মামী উভয়ে পরস্পরের অবলম্বন ছিলেন। এখন একজন চলে যেতেই আর একজনের কাছে জীবন শূন্য, অর্থহীন মনে হচ্ছে।

পিতুর মা বলল,—'ছেলে এসে এবার বাপকে সঙ্গে করে নিয়ে যাক। নইলে এত বড়ো বাড়িটায় অমন একা-একা কেউ থাকতে পারে? তারপর বুড়োমানুষ, রাতবিরেতে হঠাৎ কিছু হ'লে তোমরা একটা খবর পাবে?'

হিরণ এসে পৌঁছল শ্রাদ্ধের আগের দিন বিকেলে। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, কাউকে

সঙ্গে আনে নি। তারা রইল নিউ-জার্সিতে। আর কাকলি এখন আসতে পারল না। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দুঃখ করে বাপকে শুধু একটা চিঠি লিখেছে। তবে এখন না এলেও মাস ছয় পরে তারা নিশ্চয় একবার আসতে চেষ্টা করবে। চিঠি পড়ে দিবানাথ কোনো মন্তব্য করেন নি। অনাবশ্যক একখণ্ড কাগজের মতো টেবিলের ওপর সেটা ফেলে রেখে উঠে গেলেন।

পত্রের বয়ান পড়ে রিণি ঠোঁট উল্টিয়ে বলল,—'ছি-ছি! তুই না মেয়ে? মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে একবার ছুটে আসতে পারলি না? শুকনো একটা চিঠি লিখে কর্তব্য সারলি? এরপর বুড়ো বাপ একা কেমন করে থাকবে তাই নিয়েও তো ভাবতে হয়।'

পিতুর মা শুনে বলল,—'সবাই কী আর তোমার মতো রিণিদিদি? আজকাল বিয়ে হ'লেই মেয়েরা পর। একবার বরের সোহাগ পেলে মা-বাপের কথা কী আর মনে রাখে?'

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। রিণি মুখাগ্নি করেছিল। তাকেই শ্রাদ্ধ করতে বসতে হ'ল। দিবানাথ কোনো কার্পণ্য করেন নি। কলকাতার আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন ছাড়াও একদিন এই অঞ্চলের কাঙালীদের খিচুড়ি অন্ন বিতরণ করলেন। শয্যাদ্রব্য সহ পালঙ্ক, থালা-বাটি, কলসী, ধুতি শাড়ি ছাড়াও পুরোহিত ব্রাহ্মণকে তিনি একটি স্বর্ণ-অঙ্গুরী দিলেন।

দু একদিন বাদে হিরণ কথাটা পাড়ল। বলল,—'এখানে তুমি একা কেমন করে থাকবে বাবা?'

দিবানাথ মুখ তুলে তাকালেন।

—'আমি বলি এবার নিউ-জার্সিতে আমাদের কাছে থাকবে চল।' হিরণ প্রস্তাব করল। এক মুহূর্ত থেমে ফের শোনাল,—'মাকে সে কথা আমরা আগেও বলেছিলাম।'

দিবানাথ ছেলের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বললেন,—'এই নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।'

হিরণ তবু বলল,—'কিন্তু বাবা আমার তো মোটে পনের দিন ছুটি। এর মধ্যে তোমার পাসপোর্ট, ভিসা, এগুলোর ব্যবস্থা করে যাই। তাহলে মাস-খানেকের মধ্যে তুমি রওনা হতে পারবে।'

—'ব্যবস্থা একটা হবে। তুমি চিন্তা করছ কেন?' দিবানাথ ছোট্ট উত্তর দিলেন।

আলোচনায় তখনকার মতো ছেদ পড়ল। শ্রাদ্ধ চুকতেই হিরণ কয়েকদিন খুব ব্যস্ত হয়ে রইল। পুরানো বন্ধু-বান্ধব, শ্বশুর বাড়ি, তার কলেজের দু-একজন

অধ্যাপকের সঙ্গেও দেখা করে এলো। হিরণ এসে পৌঁছতেই রিণি তার বাড়িতে চলে গেছে। পিতুর মা আগের মতো সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পরে টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা রেখে বসন্তবিলাস রোডে ফিরে যায়। দিবানাথ তখন একাই থাকেন। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চুপ করে বসে কী যেন ভাবেন। ডাইনিং স্পেশ ছাড়া আর সমস্ত ঘরে আলো নেভানো থাকে। হিরণ একটু রাত্তির করে ফেরে। সওয়া দশটা কখনও সাড়ে দশটা বাজে। এসেই বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে,--'অন্ধকারে চুপচাপ বসে তুমি কী ভাব বলতো ?'

দিবানাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যান। বলেন,—'বিশেষ কিছু নয়। এমনি অনেক কথা মনে আসে।'

হিরণ জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে যায়। দিবানাথ ফের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসে থাকেন। নিঃশব্দ অন্ধকারে তিনি যা মনে ভাবেন, এই বয়স্ক ইঞ্জিনিয়র ছেলের কাছে সে কথা বলা যায় না। অমিয়া মারা যাবার পর দিবানাথ এখন শুধু স্মৃতিচারণা করেন। স্টেটস থেকে হিরণ ফিরে আসার পর ওর শৈশবের দিনগুলির কথা তার বেশী করে মনে পড়ছে। বিবাহিত জীবনের এক হাসিতরল আতপ্তঘন অধ্যায়। তখন দিবানাথ থাকতেন মৌলালীর কাছে দু-কামরার ছোট একটা ফ্ল্যাটে। হিরণকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করলেন। ওর বয়স মাত্র ছয়। সাড়ে ছটায় স্কুল। হিরণকে নিয়ে দিবানাথ সাড়ে পাঁচটার পর বাড়ি থেকে বেরোতেন। শীতকালে একটু কষ্ট হ'ত। সাড়ে পাঁচটায় প্রায় অন্ধকার, বেশ ঠাণ্ডা। অমিয়া ছেলেকে একটা ফুলহাতা সোয়েটার আর মাথায় কম্ফোর্টার বেঁধে দিত। তাঁকে পই পই করে বলত,—'ওগো, একটু লক্ষ্য রেখ, কানের কাছটা যেন ঢাকা থাকে। নইলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখবিসুখ করবে।'

মৌলালীর কাছে দিবানাথ ট্রাম ধরতেন। তিন-চক্ষু দানবের মতো ট্রাম-গাড়িটা লাইন বরাবর নিঃশব্দে এগিয়ে আসত। হিরণ তার হাত ছাড়িয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য ছটফট করত। দিবানাথ বলতেন,—'খোকা, এত ব্যস্ত কেন ? গাড়িটা আগে থামতে দাও।'

বাড়ি ফিরে এলে অমিয়া সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করত,—'কিগো, ঠিক সময়ে পৌছতে পেরেছিলে ? খোকা বলে- প্রেয়ার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে ওদের দিদিমণি বকে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিবানাথ হাসতেন। বলতেন,—'এরপর ছেলেটাকে তুমি নিজে পৌছে দিয়ে এস। সকালবেলা কত মা তো বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

অন্ধকারে বসে দিবানাথ অতীতদিনের অকিঞ্চিৎকর নানা ঘটনা ভাবেন। আজকাল চুপচাপ বসে থাকলেই অমন কত স্মৃতি ভিড় করে তার মনের কোণে

জমা হয়। দিবানাথের যেটা খুব পছন্দ, বকের মতো আলতো পা ফেলে সেখানের নরম মাটিতে ধীরে ধীরে চক্কর দিয়ে ফেরেন। কখনও ভাবেন, অন্ধকারে অমিয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে। বাতব্যাধিতে পঙ্গু, অশক্ত, অমিয়াবালা নয়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক চঞ্চল যুবতী। নব পুষ্পিতা মল্লীলতার মতো লীলাময়ী, হাস্যমুখী। অভিমানভরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে,—'তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। কক্খনো না, দেখো—'

সেদিন রাত্তিরে খাওয়ার পর দিবানাথ ছেলেকে ডাকলেন।

হিরণ তার সামনে বসল।

দিবানাথ প্রস্তুত ছিলেন। ছেলের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে শুরু করলেন,—'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল খোকা।'

—'বলো।' হিরণ শোনার জন্য অপেক্ষা করল।

দিবানাথ পরীক্ষকের মতো জিজ্ঞাসা করলেন,—'বৌমা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি কী আর এদেশে ফিরবে ?'

শক্ত প্রশ্ন। হিরণ চট করে কোনো জবাব দিতে পারল না।

দিবানাথ নিজেই বললেন,—'আমার ধারণা না ফেরার সম্ভাবনা বেশী। হয়তো এরপর ইউনাইটেড স্টেটসে তুমি সিটিজেনশিপ নেবে।'

হিরণ জিজ্ঞাসা করল,—'তুমি কী বলতে চাইছ বাবা ?'

অনর্থক আর ভনিতা না করে দিবানাথ সরাসরি তার বক্তব্যে এলেন। ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন,—'ভাবছি, ফুলবাগানের এই বাড়িটা বিক্রি করে দেব খোকা।'

—'বিক্রি করবে ?'

—'হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম এই বাড়িটা তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে যদি দু-চার মাসের জন্য এদেশে আস, তাহলে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে তোমার শ্বশুরবাড়ি আছে, সেখানে দিব্যি থাকতে পারবে। মিছিমিছি এত বড় বাড়িটা কার জন্যে রেখে যাব বল ?'

হিরণ বলল,—'কিন্তু বাড়িটা তো এখনও তোমার প্রয়োজনে লাগছে বাবা। তারপর ধর, যদি নিউজার্সিতে গিয়ে তোমার মন না টেকে তাহলে তো আবার ক'লকাতায় ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে।'

দিবানাথ স্পষ্ট বললেন,—'আমি নিউজার্সি যাব না খোকা।'

—'নিউজার্সি যাবে না, আবার বাড়িও বিক্রি করে দেবে ? তাহলে তুমি কোথায় থাকবে বাবা ?'

—'আমি মনঃস্থির করেছি জীবনের বাকি কটা দিন হৃষিকেশে আমার

গুরুজীর আশ্রমে কাটাব।'

—'আশ্রমে গিয়ে থাকবে?' হিরণকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

—'হ্যাঁ, এতে চিন্তিত হবার কী আছে?' দিবানাথ ধীরে ধীরে বললেন,—'মানুষের জীবন একটা খেলাঘর খোকা। তোমারও একদিন এই উপলব্ধি হবে। আমার খেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন বাড়ি ফেরার আগে নিরিবিলি কোথাও শান্তিতে থাকতে চাই।'

—'তার জন্যে নিজের বাড়ি বিক্রি করে তোমাকে আশ্রমে গিয়ে থাকতে হবে?'

দিবানাথ বললেন,—'আমার মনে হয় সেখানেই বেশ থাকব। এই নিয়ে অকারণ তুমি চিন্তাভাবনা ক'র না।'

হিরণ বলল,—'বাবা, তোমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা আর একবার ভেবে দেখো।'

—'এই কদিন ধরে চুপচাপ বসে আমি সব দিক বিচার করে দেখেছি খোকা। যে দেশে তুমি রয়েছ, সেদেশে বিয়ে-থা করেই ছেলেমেয়েরা আলাদা ঘর বাঁধে। মা-বাবার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক থাকে না। আর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আমৃত্যু নিজেদের কাছে রাখলে বোধহয় একটা নেনজির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তুমি না হ'লেও বৌমা হয়তো অস্বস্তি বোধ করতে পারে। তাছাড়া ওই ঠাণ্ডার দেশে এই বুড়ো বয়সে গিয়ে যদি আরো অশক্ত হয়ে পড়ি তাহলে মনের ওপর তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। অথচ এই ক'লকাতায় কী নিয়ে থাকব বল? জন্তু-জানোয়ারের মতো মানুষ তো শুধু আহার-নিদ্রা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তার একটা আশ্রয় চাই।'

হিরণ শুনছিল। কিন্তু বাবাকে সে কেমন করে বোঝাবে তাই ভেবে পেল না।

দিবানাথ বললেন,— গীতায় আছে,—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া আকাঙ্খা, অহঙ্কার ও মমতা-শূন্য হইয়া সংসারে বিচরণ করেন সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন। আমিও প্রায় সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হৃষিকেশের আশ্রমে পরমাত্মার কাছে সেই শান্তি প্রার্থনা করব খোকা।'

হিরণ পরিষ্কার বুঝতে পারল দিবানাথ তার সিদ্ধান্তে অটল। আর কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দিবানাথ ফের স্বগতোক্তির মতো মৃদুস্বরে কথা

কইলেন—, 'বি, এ, ক্লাসে আমাদের ম্যাকবেথ পড়ানো হ'ত খোকা। শেকসপীয়রের ম্যাকবেথ। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রানীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে ম্যাকবেথ বলছে,—

She should have died hereafter ;
There would have been a time for such a word
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty place from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our Yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out out brief candle !
Life's but a walking shadow . a poor player,
That strets and frets his hour upon the stage
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot full of sound and fury signifying nothing.

দিবানাথ এক মুহূর্ত থামলেন। কেমন দুঃখের সঙ্গে বললেন,—'আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে ওই কথাগুলি আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।'

খবর শুনে পরদিন রিণি এসে হাজির। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দিবানাথকে বলল,—'মামা, তুমি নাকি হৃষিকেশ চলে যাচ্ছ? ফুলবাগানের এই বাড়ি বিক্রি করে দেবে?'

—'হ্যাঁ।' দিবানাথ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোকে কে বলল? হিরণ?'

রিণি পরিষ্কার জানাল,-'তোমার হৃষিকেশে যাওয়া চলবে না।'

—'তাহলে কী আমাকে নিউজার্সি যেতে বলছিস?'

—'না।' রিণি মাথা নাড়ল। বলল,—ফুলবাগানের এই বাড়িতে যদি ভালো না লাগে তাহলে আমার কাছে থাকবে চল মামা।'

—'তোর কাছে?'

—'হ্যাঁ।' রিণি তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে গাঢ় স্বরে বলল,—'তোমাকে বাবার মতো ভালবাসি। বাবা কী মেয়ের কাছে গিয়ে থাকে না?'

দিবানাথ বললেন,—'ধুর! তুই মেয়ে হতে যাবি কেন?'

—'মেয়ে নই?' রিণিকে আহত দেখাল।

—'না।' দিবানাথ একগাল হেসে বললেন,—'তুই হ'লি আমার মা। তাই তো টেলিফোন করে ডাকলেই ছেলেকে খাওয়াতে হবে বলে সব ফেলে দৌড়ে চলে আসতিস।'

—'বেশ, তাহলে মায়ের কাছে গিয়ে থাকবে কথা দাও।'

—'তা হয় না মা।' দিবানাথ সস্নেহে ওর মুখের দিকে তাকালেন। বললেন,—'এই পৃথিবীতে আমরা সবাই খেলা করতে এসেছি। আমার খেলুড়ে তো খেলা ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। একা-একা এখন কার সঙ্গে খেলা করি বল?'

সাতদিনের মধ্যে দিবানাথ সব বিলিব্যবস্থা শেষ করে ফেললেন। বাড়িটা কিষণলালকে বিক্রি করবেন। তবে যেদিন দলিল রেজেস্ট্রী হবে, তার পরদিন ভোরেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করে চলে যাবেন। কিষণলাল অবশ্য বলল, —'আপনার যতদিন ইচ্ছে থাকুন না।'

দিবানাথ মাথা নাড়লেন। তা হয় না।

ছেলেকে ডেকে বললেন,—'শোনো, বাড়িটা কিষণলালকে বিক্রি করে দিচ্ছি। তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় কিষণলাল আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। অত রাত্তিরে ছুটোছুটি করে ডাক্তার ডেকে এনে তাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল। ওকে আমি বন্ধু বলে ভাবি। তাছাড়া তিন পুরুষ ধরে ওরা কলকাতার বাসিন্দা। কিষণলাল এখানেই জন্মেছে, কোনোদিন রাজস্থান দেখেনি। ওকে বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু মনে করা যায়?'

জিনিসপত্র সব জলের দরে বিক্রি হয়ে গেল। জোর করে অনেক কিছু রিণির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ করে যেগুলি অমিয়াবালার বড়ো প্রিয় ছিল। হাতে ধরে সেগুলি আর বিক্রি করতে পারলেন না। পিতুর মাকে গিন্নির অর্ধেক শাড়ি জামা বিলিয়ে দিলেন। তারপর একদিন দলিল রেজেস্ট্রী করে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে হিরণকে ডেকে বললেন,—'তুমি তো কাল ভোরের প্লেনে রওনা হবে?'

—'হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইটে।' হিরণ উত্তর দিল। দিবানাথ বললেন, —'আমি হিমগিরি এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশান পেয়েছি। পৌণে ছটায় ট্রেন। বেনারসে দু-চার দিন থেকে হৃষিকেশে যাব। বাড়ি থেকে তাহলে একই সময়ে বেরুবো, কী ব'ল?'

রাত্তিরটা রিণি এখানেই থেকে গেল। মামার বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিল। দিবানাথ বিশেষ কিছু সঙ্গে নিতে চান নি। কী হবে মায়া বাড়িয়ে? গতকাল তার এক বন্ধু দেখা করতে এসেছিল। সে বলল,—'বিষয়-সম্পত্তি সব বেচে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে ভায়া?'

দিবানাথ জবাব দিলেন,—'মর্ত্যের বন্ধন যত ক্ষয় হয়, ততই ভালো।'

হিরণ প্রায় কিছুই সঙ্গে আনে নি। নিজেই তার জামাকাপড়গুলো ফোমের

স্যুটকেসে ভরে নিল। রাত একটু বাড়লে দিবানাথ ওদের কাছে ডেকে বললেন,—'ফুলবাগানের এই বাড়িতে আজ আমার শেষ রাত্রি। কখনও ভাবিনি এত কষ্টে তৈরি করা এই বাড়িটা একদিন বিক্রি করে চলে যাব।' ফের দুঃখ করে জানালেন,--'দুদিন বাদে কী ঘটবে তা যদি আমরা সত্যি জানতে পারতাম।'

রিণি আর হিরণ দুজনেই চুপ করে রইল। দিবানাথ বললেন,—'বাড়ি বিক্রির টাকার একটা মোটা অংশ রামকৃষ্ণ মিশনে দিলাম। কিছু টাকা য়ুনির্ভার্সিটিতে থাকবে। তোমার মায়ের নামে একটা স্কলারশিপ প্রতি বৎসর ইতিহাসের একজন মেধাবী ছাত্রকে দেবার ব্যবস্থা করেছি। বাকি টাকা তোমার এবং কাকলির নামে সমান অংশে জমা থাকবে। আর রিণি, তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছি আমার অ্যাটর্নির অফিস থেকে সমস্ত টাকা প্রাপকের নামে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।'

রিণি বলল,—'মামা, আমার ছেলে-মেয়ে হয়নি। এই টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

—'ওটা তুমি নিও মা। মায়ের ঋণ শোধ করছি বলে মনে ক'র না। তবে তুমি ওটা গ্রহণ করেছ জানলে আমি খুব শান্তি পাব রিণি।'

রাত চারটের সময় সকলে বিছানা ছেড়ে উঠল। আধ ঘণ্টা বাদে হুস করে দুখানা গাড়ি এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। সাদার্ন অ্যাভেনিউ থেকে হিরণের শ্বশুর গাড়ি দুখানা পাঠিয়ে দিয়েছে। একটা হিরণকে এয়ার পোর্টে নিয়ে যাবে। অন্যটি দিবানাথের জন্য, গাড়ি তাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

অনেক দিনের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটা। ছেড়ে যাবার মুহূর্তে দিবানাথ হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়লেন। শেষবার তাঁর শয়ন কক্ষে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে রইলেন। চারিদিকে দেয়ালের গায়ে, ঘরের কোণে, প্রতিটি বায়ুকণায় কী যেন এক দুর্লভ সুঘ্রাণ তিনি সন্ধান করে ফিরছেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে রিণি বলল,—'মামা, এরপর যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়?'

দিবানাথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। তাই তো! আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে? তিনি তো মনকে শক্ত করে প্রস্তুত করেছেন। তাহলে কেন এই বুকচাপা কান্না? এখন কেন এই ভ্রান্তি?

সিঁড়ি বেয়ে সকলে নিচে নামল। অত ভোরে পিতুর মা এসেছিল কর্তাকে শেষবার চা তৈরি করে দিতে। দিবানাথ তাকে পাঁচ'শ টাকা দিয়ে বললেন,—'তোমার সেবার কথা সে কোনোদিন ভুলতে পারেনি। আমিও ভুলব না পিতুর মা।'

গাড়িতে ওঠার আগে দিবানাথ ছেলের মুখের দিকে একবার সস্নেহে তাকালেন। বললেন,—'খোকা, তাহলে গুডবাই।'

হিরণ মাথা নিচু করে তাকে প্রণাম করল। তিনি আশীর্বাদ করলেন, —'গৌরবান্বিত হও।'

রিণি তার পা ছুঁয়ে বলল,—'পৌঁছে একখানা চিঠি দিও. আর যদি ওখানে ভালো না লাগে তাহলে ট্রেনে উঠে সোজা আমার কাছে চলে আসবে, কেমন ?'

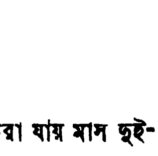
দিবানাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন,—'আসব বৈকি মা। যদি পুনর্জন্ম বলে কিছু থাকে তাহলে ঠিক তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব।'

রিণি ঝরঝর করে কেঁদে দিবানাথকে জড়িয়ে ধরল।

কিষণলাল এবং তার পরিবারের লোকেরা নিচে এসে দাঁড়িয়ে আছে। দিবানাথ একবার তাদের দিকে তাকালেন, ঘাড় তুলে আর একবার বাড়িটার দিকে। তারপর দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন।

রিনি তখনও কাঁদছে। পিতুর মা তাকে ধরে আছে।

দুটো গাড়ি একসঙ্গে স্টার্ট নিল। একটা সোজা এয়ারপোর্টের পথ ধরে, অন্যটি উল্টোদিকে বেলেঘাটা মেন রোড বরাবর হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষমান হিমগিরি এক্সপ্রেসের উদ্দেশে।



হীরালাল ফিরছিল চাঁপদানী থেকে।

হিমঘর তৈরির কাজ এখন পুরোদমে চলছে। আশা করা যায় মাস দুই-তিনের মধ্যে কনস্ট্রাকশন শেষ হয়ে যাবে। বাকি থাকবে ইলেকট্রিকের কাজ আর মেসিনের ইনস্টলেশন। তাও আর কতদিন লাগতে পারে ? সামনের সীজনে আলু উঠলেই তাদের নতুন কোল্ড স্টোরেজে নিশ্চয় মাল মজুত করতে পারবে।

হিমঘরটা অবশ্য হীরালালের একার নয়,—অর্ধেক অংশ তার পার্টনার সতীশ

খাস্তগীরের। সত্যি কথা বলতে খাস্তগীরের সাহায্য না পেলে এত তাড়াহুড়ো করে কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হয়তো সম্ভব হ'ত না। একটা লাইসেন্স বের করতেই বছর ঘুরে যেত। তারপর পয়সা থাকলেই কী সব হয়? বাজারে মেটিরিয়্যালসের টান আছে। যেমন সিমেণ্ট,—কনট্রোলে ওই বস্তুটি জোগাড় করা একটা সমস্যা। আর সিমেণ্ট না থাকলেই কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু খাস্তগীর এর সমাধান জানে। পার্টির বড় নেতা, কেষ্ট-বিষ্ট সরকারী অফিসারদের সঙ্গে তার দহরম-মহরমের কথা অনেকের অবিদিত নয়। মাল ফুরিয়ে গেলে হীরালাল তাই পাটনারের দ্বারস্থ হয়েছে। তারপর কয়েকটা দিন না যেতেই কনস্ট্রাকশনের কাজ ফের চালু করতে তার অসুবিধে হয় নি।

গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে হীরালাল তার ব্যবসার অংশীদার খাস্তগীরের কথা ভাবছিল। কোল্ড স্টোরেজ লাইনে লোকটার যে কোনো যোগাযোগ আছে তা নয়। এমনি আকস্মিক তার সঙ্গে একদিন পরিচয়। কথা বলার সময় হীরালাল হিমঘর তৈরির ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছিল। ভালো একজন পাটনার পেলে সে এই কাজে নামতে পারে। শুনে সতীশ খাস্তগীর শুধু এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তার মুখের ওপর সন্ধানী টর্চের আলোর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বলল,—'আসুন না একদিন আমার অফিসে। নিরিবিলি দুজনে বসে আলোচনা করা যাবে।'

ব্যবসার জগতে সতীশ খাস্তগীর যে একজন রাঘববোয়াল হীরালালের সেকথা বুঝতে দুদিনের বেশী লাগেনি। লোকটার অনেক ব্যবসা, নানা ধরনের এবং নানা রাজ্যে তা ছড়িয়ে আছে। ক'লকাতায় দুটো সিনেমা হ'ল, পুরীতে একটা হোটেল, জামসেদপুরে নামী সাইকেল কোম্পানীর এজেন্সী ছাড়াও টায়ার-টিউবের ব্যবসা। কানপুরে ইলেকট্রনিক গুডসের কারবার,—টি. ভি., স্টিরিও তো আছেই। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের কোথায় যেন একটা পেট্রল পাম্প কিছুদিন আগে কিনেছে।

হীরালালের সঙ্গে আলোচনার দুদিন পরেই খাস্তগীর তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল। হিমঘরের বিজনেসে নামতে তার আপত্তি নেই। দুজনের পার্টনারশিপ,—আধাআধি বখরা। কাগজে-কলমে একটা ডিড্ করে রাখলে ভালো,—দু-পক্ষের ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকবে না।

এই কোল্ড স্টোরেজের ব্যাপারেই সামনের মাসের প্রথমে হীরালাল আমেরিকা যাচ্ছে। কথাটা এখনও সে কারো কাছে ভাঙে নি। পাড়ায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এমন কী তার স্ত্রীকেও বলে নি। আসলে হীরালাল নিজে কে কোনোদিন আমেরিকা যাওয়ার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারত না। কোলে মার্কেটের সেই আলুর ব্যবসাদারদের চল্লিশ টাকা মাইনের কর্মচারী। একবেলা

খোরাকী। এ ছাড়া সকালে বাসি রুটি আর তরকারি জলখাবার। দু বেলা চা আর ছটা বিড়ি বাড়তি। তার বিনিময়ে সকাল সাতটা থেকে রাত্তির আটটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। এক-একদিন গায়ে-গতরে এমন ব্যথা, যে বিছানা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হ'ত। কিন্তু সতীশ খাস্তগীর মাথায় অনেক বুদ্ধি ধরে। হিমঘরের জন্য আমেরিকা থেকে এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনটা আনবার ফন্দি বহুদিন আগেই সে এঁটে রেখেছে। এমনিতে ইমপোর্ট লাইসেন্স বের করার অনেক ঝামেলা। তাছাড়া যে মেশিন দেশে তৈরী হচ্ছে তার জন্য মিছিমিছি লাইসেন্স মঞ্জুর হবে কেন? খাস্তগীর তাই একটা অন্য উপায় ঠিক করেছে। তার এক ছেলে আমেরিকায় ডাক্তার। মেশিনটা তার নামে সেখানে কেনা হবে। বিদেশের কোম্পানীকে ডাক্তার টাকাটা শোধ করবে। আর মেশিন চলে আসবে এদেশে। খাতাপত্রে মেশিনের দামটা ধারের অ্যাকাউণ্টে পড়ে থাকবে। আর কালি-কলমের হিসেবের বাইরে নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিতে অসুবিধে কোথায়? মেশিন এনে চাঁপদানীতে কোল্ড স্টোরেজে বসানো হবে। কিন্তু কেনার আগে সেই মেশিন একবার দেখেশুনে পরীক্ষা করবার জন্য নিশ্চয় কারো যাওয়া প্রয়োজন।

খাস্তগীর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'আমার এখন সময় হবে না। নানা ঝামেলায় ফেঁসে আছি। আপনি বরং একবার কমলেশের কাছে চলে যান। মেশিনটা নিজে দেখে শুনে বুক করে দিয়ে আসুন। দু একদিনের মধ্যে টেলিফোনে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানিয়ে রাখছি।'

সতীশ খাস্তগীর এমন সহজভাবে কথাটা বলল যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। এ পাড়া থেকে ও পাড়া যাওয়া। ইচ্ছে করলে হীরালাল কালই বেরিয়ে পড়তে পারে।

কমলেশ ডাক্তার। সতীশ খাস্তগীরের মেজ ছেলে। আমেরিকায় থাকে। বড়ো শহর থেকে মাইল চল্লিশ দূরে কী যেন একটা জায়গায় রয়েছে। বউ-ছেলে, গাড়ি-বাড়ি সব নিয়ে এখন সে দেশের বাসিন্দা। মেশিন কেনার ব্যাপারে নিশ্চয় তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাদের কোল্ড স্টোরেজে ঠিক কতখানি ক্ষমতা সম্পন্ন এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনের দরকার, কমলেশের তা জানবার কথা নয়। তাই বিজনেসের কেউ সেখানে গেলে সব দিক বিবেচনা করে মেশিনটা কেনা হবে, তাতে কানো সন্দেহ নেই।

তবু প্রস্তাবটা শুনে হীরালাল প্রথমে চমকে উঠল। তারপর আমতা আমতা করে শুধোল, —'ইয়ে, মানে আমাকে আমেরিকা যেতে বলছেন?'

—'হ্যাঁ।' খাস্তগীর স্পষ্ট জবাব দিল। ফের হেসে বলল,—'ভয় পাচ্ছেন

কেন ? সাহেবরা বাস করলেও দেশটা তো মাটির। আর সেখানে কমলেশ রয়েছে। তার বাড়িতে থাকবেন। আপনাকে সঙ্গে করে কোম্পানীর অফিসে সে নিয়ে যাবে।'

হীরালাল তবু ইতস্তত করছিল। শেষে তার দুর্বলতার কথা জানিয়ে বলল,—'কিন্তু আমি তো ইংরাজী জানি না।'

প্রাইমারী স্কুলে পড়া বিদ্যে। খাতায় নামটা ছিল—ওই পর্যন্ত। ইংরাজী প্রায় শেখে নি। এখন যা হোক করে শুধু নিজের নাম সইটা করতে পারে। হুট করে সাহেব সুবোর দেশে অমনি গেলেই হ'ল ? শেষকালে এক বর্ণ ভাষা বুঝতে না পেরে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

খাস্তগীর তাকে আশ্বস্ত করল। বলল,—'অকারণ ভয় পাচ্ছেন হীরালালবাবু। ইংরাজী না বলতে পারলেও আমেরিকায় গিয়ে মেশিনের অর্ডার দিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এখনও তো মাসখানেক সময় আছে। এর মধ্যে একদিন আপনাকে মিসেস হিগিনসের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তালিম দিলে নিশ্চয় একটু উন্নতি হবে।'

হীরলাল কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

খাস্তগীর বলল,—'আরে মশায়, চান্স পেয়েছেন আমেরিকা দেশটা একবার ঘুরে আসুন। নইলে সারাজীবন তো কুয়োর ব্যাং হয়ে কাটালেন। ব্যবসা মানে ট্রাক-ভর্তি আলু এনে বেচেছেন। নইলে নতুন আলু হিমঘরে ধরে রেখে মওকা বুঝে বাজারে ছেড়েছেন। বিদেশে আরো কত রকমের বিজনেস চলে একবার চোখ-কান খুলে দেখে নিন। তাছাড়া ঈশ্বর যখন হাত তুলে দুটো পয়সা দিয়েছেন তখন জীবনটা একটু ভোগ করবেন বৈকি।' তার মুখের দিকে তাকিয়ে খাস্তগীর মন্তব্য করল,—'আমারও তো আই. এ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে। তবু তিনবার স্টেটস আর দুবার কন্টিনেন্ট ঘুরে এসেছি।'

হীরলাল সবিনয়ে বলল,—'আপনার সঙ্গে কী আমার তুলনা হয় ?'

কথাটা খোশামোদের। কিন্তু খাস্তগীর সেটা গায়ে মাখল না। আলোচনাটা শেষ করবার জন্য শুধু বলল,—'আপনি তাহলে তৈরি হ'ন। পাশপোর্ট, ভিসা আর যা করা দরকার ওসব আমি দেখছি।'

তা সেই আমেরিকা যেতে আর মাত্র বারোদিন হাতে আছে। কথাটা চেপে রাখা এখন ভালো দেখায় না। অন্তত বউকে বলতে হয়। হীরালাল আমেরিকা যাবে শুনলে ভামিনী না আবার গোঁসা করে। তুচ্ছ কারণে রেগেমেগে একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসতে কতক্ষণ ? এক-আধদিনের ব্যাপার নয়। প্রায় তিন সপ্তাহ হীরালালকে সেখানে থাকতে হবে। হপ্তা দুয়ে থাক, তে-রাত্তির স্বামীকে কখনও

চোখের আড়াল করেনি ভামিনী। পুরুষমানুষকে তার বিশ্বাস নেই। মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দেয়,—'বাইরে পা দিলেই তো সব হ্যাংলা কার্তিক। মেয়েমানুষ দেখলেই ছোঁক ছোঁক কর।'

সতীশ খাস্তগীর তাকে তালিম দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মিসেস হিগিনসের বাড়িতে নিজে নিয়ে গেছে। করপোরেশনের লাল বাড়িটার কাছে একটা স্পোকেন ইংলিশ'এর স্কুলে মিসেস হিগিনস্ পড়ান। কিন্তু হীরালালের যা বিদ্যে, সেখানে গেলে পাঁচজনের সামনে অপদস্থ। একটা হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াবে। মিসেস হিগিনসকে তাই বেশী টাকা কবুল করে একটা আলাদা ব্যবস্থা করেছে খাস্তগীর। বেলা তিনটে নাগাদ হীরালাল তার বাড়িতে আসবে। তাকে একটু-আধটু ইংরাজী কথা বলার ঢঙ, বিলিতী আদব-কায়দা শেখালেই চলবে। তবে সময়টা খুব কম। আর লোকটা একেবারে ব। ম্যানার্স বলতে প্রায় কিছুই জানে না অথচ মাসখানেক বাদে ওকে একবার স্টেটসে পাঠাতে হচ্ছে। এখন মিসেস হিগিনস্ যদি তাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারেন তাহলেই মুখরক্ষে হয়।

শুধু এই নয়, খাস্তগীর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিউ-মার্কেটের কাছে একটা নামী দোকানে চারটে স্যুটের অর্ডার দিয়ে এসেছে। গলায় কেমন করে টাই বাঁধতে হয় মিসেস হিগিনস্ তার শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। ব্যস্ তাহলেই নিশ্চিন্তি। সমস্ত কাজ শেষ করে খাস্তগীর ঠাট্টা করে বলেছে,—'যাবার দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন, আপনার ভোল পাল্টে গেছে। নিজেকে চিনতেই পারছেন না।'

তা প্রায় দু-হপ্তার বেশী মিসেস হিগিনসের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করে হীরালাল এখন অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছে। নিজের ওপর আস্থা হয়েছে। প্রথম দিন যেমন আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল এখন সে ভাবটা নেই। তবে মিসেস হিগিনস্ তাকে অন্য সময়েও ইংরাজীতে কথাবার্তার জবাব দেবার অভ্যেস করতে বলেছেন। তাই নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। একদিন বাড়িতে ভামিনী কী বলতেই হীরালাল ও কে বলে তার জবাব দিয়েছিল। তাই শুনে বউ অবাক হয়ে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কই, এর আগে তো স্বামীকে এমন সুর করে ইংরাজী বলতে সে কোনোদিন শোনে নি?

গাড়িটা শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার ক্রশিঙে থামতেই কোথা থেকে কোৎনা ঘোষ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বলল,—'হীরেদা, বাড়ি যাবে তো?'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হীরালাল একটু অবাক হয়ে বলল,—'আরে

কোঙোন, তুমি এখানে? এস, এস।'

গাড়িটা ক্রশিংএ দাঁড়ায়ে। সিগন্যাল হ'লেই স্টার্ট দিতে হবে। তাই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি তাকে ভিতরে আসতে বলল।

কোংনা ঘোষ সীটে হেলান দিয়ে বসতেই হীরালাল ওর মুখে মদের গন্ধ পেল। ভর দুপুরবেলা কোথায় বসে এক পাত্র টেনেছে। নিশ্চয় কোনো সাঙাতের সঙ্গে দেখা। সে একটা বোতল বের করে দিয়ে বন্ধুকে খাতির করেছে

কোংনা হঠাৎ বলল,—'তুমি কিন্তু সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ডুবে ডুবে দিব্যি জল খাচ্ছ হীরে দা।'

হীরালাল আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। ছোঁড়াটা নেশার ঘোরে উল্টোপাল্টা কথা বলছে নাকি? কিন্তু না। কোংনা ঘোষ দিব্যি তালগাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নেশা হ'লে নিশ্চয় পা টলত, মুখের কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যেত

হীরালাল কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে কোংনা নিজেই সব ফাঁস করে দিল। বলল, -'তুমি তো মাহার সামনের মাসের প্রথমেই আমেরিকা যাচ্ছ।'

শুনে হীরালাল চমকে উঠল। কোংনা ঘোষ এ খবর পেল কোথায়? হীরালাল কারো কাছে ভ্রূণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি। তাহলে?

–'খবরটা কোথায় পেলাম বল তো?' কোংনা ঈষৎ হেসে ওই প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেই বলল,—'তোমার পার্টনার সতীশ খাস্তগীরের স্টেনোগ্রাফার মাঝে মাঝে আমাদের পার্টি অফিসে আসে। তার কাছেই শুনলাম,—'পাশপোর্ট, ভিসা সব নাকি রেডি।'

অগত্যা হীরালালকে কথাটা স্বীকার করতে হ'ল। ব্যাপারটা এতদিন চেপে রেখেছিল, তাই একটা কৈফিয়ত গোছের কিছু খাড়া করতে পারলে ভালো দেখায়। একটু চিন্তা করে হীরালাল বলল,—'আরে আমার যাওয়ার তো কোনো কথা ছিল না। মিঃ খাস্তগীর যাবেন বলেই সব ঠিকঠাক। কিন্তু ওর সিনেমা হল দুটোতে কী গণ্ডগোল নাকি হতে পারে। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

সিনেমা হলে গণ্ডগোলের কথাটা আংশিক সত্যি। কোংনা ঘোষ সে খবর রাখে। মুখখানা শক্ত করে বলল,—'হ্যাঁ ওখানে একটা ইউনিয়ন স্ট্রাইক বাধাবার মতলব করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় সেটা হবে না। সতীশ খাস্তগীর ধুরন্ধর লোক। তলে তলে লীডারদের সঙ্গে লাইন করে ফেলেছে।'

হীরালাল বলল,—'আমেরিকা যাওয়ার কথাটা আমি এখনও বাড়িতে

জানাই নি, বুঝলে ?'

—'আরি বাস ! করেছ কী হীরে দা ?' কোৎনা প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'খবরটা এখনও বৌদিকেই বল নি ?'

—'ইচ্ছে করেই কাউকে বলিনি, বুঝলে ? পরে যদি আবার ভেস্তে যায়।' হীরালাল এবার সুন্দর কৈফিয়ত রচনা করল। সলজ্জ হেসে বলল,—'তখন তোমরা ঠাট্টা-তামাশা করতে।'

মানিকতলার মোড়ে এসে বাঁ দিকে ঢুকতেই ফকির দাসের সঙ্গে দেখা। চোখে ভালো নজর আসে না। একটা বাস ধরতে গিয়ে উঠতে না পেরে সে শুকনো মুখে রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে কোৎনা সহর্ষে বলে উঠল,—'ও ফকিরদা, যাবে নাকি ?'

শ্যামাপদকে গাড়িটা থামাতে বলল হীরালাল। সামনের দরজা খুলে ফকির দাসকে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে বলল।

কোৎনা জিজ্ঞাসা করল,—'এদিকে এসেছিলে কেন ?'

—'কণ্ট্রাক্টরের একটা মালের খবর নিতে।' ফকির দাস জবাব দিল।

—'এখন কাজ হচ্ছে কোথায় ?' হীরালাল শুধোল।

—'ওই তো বেঙ্গল কেমিক্যাল যাবার যে রাস্তাটা ওরই পাশে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেনের কাজ চলছে।'

—'তোমার বাবু তো সি. এম. ডি. এ-র কাজ করে ?' হীরালাল জিজ্ঞাসা করল।

—'হ্যাঁ।' ফকির দাস সায় দিল। ফের বলল,—'সি. এম. ডি. এ.-র কণ্ট্রাক্টর।'

কোৎনা হঠাৎ বেশ ভারিক্কী চালে বলে উঠল,—'সি. এম. ডি. এ. মানে কী জানো ?'

ফকির দাস চুপ। কথাটার অর্থ শুধু সে কেন, হীরালালও জানে না।

—'সি. এম, ডি, এ, মানে,—কাটছি মাটি দেখবি আয়।' যেন একটা মোক্ষম রসিকতা করেছে ভেবে কোৎনা হো-হো করে হেসে উঠল।

কাঁকুড়গাছির মোড়ে ফকির দাস নেমে গেল। বাকি রাস্তাটুকু সে হেঁটে চলে যাবে। কী মনে হ'তে কোৎনা ফের শুধোল,—'আচ্ছা হীরেদা, ওই রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছিল না ? টাকা মাটি, মাটি টাকা।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' কথাটা হীরালালও শুনেছে।

কোৎনা একটা চোখ ঈষৎ ক্ষুদ্র করে বিশ্রী হেসে বলল—'বুঝলে হীরেদা, সি. এম. ডি. এ.-র কণ্ট্রাক্টরগুলো ঠিক তাই করছে। বেটারা মাটি কাটছে

আর টাকা লুটছে। যেন মাটি টাকা, টাকা মাটি হয়ে গেছে।'

হীরালাল বলল,—'শুনেছি সি. এম. ডি. এ,র কাজে ভালো পয়সা আছে।'

কোংনা হা-হা করে হেসে বলল—'কণ্ট্রাক্টরি করে দুদিনে সব লাল হয়ে যাচ্ছে। বাদলা পোকার মতো কাঁচা পয়সা উড়ছে। কণ্ট্রাক্টর, সাব-কণ্ট্রাক্টর আরো ছোট কণ্ট্রাক্টর কেউ বাদ নেই। দু-পয়সা কামিয়ে দিব্যি গাড়ি-বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলছে।' কোংনা ঘোষ ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে নিল। বলল,—'এই তো কালীপুজোর সময় ফকির দাসের বাবুর নামে হাজার এক টাকার বিল পাঠাতেই বাবু রেগে কাঁই। বেঁটে বলাইকে বলেছে, টাকা খোলামকুচি নাকি? হাজার এক টাকার বিল অমনি কাটলেই হ'ল?'

—'তারপর?' হীরালাল আড়চোখে তাকাল।

কোংনা বলল,—'ফয়সালা করতে আমাকে যেতে হয় নি। লালটু পরাণকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খানিকটা কথা কাটাকাটি হতেই সে খিস্তি করে চলে এসেছিল। আসার সময় পকেট থেকে ক্ষুরটা বের করে হাতের তেলোয় দুবার ঘষে দেখাল।'

—'তাইতেই কাজ হ'ল?'

—'আলবত।' কোংনা সগর্বে জবাব দিল। 'একদিন বাদেই বাবুর এক কর্মচারী এসে হাজার এক টাকা গুনে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলল,—বাবু নাকি ঝামেলা করতে ভালবাসে না। তবে চাঁদাটা বেশী বলে মনে খুব দুঃখ হয়েছে।'

হীরালাল বলল,—'ধর, লোকটা যদি তোমার নামে থানায় ডায়েরী করে আসত?'

—'মারো গুলি।' কোংনা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে হাসল। বলল, —'ওর সে বুকের পাটা আছে নাকি? শালা কালো টাকার কুমীর। ওই সামান্য চাঁদার জন্যে কখনও থানা পুলিশ করে?' শেষে একটা খিস্তি করে যা বলল তার অর্থ, ওই লোকটার পশ্চাদ্দেশেও তো মলের দুর্গন্ধ রয়েছে।

হীরালাল কোনো মন্তব্য করবার আগে কোংনা ফের বলল,—'এ তো সব দু-নম্বর টাকা হীরেদা। চাঁদা বলো, তোলা বলো কিম্বা পেরণামী বলো সব ওই দু-নম্বর টাকা থেকে আসে। আর শুধু চাঁদা কেন, এই ক'লকাতা শহরে যা কিছু চলে তার মধ্যে দু-নম্বরী টাকা ঢুকে বসে আছে। এত ফুর্তি, মাইফেল আর মদের আসর সব দু-নম্বরী টাকার খেলা। এই যে তুমি এত বড় একটা হিমঘর বানাচ্ছ মাইরি, বুকে হাত দিয়ে বলতে পার তার মধ্যে আধাআধি তোমার দু-নম্বরী টাকা ঢুকিয়ে দাও নি?'

কোংনা হঠাৎ নেশাগ্রস্থ মানুষের মতো হো হো করে হেসে উঠল। বলল,—'সব শালা দু-নম্বরের কারবারী। বাইরে ভদ্দরনোক সেজে মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যত দোষ এই কোংনা ঘোষ, তাই না?'

বেলেঘাটা পোস্ট অফিসের কাছে কোংনা নেমে যেতেই হীরালাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়িতে ওঠার পর থেকে বকরবকর করে তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। বোধহয় নেশার মাত্রাটা আজ একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। নইলে কোংনার মুখে এমন তত্ত্বকথা সে কস্মিনকালেও শোনেনি। কথায় বলে ভূতের মুখে রাম নাম, এ হ'ল সেই। যাবার সময় কিনা বলে গেল চাঁপদানীর হিমঘরে সে আধাআধি দু-নম্বরী টাকা ঢেলে দিয়েছে।

বসন্তবিলাস রোডের মুখে হীরালাল গাড়িটা ছেড়ে দিল। গলির সামনেই তার বাড়ি। এখন শ্যামাপদ পেট্রল পাম্পে তেল নিতে যাবে। চাঁপদানী থেকে এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে তেলের ট্যাংক প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেলা তিনটে নাগাদ হীরালালকে আবার ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মিসেস হিগিনসের বাড়িতে যেতে হয়। হঠাৎ পথের মধ্যে তেল ফুরিয়ে গেলে বিপত্তি। তার চেয়ে দশ লিটার তেল আর এক লিটার মবিল ভরে নিতে পারলে দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

হঠাৎ দূর থেকে অরণ্যকে আসতে দেখে হীরালাল চুপ করে দাঁড়াল। সেই মানিকতলার মোড়ে একদিন ছেলেটার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারপর কই, ওর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি। অরণ্য কী ইতিমধ্যে আবার কোথাও গিয়েছিল? হীরালাল এক মুহূর্ত চিন্তা করল। কিন্তু কোনো সদুত্তর পেল না।

তাকে শ্রেণীশত্রু কিম্বা যাই বলুক, হীরালাল তবু ছেলেটাকে ভালবাসে। এমন দৃপ্ত ভঙ্গি, উজ্জ্বল দৃষ্টি, বলিষ্ঠ আচরণ, ঝকমকে কথাবার্তা সে আজও কোনো ছেলের মধ্যে দেখতে পায় নি। শুধু শুধু কী খবরের কাগজঅলারা ওর ছবি ছেপেছে? পরীক্ষাতে সেকেণ্ড হয়েছিল বলেই তো? এ তল্লাটে কোনো ছেলে ওর মতো রেজাল্ট করেছে বলে হীরালাল শোনে নি।

কাছে এসে অরণ্য বলল,—'কী ব্যাপার হীরালালদা? এই ভর দুপুরে গলদঘর্ম হয়ে কোথা থেকে এলেন?'

হীরালাল সহাস্যে জবাব দিল,—'চাঁপদানী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি।'

—'চাঁপদানীতে কোনো কাজ ছিল?'

—'হ্যাঁ।' হীরালাল মুখ উজ্জ্বল করে বলল,—'ওখানে আমরা একটা হিমঘর তৈরি করছি। বেশ বড়ো সাইজের কোল্ড স্টোরেজ। সত্তর-আশী হাজার কুইন্টল আলু দিব্যি রাখা চলবে।'

—'হিমঘর ?' অরণ্য যেন বিড় বিড় করে কথাটা বলল। ফের চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল,—'নতুন হিমঘর তৈরি করছেন ?'

—'হ্যাঁ।' হীরালাল সোৎসাহে জবাব দিল।' আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল, বুঝলে ? তারপর একজন ভালো পার্টনার পেয়ে গেলাম।'

অরণ্য হঠাৎ কেমন দুঃখ করে বলল,—'কিন্তু মস্ত একটা হিমঘর তো দেশে তৈরি হয়ে আছে হীরালালদা।'

—'তার মানে ? কী বলছ তুমি ?'

—'ঠিকই বলছি। দেখলেন না, এত চেষ্টা করেও কোথাও একটা বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে পারিনি।' অরণ্য চুপ করে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ফের বলল,—'সমস্ত দেশে হিমঘরের মতো ঠাণ্ডা একটা। এখানে যত চেষ্টা করুন, আগুন আপনি নিভে যাবে।'

এই ধরনের কথাবার্তা হীরালালের আদৌ ভালো লাগে না। প্রসঙ্গ বদলাতে নিজেই বলল,—'জানো, আমি আমেরিকা যাচ্ছি।'

—'তাই নাকি ?' অরণ্য কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'শুধু বাবা নয়, এখন আমিও স্বীকার করছি—ইউ আর রিয়েলি এ সাকসেসফুল ম্যান। তবে নিশ্চয় এটা আপনার প্রথম ফরেন ট্যুর ?'

—'ইয়েস।' হীরালাল এবার ইচ্ছে করেই ইংরাজীতে উত্তর দিল। বলল, —'সামনের মাসের প্রথমেই রওনা হবো। পাশপোর্ট, ভিসা সব রেডি।'

—'আমেরিকা ধনতন্ত্রের দেশ। তবু উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সেখানেই প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।' অরণ্য গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করল। ফের হেসে বলল,—'আমেরিকা গেলে আপনি অবশ্য একবার ভার্জিনিয়া ঘুরে আসবেন। মনে আছে তো, ওয়াল্টার র‍্যালে সেখান থেকেই আলু এনে ইংল্যাণ্ডে প্রথম চাষ শুরু করেন। তারপর সেই আলু ইণ্ডিয়াতে আসে,—যার দৌলতে আজ আপনার এই সাকসেস্।'

হীরালাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'কিন্তু তুমি এখন কী করবে অরণ্য ?'

—'আমি ?'

'হ্যাঁ।' হীরালাল সস্নেহে তার মুখের দিকে তাকাল। 'আমি বলি তুমি আবার কলেজে ভর্তি হও। জানি, পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় ফার্স্ট হবে।'

অরণ্য এবার সরল মনে হাসল। বলল,—'আমার কী আর কলেজে পড়ার বয়স আছে হীরালালদা ? তাছাড়া আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডদের কেউ কেউ এখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পড়াশুনো করলে আমার ভাগ্যেও নিশ্চয় একটা গোলামী জুটত।'

হীরালাল কোনো জবাব দিল না। ছেলেটাকে কেমন করে বোঝাবে, তাই ভাবছিল।

অরণ্য বলল,—'সান্ত্বনা এই যে এখনও আমি একটা স্থির বিশ্বাসকে আঁকড়ে রয়েছি। কোথাও নিশ্চয় একটা বড়ো রকমের ভুলচুক হয়েছিল। তাই জনগণের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলে কখনও বিপ্লবকে জিইয়ে রাখা যায় না হীরালালদা। তাই আমরা ক'জন আবার ফিরে যবে ঠিক করেছি।

—'কোথায় ?' হীরালাল সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—'গ্রামে।' অরণ্য ধীরে ধীরে বলল। 'একবার ভুল করেছি বলেই কী আমরা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে আত্মহননের পথ বেছে নেব ?'

অরণ্য আর দাঁড়াল না। বলল,—'চলি হীরালালদা। আগেকার দিনে সমুদ্রযাত্রা করলে লোকে বলত 'বোন্ ভোয়াইয়াজ' অর্থাৎ তোমার যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমিও তাই বলি,—উড়োজাহাজে গেলেও নিশ্চয় তা বলা চলে।' একমুহূর্ত থেমে সে ফের যোগ করল,—'আমেরিকা থেকে ফিরে আসুন। যদি দেখা হয় তো অনেক গল্প শোনা যাবে।'

বেলা তিনটের একটু আগে হীরালাল ফের বেরোবার জন্য তৈরি হ'ল। আমেরিকা যাওয়ার কথা আজ প্রথম সে বাড়িতে বলেছে। শুনে ভামিনী কিন্তু রাগারাগি করে নি। বরং অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল —'সে দেশ কত দূরে গো ?'

—'তা প্রায় চোদ্দ-পনের হাজার মাইল হবে।' হীরালাল বেশ বিজ্ঞের মতো কথা কইল।

ভামিনী বলল,—'উড়োজাহাজে যেতে হবে ?'

—'হ্যাঁ। তা পৌঁছতে ধর গিয়ে দেড়-দিন কিম্বা দুদিনের মতো লাগবে।'

ভামিনীকে ফের চিন্তিত দেখাল। বলল,—'হ্যাঁগো, সে তো শুনেছি সাহেব-সুবোর দেশ। ইংরিজিতে সব কথা বলে। তুমি তো তোদের মুখের ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারবে না।'

হীরালাল একটু এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে আলতো করে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরল। বলল,—'এতদিন তোমাকে জানাই নি। একটু-আধটু শিখে যাতে কাজ চালিয়ে নিতে পারি, তারজন্যই তো এক মেমসাহেবের কাছে রোজ যাচ্ছি। সেই আমাকে বিলিতী আদব-কায়দা শিখিয়ে দিচ্ছে, গলায় কেমন করে টাই বাঁধতে হয় তাও দেখিয়ে দেয়।'

কোমরের কাছে থেকে হীরালালের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ভামিনী ঘুরে দাঁড়াল। থুতনীর ওপর আঙুল ঠেকিয়ে মুখভার করে বলল,—'ওমা! আমি কোথায় যাব গো? আমাকে গোপন করে তুমি রোজ একটা মেমমাগীর কাছে যাচ্ছ?'

—'আহা! এ-যাওয়া সে-যাওয়া নয়।' হীরালাল স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করল। ফের বলল,—'ছেলেরা যেমন মাস্টারের কাছে পড়া শিখতে যায়, আমিও তেমনি মেমসাহেবের ঘরে গিয়ে ইংরাজী শিখে আসি। তবে তোমার ভাবনার কারণ নেই। মিসেস হিগিনস্‌কে তো দেখনি। এক মাথা পাকা চুল আর বয়স পঞ্চাশের ঢের বেশী।'

ইংরাজী শেখার কথা শুনে যতটা নয়, মেমসাহেবের পাকা চুল আর বয়সের কথায় তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হ'ল। ভামিনী মুখের চেহারা পাল্টে ফের তার দিকে তাকাল।

হীরালাল বলল,—'আমেরিকা গিয়ে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমার ব্যবসার পার্টনার সতীশ খাস্তগীরের ছেলে নিজে এয়ার পোর্টে আসবে। তার বাড়িতে উঠব। সেখানে তারা বাসিন্দা হয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে তো সাহেব বনে যায় নি।'

খবর শুনে শুভঙ্করী এসে একগাল হাসল। মাথার চুল কটা সব সাদা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কত ঝড়-ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। দু-মুঠো অন্নের জন্য ওই ছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে একদিন পরের বাড়িতে গলগ্রহ হয়েছিল। এই তো ক'বছর হ'ল একটু সুখের মুখ দেখছে। ভামিনীকে উদ্দেশ্য করে সে সগর্বে জানাল,—'তোমাকে কতবার বলেছি না বৌমা? ও হ'ল আমার হীরালাল, খাঁটি হীরে। ওকে কী আঁচলের গেরোয় বেঁধে ঘরে ধরে রাখতে পার?'

দরজা খুলে রাস্তায় পা দিয়ে হীরালালের মনে হ'ল কোথায় যেন একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। কান খাড়া করে ঈষৎ মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারল নগেনের বাড়ির ভিতরে দাঁড়িয়ে কারা যেন বেশ জোরে কথাবার্তা বলছে।

হীরালালের কৌতূহল হ'ল। এমন অবেলায় চেঁচামেচি কিসের? তাও নগেনের বাড়ির ভিতর? দু-পা বাড়িয়ে একটু যেতেই সে অনেকের গলা শুনতে পেল। তার মধ্যে ভুবন পিসী, জগমাসী, পাড়ার আরো কেউ কেউ রয়েছে। তবে সকলকে ছাপিয়ে নগেনের গলা দূর থেকেও শোনা যাবে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল হীরালাল। দেখল হাতে একটা ছোট লাঠি নিয়ে উঠোনে নগেন যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলল,—

'আপনারা পাঁচজনে এর পিতিবিধান করুন। নইলে শেষ পর্যন্ত আমি একটা কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়ব।'

জগমাসী বলল,—'ও হীরালাল, এদিকে এস একবার। তুমি হ'লে গিয়ে পাড়ার মাথা। নগেনের বউটা মেয়ে জুটোকে সঙ্গে নিয়ে আজ তে-রাত্তির হ'ল সেই হাসপাতালে রয়েছে। তা এর একটা বিহিত করতে হয়।'

হীরালালের তাড়া ছিল। মিসেস হিগিনস্ ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করেন। সময়ে পৌছতে না পারলে মেমসাহেব যে বেশ বিরক্ত হন, হীরালাল তা বুঝতে পারে। কিন্তু এসে পড়েছে যখন, তাকে এই সমস্যার একটা দাওয়াই বাতলে দিয়ে যেতে হবে।

ভুবনপিসী বলল,—'তুমি তো জানো সব। ওই ডেরাইভার ছোঁড়ার টানেই নগেনের বউটা সেখানে পালিয়ে গিয়ে আছে। থানার বড়বাবুকে বলে যদি ব্যাটাকে একটু কড়কে দিতে পার, তাহলে চামেলী সুড়সুড় করে আবার ঘরে ফিরে আসে।'

জগমাসী বলল,—'তাছাড়া মেয়ে জুটো তো ওর একার সম্পত্তি নয়, নগেনেরও। তাদের সঙ্গে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়েযাবার ওর কী অধিকার আছে?'

হীরালাল একটু চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু পুলিশ কী এর মধ্যে নাক গলাতে চাইবে? নগেনের বউ তো আর পালিয়ে যায় নি। যেখানে কাজ করে সেখানেই কোয়ার্টার নিয়ে আছে। এখন তার যদি স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে না ইচ্ছে হয়, তাহলে পুলিশ কী করবে?'

ভুবনপিসী চিন্তিত মুখে বলল,—'তাহলে উপায় কী হীরালাল? বউটা যদি এমনি নাকের ডগা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অন্যত্র থাকে তাহলে পাড়ার বৌ-ঝিরা কী শিক্ষা পাবে?'

হীরালাল বলল,—'এখন উপায় শুধু কোর্ট-কাছারি। আদালত হুকুম দিলে বউ ফের স্বামীর ঘর করতে বাধ্য হবে।'

—'থামুন মশায়।' নগেন তাকে ধমক দিয়ে উঠল। খ্যাক খ্যাক করে বিকৃত-মুখে বলল,—'বউ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বলে আমি আদালতে হাতজোড় করে দাঁড়াব?' ফের হাতের লাঠিটা শূন্যে উঁচিয়ে আস্ফালন করে জানাল,—'আমার আদালত হ'ল এই। আজকের রাত্তিরটা অপেক্ষা করে দেখি। যদি না আসে তাহলে, কাল সকালে ওই নার্সিং হোমে ঢুকে চুলের মুঠি ধরে ওকে হিড় হিড় করে টেনে আনব।'

জগমাসী বলল,—'হ্যাঁ, তবে বুঝব তুই মরদ। বাপের বেটা—'

পিছন থেকে কে একজন চিমটি কাটল,—'কিন্তু নগেনদা, ওই ড্রেরাইভারটার সঙ্গে পারবে তো ?'

—'অ্যাই, অ্যাই। কে ওকথা বললি ?' ভুবনপিসী চোখ পাকিয়ে তাকাল। ফের হেসে নগেনকে লক্ষ্য করে বলল,—'ও হ'ল গিয়ে তোর বিয়ে করা পরিবার। তুই তাকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরে আনলেও কারো একটি কথা বলার অধিকার নেই।'

নগেন প্রায় হাঁপাচ্ছিল। তার দেহ বেশ রোগা, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হীরালাল তাই জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার শরীর কেমন আছে নগেন ?'

কাজের মেয়েটি কাছে দাঁড়িয়ে। সে মুখ নিচু করে বলল,—'আবার সন্ধ্যের পর জ্বর হচ্ছে। সেই ঘঙ ঘঙে কাশিটা তো এখন দিনের বেলাতেও শুনি।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হীরালাল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল,—'জগমাসী, আমি এখন যাই। গাড়ি নিয়ে এখুনি আবার ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে ছুটতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মিসেস হিগিনস্ না আবার রাগ করেন।'

সন্ধ্যেবেলা ধর্মতলার মোড়ে হিয়ার সঙ্গে পিতুর মুখোমুখি দেখা। সে একা নয়, সঙ্গে সেই ছেলেটা। পিতুর চেয়ে সামান্য লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো। আজ পরনে একটা সাদা পাতলুন আর সবুজ রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে চটি।

দূর থেকে দেখতে পেলে পিতু নিশ্চয় তাকে এড়িয়ে অন্য দিকে চলে যেত। ওই ছেলেটার সঙ্গে কখনও তার সামনে এসে দাঁড়াত না। আড়ালে যাই করুক, পাড়ার লোকের কাছে তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন অর্তকিতে ঘটল যে পিতু কিম্বা হিয়া কারো পক্ষেই আর তখন মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা হিয়া মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করল,—'এদিকে কোথায় ?'

পিতু আশ্চর্য মেয়ে। হিয়া ভেবেছিল একসঙ্গে তাদের দুজনকে দেখেছে বলে সে বোধহয় লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েটা দিব্যি নিঃসঙ্কোচে তার মুখের দিকে তাকাল। 'এদিকে একটু কাজ ছিল', পিতু জবাব দিল। ফের এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল,—'তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল মাসী।'

—'কী কথা বল।' হিয়া জিজ্ঞাসু হ'ল।

চারপাশে অনেক লোকের ভিড়। গা ঘেঁষে মানুষ পেরিয়ে যাচ্ছে। পিতু তাই প্রস্তাব করল,—'চল না, ওই ট্রাম-অফিসটার কাছে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

হিয়া আপত্তি করল না। বরং তার রীতিমত কৌতূহল হচ্ছিল। পিতু কিছু বলতে চায় এবং সেটা নিশ্চয় তার ব্যক্তিগত কাহিনী। তাদের পরিবার-সংক্রান্ত কোনো কথা হ'লে পিতু নিশ্চয় বাড়িতে গিয়ে বলত। এমন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করত না।

ট্রাম-অফিসটার কাছে নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিয়ে পিতু দাঁড়াল। ইঙ্গিতে তার সঙ্গীকে একটু দূরে যেতে বলল। ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা গিয়ে একটা বাদামঅলার সামনে থামল।

হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'তোর সঙ্গে এই ছেলেটি কে?'

—'ওর নাম সুজয়,—সুজয় ব্যানার্জী।'

—'তোর বন্ধু?'

—হ্যাঁ, তা বলতে পার।' পিতু ঠোঁট টিপে হাসল। ফের বলল, —'আমাদের টুনি ল্যাম্পের কারখানার কাছে একটা চোক্ তৈরির ফেক্‌টারি আছে। ও সেখানে কাজ করে।'

—'কতদিন ওর সঙ্গে মিশছিস?' হিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

—'তা দু-বছর হবে।' পিতু অকপটে জানাল। হিয়া জিজ্ঞাসা করল,—'ওর কথা আমাকে কিছু বলবি?'

—'হ্যাঁ।' পিতু সলজ্জ হেসে তার মনের কথা জানাল,—'ওকে আমি বিয়ে করছি মাসী।'

—'বিয়ে?' হিয়া খুব অবাক হ'ল। শুধোল,—'কবে বিয়ে হচ্ছে? কোথায়?'

—'ধর্মতলায় একটা রেজেষ্ট্রী অফিস আছে। সেখানে বিয়ে হবে। সামনের বুধবার দিন স্থির হয়েছে।'

—'তোর মা-বাবা জানে?'

—'না। কাউকে এখন বলবার প্রয়োজন নেই। বিয়ে হ'লে দুজনে একসঙ্গে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করব।'

—'তাহলে আমাকে কেন বললি?' হিয়া ভ্রূ কোঁচকাল।

পিতু বলল,—'আমাদের বিয়েতে তুমি সাক্ষী হবে মাসী?'

—'সাক্ষী?'

'হ্যাঁ, আমার তরফ থেকে একজন সাক্ষী দিলে ভালো। এই ধর পাড়ার কেউ—'

এতক্ষণে হিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওই ছেলেটার সঙ্গে পিতুর রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে হবে। তার তরফ থেকে হিয়াকে সাক্ষী দিতে বললে সে

নিশ্চয় বিয়ের আগে খবরটা পাড়ায় চাউর করবে না।

একটু চিন্তা করে হিয়া বলল,—'কিন্তু তোর তো একজন স্বামী আছে পিতু।'

—'স্বামী? কার স্বামী গো মাসী?' পিতু যেন তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল।

হিয়া একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'কেন, যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল। শুনেছি ঝগড়াঝাঁটি করে তুই শ্বশুরঘর থেকে চলে এসেছিস।'

—'হ্যাঁ। এসেছি মানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে বিয়ে করবার আগে তার যে একটা জলজ্যান্ত বউ ছিল, এই কথাটা তো আগে জানতাম না। এমন অপমানের পর কোনো মেয়ে কী সেই স্বামীর ঘরে পড়ে থাকতে পারে?'

—'তাহলে আদালতে গিয়ে কেন ডিভোর্সের দরখাস্ত করলি না? তোর মাকে সে কথা কতবার বলেছি?'

—'কিসের ডিভোর্স গো মাসী?' পিতু তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল। বলল,—'তুমি ছাড়াছাড়ির কথা বলছ, সে তো কবে হয়ে গেছে। চার বছর হতে চলল কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের সেই জামাই বরং দিব্যি তার বউকে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। মায়ের কাছে শোনোনি তার এক মেয়ে আর এক ছেলে। বছর খানেক আগে সেই ছেলেটার ঘটাপটা করে অন্নপ্রাশন হয়েছে।'

হিয়া জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু ফের যাকে বিয়ে করবি সে যে ধোয়া তুলসী পাতা তাই বা কেমন করে জানলি? আর তোর যে আগে একবার বিয়ে হয়েছিল সে কথা ও জানে?'

পিতু একগাল হেসে বলল,—'ওকে তুমি চেন না মাসী। অমন সৎ, সুন্দর ছেলে হয় না। চার বছর আগে কনের লাল চেলি পরে আমার একবার বিয়ে হয়েছিল, সব ওকে জানিয়েছি। একটি কথাও গোপন করিনি। শুনে বরং ওই আমাকে বলল,—মিছিমিছি কী হবে কোর্ট-কাছারি করে? তুমি তো আর ওই ভদ্রলোকের পথের কাঁটা হও নি।'

—'সে কথা এক'শবার। ইচ্ছে করলে তুই নিশ্চয় ওর বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারতিস। বাছাধন তাহলেই মজা টের পেত।' হিয়া তাকে সমর্থন করল। ফের হেসে বলল,—'ঠিক আছে। তোর বিয়েতে আমি সাক্ষী হবো। বুধবার কখন আসতে হবে বল।'

পিতু কোনো জবাব না দিয়ে প্রায় ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে ডেকে আনল। বলল,—'সুজয়, ইনি আমার হিয়া মাসী। এক পাড়ায় থাকেন। বিয়েতে উনি সাক্ষী দিতে রাজি।'

ছেলেটি এক পলক তার মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে